ইসলামী শাসন ব্যবস্থা : মৌলিক দর্শন ও শর্তাবলি

জিয়াউল হক

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা : মৌলিক দর্শন ও শর্তাবলি

জিয়াউল হক

www.pathagar.com

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা : মৌলিক দর্শন ও শর্তাবলি
জিয়াউল হক
মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে
মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৪৫৫৫, ৭১১৯২৩৫

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৭ ইংরেজি
জিলহজ্জ ১৪২৭ হিজরী
ফাল্গুন ১৪১৩ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ
এস.টি. কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মূল্য : ১২০ টাকা
ISBN: 984-8631-031-7

www.pathagar.com

নজরানা ঃ

আমার মমতাময়ী মা, যাঁর কঠোর অনুশাসন আর স্নেহের ছায়ায় বেড়ে ওঠেছি, সেই ফাতেমা বেগম এর হাতে তুলে দিলাম গ্রন্থখানা।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়– ইসলাম একটি আদর্শপদ্ধতি ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়–প্রথম অনুচ্ছেদ–ইসলাম : একটি সংবিধান ১৫

–দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ– ইসলামী রাষ্ট্র ও আইনের শাসন ২২

–তৃতীয় অনুচ্ছেদ– বন্দেগীর চেতনায় ইসলামী শাসন ২৯

তৃতীয় অধ্যায়–ইসলামী শাসন ও গণতন্ত্র ৩৫

চতুর্থ অধ্যায়–পরামর্শভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসন ৪১

পঞ্চম অধ্যায়–প্রথম অনুচ্ছেদ–সহজলভ্য ন্যায়-বিচার ৫২

–দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ– ইসলামী দণ্ডবিধি ৬২

ষষ্ঠ অধ্যায়– অর্থনৈতিক বিধান ও সম্পদের সুষমবণ্টন ৬৯

–প্রথম অনুচ্ছেদ– উপার্জনের চেষ্টা বাধ্যতামূলক ৭১

–দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ– বাধ্যতামূলক অনুসৃতব্য বিধান ৭৩

–তৃতীয় অনুচ্ছেদ– সুস্পষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ ৮৬

–চতুর্থ অনুচ্ছেদ– স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অনুসৃতব্য বিধান ৯০

সপ্তম অধ্যায়–প্রথম অনুচ্ছেদ–জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় "কল্যাণ" এর প্রকৃত ধারণা ৯২

–দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ– চিন্তার পরিশুদ্ধি ৯৯

–তৃতীয় অনুচ্ছেদ– প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ১০৭

–চতুর্থ অনুচ্ছেদ– সুসংহত ও কল্যাণকর সামাজিক অবকাঠামো ১১৭

অষ্টম অধ্যায়– রাষ্ট্র পরিচালকদের দায়িত্বানুভূতি ও তাকওয়া ১১৭

নবম অধ্যায়– জনগণের-জানমাল-ইজ্জত এর নিরাপত্তা ১২৭

দশম অধ্যায়– প্রথম অনুচ্ছেদ– ইসলামী রাষ্ট্র ও শিক্ষাব্যবস্থা ১৩৭

–দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ– ইসলামী রাষ্ট্র সংস্কৃতি ৪৪৫

একাদশ অধ্যায়– ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান ১৫৬

দ্বাদশ অধ্যায়–

–প্রথম অনুচ্ছেদ– আদর্শই প্রধান রক্ষাকবচ ১৫৯

–দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ– তাসবীহ ও তলোয়ারের সুসমন্বয় ১৮৯

–তৃতীয় অনুচ্ছেদ– ইসলাম ও যুদ্ধ : পারস্পরিক সম্পর্ক ও সীমারেখা ১৯২

–চতুর্থ অনুচ্ছেদ– ইসলামী সৈন্যবাহিনীর জন্য বাধ্যতামূলক কয়েকটি যুদ্ধরীতি ১৯৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়– ইসলামী রাষ্ট্র ও অমুসলিম নাগরিক ২০৩

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইসলাম আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি বুদ্ধিজীবি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিই কেবল নন বরং দুনিয়ার আনাচে-কানাচে যেখানেই চোখ দেন না কেন, দেখবেন অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসের সাধারণ মানুষও ইসলাম নিয়ে চিন্তা ভাবনা বা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। এ বিতর্ক ইসলামের পক্ষে হোক বা বিপক্ষে সেটা আসল বিষয় নয়, বরং যে বিষয়টা অকাট্য সত্য সেটা হলো ইসলাম আজ সমগ্র বিশ্ববাসীর আলোচনার বস্তু, তাদের মনোযোগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুবের জাপান বা নিউজল্যান্ড, পশ্চিমের আমেরিকা বা কানাডা, উত্তরের নরওয়ে বা দক্ষিণের কেপটাউন, এসবের যে কোনো একটি স্থান হতে সেই সব দেশের একটি জাতীয় পত্রিকা হাতে তুলে নেন দেখবেন তাদের জাতীয় বা আন্তর্জাতিক যে কোনো খবরের পাশাপাশি অতি অবশ্যই ইসলাম নিয়ে কোনো না কোনো খবর থাকবেই থাকবে। সে খবর পক্ষে বা বিপক্ষে, যে পক্ষেই হোক না কেন। দুঃখের বিষয়, এসব খবর আর ফিচার-নিবন্ধে ইসলামকে নেতীবাচক দৃষ্টিতে তুলে ধরা হয়, এবং সে কাজটি করা হয় পরিকল্পিতভারেই।

অমুসলিমদের কথা বাদ দিয়েও আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথেই এ কথা বলতে ও স্বীকার করতে পারি যে, আমাদের মুসলিম সমাজেরই অধিকাংশ মানুষ, আমরা ইসলামকে ভালোভাবে বা পরিপূর্ণভাবে জানি না। জানার চেষ্টাও করিনি কোনোদিন। আমরা ইংরেজি, জার্মান বা ফারসি কিংবা বাড়ির পাশের হিন্দি ভাঁষা শেখার চেষ্টাতো করেছি কখনও ভুল করেও আরবীটা শেখার কথা মাথায়ও আনিনি ঘুর্ণাক্ষরে। আমরা কোনোমতে কুরআন পড়াকেই আরবী ভাষা শেখা মনে করে বসে আছি।

এমনকি আমাদের নিজ মাতৃভাষাতেও ইসলামকে জানার মত উপযোগি পর্যাপ্ত বই নেই। (আশার কথা এই যে, বিগত প্রায় দুই তিনটি দশক সময় ধরে বাংলাদেশে এ করুন অবস্থা ধীরে ধীরে হলেও পাল্টাতে শুরু করেছে) যা আছে, তার অনেকটাই আবার ভুল বা অপূর্ণাঙ্গ বা অপব্যখায় ভরা। ফলে যা হবার তাই হয়েছে, আমাদের নিজেদের সমাজেই মুসলমান নামধারী, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে পুরোমাত্রায় অজ্ঞ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'বিপজ্জনক বিশেষজ্ঞ' এর আবির্ভাব হয়েছে আর সেই সাথে তাদের অনুসারিও গড়ে ওঠেছে যারা একটি মুসলিম সমাজের ভেতরে থেকেই ইসলামের মূলোৎপাটনে জেহাদে (!) নেমেছেন অনেকটাই নিজেদের অজান্তেই।

www.pathagar.com

আর সাধারণ জনগণ এসব 'জেহাদি' নেতাদের দেখে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছেন। সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে ইসলাম ও ইসলামী শাসন নিয়ে বিভ্রান্তিকর কল্পকাহিনি।

এগুলো এমনই এক বাস্তবতা যে এসব কথার পূনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন পড়ে না এবং সেটা চেষ্টাও বাহুল্যমাত্র। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর ধ্যন ধারণার মধ্যে থেকেই প্রকৃত ইসলামী শাসন কি? কাকে বলে? তার চিত্রই বা কেমন এবং বর্তমান এই আধুনিক বিশ্বে তার রুপায়নই বা কেমন হতে পারে? এ বিষয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, উৎসাহ এবং প্রয়োজনে নিজের মত করে উত্তর খুঁজতে গিয়েই এই বই এর জন্ম।

আমি আল-কুরআন বা ইসলাম কোনোটারই বিশেষজ্ঞ নই। এক সাধারণ এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্র। ইসলামী শাসনব্যবস্থা নিয়ে আমার মনে জাগ্রত প্রশ্নের উত্তর আমার মত করে খুঁজেছি। এই গ্রন্থে কোনো তথ্যগত ভুল থেকে থাকলে সে দায় একান্তই আমার এবং আমাকে তা জানালে আমি ইনশাআল্লাহ তা শুধরে নেব।

বইখানা লেখা হয়েছে আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে কুয়েত এ বসে। প্রবাসে রেফারেন্স বই এর অপ্রতুলতা সকলেই জানেন। এর উপরে রয়েছে আমার নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। এর পরেও বইখানা শ্রদ্ধেয় পাঠকের হাতে তুলে দেবার জন্য মাসিক মদীনা কর্তৃপক্ষ এগিয়ে এসেছেন। এটা নিতান্তই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এ জন্য আমি প্রথমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর কাছে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আলহামদুলিল্লাহ! এর সাথে সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি উপমহাদেশখ্যাত প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র মদীনা পাবলিকেশন্সের প্রধান পুরুষ জনাব মুস্তফা মঈনউদ্দীন খান-এর প্রতি। আল্লাহ তাঁদের এই ত্যাগ কবুল করুন এবং তাঁদেরকে উভয় জগতে কল্যাণ দান করুন।

জিয়াউল হক
নিউক্যাসল, ইংল্যান্ড
ডিসেম্বর-২০০৬

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম একটি আদর্শ পদ্ধতি

ইসলাম হলো একটি জীবন ব্যবস্থা, একটি পদ্ধতি বা System এর নাম। যারা ইসলামকে শুধুমাত্র একটি ধর্ম হিসেবে দেখেন তাঁরা মূলত ইসলামকে খন্ডিত করে ফেলেন। কারণ সে ক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে মানুষের জীবনের একটা অংশের সাথে, পুরো জীবনের সাথে নয়। জীবনের অন্য দিকগুলো রয়ে যায় অন্য কোনো দীন বা ব্যবস্থা ও System এর সাথে সম্পর্কিত। সেরকম অবস্থায় জীবন হয়ে পড়ে পরস্পরবিরোধী কতগুলো দীন বা ব্যবস্থার সংমিশ্রণ, যা মানুষের আত্মিক ও বাহ্যিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দেয়। মানুষের জীবনের সার্বিক দিকের সাথে সম্পর্কিত না হয়ে শুধুমাত্র একটি অংশ ধর্মীয় জীবন এর সাথে সংশ্লিষ্ট হবার ফলে ইসলাম যে বৈপ্লবিক অবদান রাখতে পারত একটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, একটি গোষ্ঠীর সামষ্টিক ও সামাজিক জীবনে, একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় জীবনসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে, সে অবদানটুকু আর সে রাখতে পারছে না। এটা ইসলামের ব্যর্থতা নয়। বরং এটা একই সাথে সমগ্রভাবে বিশ্ব মানবতার ব্যর্থতা ও তার পাশাপাশি দুর্ভাগ্যও বটে যে, ইসলাম এর মত সর্বরোগ সংহারকারী, অব্যর্থ ধন্বন্তরি ওষুধ হাতের কাছে সহজলভ্য অবস্থায় সদাসর্বদা উপস্থিত থাকতেও শত দুরূহ রোগে আক্রান্ত ও জর্জরিত বিশ্ব মানবতা বা বিশ্ব সভ্যতা, সে ওষুধ সেবন না করে বরং বিশ্বব্যাপী দাওয়াই খুঁজে ফিরছে। যুগে যুগে, সময়ে সময়ে হাতুড়ে হেকিম আর সেবা ব্যবসায়ীর মতো বুদ্ধির ব্যবসায়ী তথা বুদ্ধিজীবীদের দাওয়া বহুবার সে খেয়েছে, অদ্যাবধি সেসব সে সেবন করেই যাচ্ছে অদম্য ব্যগ্রতার সাথে, কিন্তু হায় কপাল। রোগতো নিরাময় হচ্ছেই না, বরং রোগের বহুরূপ জটিলতা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। বেড়ে চলেছে সংগত কারণে বিশ্ব সভ্যতার প্রতিটি সদস্য তথা প্রতিটি মানুষের কষ্ট। কিন্তু মানুষ যদি ইসলামকে শুধুমাত্র একটি ধর্ম হিসেবে না দেখে একটি পদ্ধতি তথা সিস্টেম হিসেবে দেখত (বস্তুত, আসলেই ইসলাম হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বা জীবন পদ্ধতির নাম, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। "ইন্নাদ্দীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম" অর্থাৎ "আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম।" আল-কুরআন, (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-১৯) তা হলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতো সে নিজেই। কারণ ইসলামের উপস্থিতি তো শুধুমাত্র মানুষের জন্যই। বনের গাছ-পালা, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, সাগরের মাছ-প্রাণী, আকাশের গ্রহ-তারা ও নক্ষত্রপুঞ্জ এসবের কিন্তু এ চিন্তা নেই যে, তারা কোনো ধর্মের বা

www.pathagar.com

কোনো সিস্টেম এর অনুসারী। তাদের জন্য যে সিস্টেম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সৃষ্টির সেই আদিলগ্ন, তারা তা ঠিকই মেনে চলছে। বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় নেই, তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই, হচ্ছেও না। সমস্যা হলো শুধুমাত্র এবং একমাত্র মানুষের বেলায়, কারণ মানুষ তার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিকে না মেনে চলেছে, আর না তা স্বীকার করছে। এ কথা নির্দ্বিধায় ও বিনাবাক্যব্যয়ে বলে দেয়া যায় যে, মানুষ যদি তার জন্য নির্ধারণ করে দেয়া পদ্ধতি, সিস্টেম বা দীনকে মেনে নিত এবং সেই অনুপাতে চলত বা জীবন চালাত তা হলে সন্দেহাতীতভাবে সে তার সকল সমস্যা ও ব্যর্থতাকে সহজেই কাটিয়ে ওঠতে পারত। মাটির এ পৃথিবীতে যতটুকু সুখ-শান্তি, সফলতা ও সমৃদ্ধি তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব তা সে অনায়াসেই পেত। পেত এই কারণে যে ইসলাম নামক একটি পরিপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত সর্বযুগোপযোগী ব্যবস্থার প্রয়োগ ও বাস্তব জীবনে তার পূর্ণ অনুসরণের অনিবার্য ফল হলো মানুষের আত্মিক ও বাহ্যিক স্থিতিশীলতা। ভেতর ও বাহির এ দুটি ক্ষেত্রে মানুষ যখন স্থিতিশীলতা পেয়ে যায়, তখন তার ভেতরে সৃষ্টিগতভাবে প্রাপ্ত যোগ্যতা, মেধা ইত্যাদির পূর্ণ বিকাশ হবার মত পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। এগুলোর বিকাশ প্রস্ফুটন বা কার্যকর ব্যবহারের ফলে মানুষের দ্বারা পরিচালিত জীবন, তার পরিবার হতে শুরু করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক, তথা তার পূর্ণ ও সামাজিক জীবনটাই সুখে- সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। ভরে ওঠে এ কারণে যে পূর্বোক্ত আত্মিক ও বাহ্যিক দুটি ক্ষেত্রে অর্জিত স্থিতিশীলতার সাথে সাথে মানুষের সকল যোগ্যতা ও মেধার কার্যকর ব্যবহারের অনিবার্য ফলাফল হলো অন্যায়ের অস্থিতিশীলতা, অনাচার ও অযোগ্যতার (তা ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক যাই হোক না কেন) মত অনুঘটকসমূহের অবলুপ্তি বা অবদমন। আর এরকম অবস্থায় সুখ-শান্তি সমৃদ্ধি, ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্ফুটিত হতে থাকে।

বিশ্ব ইতিহাসে এরকম ঘটনা আমরা দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপস্থিতিতে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রটিতে। তাঁর ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশেদীন ও তারও পরে ওমর বিন আব্দুল আজিজ এর আমলে। এমনকি তারও পরে মনুষ্য প্রতিভার ক্ষেত্রে অনুর্বর বলে পরিচিত পাহাড়ি জনপদ, অখ্যাত-অজ্ঞাত স্পেন্ যখন মুসলিম অধিকারে এলো এবং সেখানে যখন জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম এর প্রয়োগ ঘটল বাস্তবে, তখন আমরা দেখতে পেলাম খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে সেই স্পেন সুখ-শান্তি ঐশ্বর্য-প্রগতি আর প্রতিভার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পর্যায়ে ওঠে এলো চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে মুসলিম স্পেন এর অবদানকে প্রত্যাহার করে নেয়া সম্ভব হলে এ বিশ্ব নিঃসন্দেহে পুনরায় হাজার বছর পিছিয়ে পড়বে। আজকের বিশ্ব সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতা

www.pathagar.com

এসবই হলো মুসলিম স্পেনে চিন্তা-চেতনা, জ্ঞানগরিমা বিকাশের অনিবার্য ফল। ইউরোপীয় রেনেসাঁর জনক বলে পরিচিত "রজার বেকন্" ছিলেন মুসলিম স্পেন এর গৌরব কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

শুধুমাত্র ইউরোপ এর কথাইবা বলি কেন, বরং এ কথাটিই বাস্তব ও দিবালোকের মত সত্য যে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম সমগ্র গোলার্ধের যতটুকু কল্যাণকর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কল্যাণের যতটুকু ধারা সূচিত হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানবতার যতটুকু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তার পেছনে মূল কার্যকরণ হলো আল-কুরআন। আমরা এ কথার সর্বান্তকরণ স্বীকৃতি পাই Prof. Boiffault's এর লেখা "THE MAKING OF HUMANITY" নামক গ্রন্থের নিম্নোক্ত বক্তব্যে, বক্তব্যটি মরহুম রাশিদুল হাসান তাঁর ISLAMIC CONSTITUTION নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, সেখান থেকে তা তুলে ধরলাম।

"The ideals of freedom for all human beings, of human brotherhood, of the equality of all men before the law, of the democratic government by consultation and universal suffrage, ideals that inspired the Franch Revolution, and the declaration of Rights that guided the framing of the American Constitution, and inflamed the struggle of independence in Latin American Countries, were not the inventions of the West. They find their ultimate inspiration and source in the Holy Quran."

অর্থাৎ, সকল মানুষের জন্য স্বাধীনতা ভাতৃত্ববোধের চেতনা, আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান। যে ধারণা পরামর্শের ভিত্তি গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার ধারণা ও মৃতের কল্যাণার্থে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার মহৎ অভিব্যক্তি, সেই চেতনা যা ফরাসি বিপ্লবকে অঙ্কুরিত করেছে, স্বাধীকারবোধের সেই ঘোষণা যা মার্কিন সংবিধানকে অবয়ব প্রদান করেছে, ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহের স্বাধীনতার লড়াইকে যা ত্বরান্বিত করেছে সেসব পশ্চিমা সভ্যতার কোনো দান নয় বরং এ সকল চেতনা ও অভিব্যক্তি তারা শেষ পর্যন্ত তা পেয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হতেই (দ্রষ্টব্য : GUIDE LINE OF AN ISLAMIC CONSTITUTION লেখক RASHEEDUL HASSAN PAGE NO 4-5) এ ছাড়াও অন্যান্য যুগে কোন কোন শাসনামলে, যেমন আব্বাসীয়, ফাতেমী ওসমানীয়, মোগল ও এ

www.pathagar.com

সবের পূর্বে উমাইয়া খিলাফতের কোন কোন শাসকবর্গের জামানায়ও আমরা এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। কিন্তু এর চূড়ান্ত বাস্তব নমুনা ছিল মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র এতে কোনো সন্দেহ নেই, বিতর্ক নেই। আমরা আজকের দিনে সুখ ও সমৃদ্ধির উপকরণ হিসেবে যেসব ধন-সম্পদ ও সুবিধাদির কথা চিন্তা করি সেসব ধন-সম্পদ, তথ্যপ্রযুক্তি ও সুবিধাদি তো সেদিন ছিল না, সেদিন আজকের এ যুগের মত সম্পদের প্রাচুর্য, তথ্যপ্রযুক্তির অকল্পনীয় উন্নতি এসবকিছুই সে সমাজবাসীর কাছে ছিল না, তথাপি সে যুগে তাদের দ্বারা এ বিশ্বে যা ঘটেছে, সে বিস্ময়কর ঘটনা অর্থাৎ পার্থিব জীবনে মানুষের সম্ভাব্য সকল চাওয়া-পাওয়া যেমন সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি, ইজ্জত আর নিরাপত্তার দাবি পূরণ হয়েছিল সর্বোচ্চ মাত্রায় অথচ আজ বিশ্ব সম্পদে-বৈভবে শিক্ষা আর প্রযুক্তিতে, তত্ত্বে আর তথ্যে, জ্ঞান আর গরিমায় এত উন্নতি অর্জনের পরেও এ বিশ্বের কোথাও কী আছে সে যুগের মতো অথবা তার কণা পরিমাণও সুখ-শান্তি সমৃদ্ধি ইজ্জত আর নিরাপত্তা? আছে কী সে যুগের মতো উন্নত পর্যায়ের বা তার অযুতাংশ পরিমাণেও দয়া-মায়া, ত্যাগ-তিতিক্ষা মহানুভবতা-উদারতা, ঔদার্য, প্রেম-ভালোবাসা আর সৌহার্দের মতো মানবীয় উন্নত গুণাবলির উপস্থিতি? আমরা সবাই জানি নেই, কিন্তু কেন নেই?

এ প্রশ্নের উত্তর আর কেউ না জানুক অন্ততপক্ষে প্রতিটি নিষ্ঠাবান মুসলমান জানেন যে, সেদিন সেই পশ্চাৎপদ সমাজে যে জিনিসটির বাস্তব প্রয়োগ ঘটেছিল আজ সমাজের কোথায়ও সেই একই অনুঘটকের প্রয়োগ বাস্তবে না ঘটার ফলেই সভ্যতা গর্বিত এ বিশ্বের এমন নিদারুণ জিল্লতি। সাগরের তলদেশ হতে শুরু করে মহাশূন্য পাড়ি দেয়াসহ অনেক সফলতায় উদ্বেলিত, তথ্যপ্রযুক্তি আর সম্পদবৈভবে উপচে পড়া জলুসে সজ্জিত। পৃথিবীতে সেই একটিমাত্র কার্যকরণের অনুপস্থিতিই তার সকল সফলতা, সফল অর্জন আর তার সকল অহংকারকে শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। সেই একটিমাত্র কার্যকারণ হলো সমাজবাসী তথা বিশ্ববাসীর স্বপ্রণোদিত আত্মসমর্পণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার নিকট অর্থাৎ এক কথায় ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বা দীন হিসেবে স্বীকার না করা, মেনে না নেওয়াই হলো মানুষের ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক সকল দুঃখ-দুর্দশা, ব্যর্থতা আর জিল্লতির প্রধান এবং একমাত্র পুনরায় বলছি একমাত্র কারণ।

সেই স্বর্ণোজ্জ্বল সময়ে মানুষের জীবন, সমাজ, তথা ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন হতে শুরু করে সামষ্টিক জীবন, সামাজিক কর্মকাণ্ড, লেন-দেন, ওঠা-বসা, চলাফেরা, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড, এমন কি চিন্তা-চেতনাও অর্থাৎ জীবনের ছোট-বড়, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য সকল দিক তথা জীবন এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুই ইসলাম নামক দীন বা সিস্টেম্ দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হতো। সেখানে

www.pathagar.com

এমনটি কখনোই ঘটেনি যে, সেখানে মানুষের ধর্মীয় জীবন এর নামে কিছু লোকাচার ও পর্বাদি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ছিল ইসলাম এর হাতে আর জীবনের অন্যান্য দিক ছিল ভিন্ন কোনো বা ভিন্ন ভিন্ন সিস্টেমস এর হাতে। বরং সেখানেতো জীবনের এরূপ খণ্ডিত ধারণাই ছিল না যে মানুষের জীবন ধর্মীয় জীবন বা পারিবারিক জীবন বা সামাজিক জীবন অথবা রাষ্ট্রীয় জীবন এভাবে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাগে বিভক্ত হতে পারে। এর বিপরীতে সেখানে জীবন উক্ত সকল দিক ও বিভাগসহ একটি পূর্ণাঙ্গ ও অখণ্ড জীবনে অবিভাজ্য ধারণায় ও বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর এই অবিভাজ্য ও অখণ্ড জীবনের জন্য যে ব্যবস্থা বা সিস্টেম্ বা দীন তাঁদের সামনে ছিল তাঁরা সেটিকে যথার্থই একটি পূর্ণাঙ্গ দীন বা ব্যবস্থা বলেই জানতেন ও মানতেন। জীবন সম্বন্ধে এ ধরনের স্বচ্ছ-স্পষ্ট ও অখণ্ড চেতনা তাদেরকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হওয়া হতে রক্ষা করেছিল স্বাভাবিকভাবেই অর্থাৎ তাঁদের জীবনে আত্মিক ও বাহ্যিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়েছিল ও অক্ষত ছিল। আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা বলেছি যে, এ ধরনের স্থিতিশীলতায় একজন ব্যক্তির সার্বিক যোগ্যতা, মেধা ইত্যাদিসহ সকল মানবীয় গুণাবলি বিকাশের অপরিহার্য পূর্বশর্ত এবং এ ধরনের বিকশিত গুণাবলির ধারক-বাহকেরাই অনিবার্যভাবে বদমেজাজি খুনপিয়াসী। ওমর থেকে আমিরুল মুমিনীন ওমর (রাঃ), মাঠের অশিক্ষিত মেষ পালের রাখাল আম্মার থেকে সম্মানিত সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রাঃ), ডাকাত সর্দার ফুজাইল ও নিজামুদ্দীন থেকে প্রখ্যাত দরবেশ ফুজাইল (রহঃ) নিজামুদ্দীন আওলিয়াতে পরিণত হয়ে যান! এরকম লক্ষ লক্ষ প্রমাণ ইতিহাসে বিদ্যমান।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাওয়া উচিত, আর তা হলো ইসলামী শাসন আর মুসলিম শাসন অথবা ইসলামী শাসন আর মুসলমানদের শাসন এর মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। ইসলামী শাসন বলতে ইসলামী অনুশাসন বা রীতিনীতির পরিপূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা যে শাসন, তাকেই বোঝায়। এসব অনুশাসন বা বিধি-বিধান অপরিবর্তনীয় অলঙ্ঘনীয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলা ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, মনোনীত করেছেন, তাই এর যাবতীয় বিধি-বিধানও তিনিই দান করেছেন, তিনিই এসবের সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। ইসলামী শাসন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, এটির সকল প্রয়োজনীয় বিধানও সঙ্গত কারণেই আল্লাহ্পাক দিয়েছেন। শাসকবর্গ যতক্ষণ এই মৌলিক শর্তসমূহ ও বিধানাবলিকে অক্ষুণ্ন ও অপরিবর্তিত রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করে ততক্ষণ সে শাসন ব্যবস্থাটি ইসলামী শাসন হিসেবে পরিচিত হবার বা স্বীকৃত হবার যোগ্য থাকে, কিন্তু যে মুহূর্ত হতে শাসকবর্গ এসব মৌলিক ও অলঙ্ঘনীয় শর্তাবলিকে উপেক্ষা করে বা কিছু পরিমাণ হলেও পরিবর্তন করে, তাদের

www.pathagar.com

শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে সে মুহূর্ত হতে এই শাসন ব্যবস্থা হতে ইসলামী শাসন এর চেতনার লোপ বা বিলোপ ঘটে। সেটা হতে পারে, স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা বা রাজতন্ত্র বা অন্য কিছু কিন্তু তা কোনোক্রমেই ইসলামী শাসন ব্যবস্থা নয়। ঠিক এ কারণেই হযরত আলী (রাঃ)-এর শাসনামলের পর আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মাধ্যমে যে উমাইয়া রাজবংশের সূত্রপাত তাঁদের তথা স্বয়ং আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালকেও প্রকৃত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বলে সারা মুসলিম উম্মাহ্‌র কেউ কেউ স্বীকার করেন না। যদিও তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। অপরদিকে ঐ একই বংশের অপর একজন অধস্তন সম্মানিত শাসক ওমর বিন্ আব্দুল আজিজ (রহঃ)কে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ এক বাক্যে খলীফা এবং তাঁর শাসনকালকে (মোট দুই বছর পাঁচ মাস) ইসলামী শাসন বলে স্বীকার করেন।

শাসক মুসলমান হলেই তাঁর দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা হয়ে যায় না। বিষয়টির সংশ্লিষ্টতা হলো মৌলিক নীতি আদর্শ ও বিধি-বিধানের সাথে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অথবা তাদের একক বা সামষ্টিক পরিচিতির সাথে নয়। উমাইয়া খিলাফত, আব্বাসীয় খিলাফত ফাতেমী খিলাফত, ওসমানীয় খিলাফত অথবা মোগল শাসন বা সুদূর স্পেন এর মুর শাসন, যেখানকার ইতিহাসই তুলে আনুন না কেন, দেখবেন তাদের অনেকের শাসনামলে তারা অনেকে এমনসব রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যেসব পদক্ষেপসমূহ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা এর মূল স্পিরিট বা চেতনার সাথে সংশ্লিষ্ট তো নয়ই বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ছিল ইসলামী শিক্ষা, দর্শন ও আকিদার পরিপন্থী। আমাদের চোখের সামনে আওরঙ্গজেব এর শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস (যদিও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলাম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকদের হাতে পড়ে বিকৃত হয়েছে) বিদ্যমান, আবার এরই পাশাপাশি বাদশাহ আকবর এর শাসন ব্যবস্থা ও তার ইতিহাসও তো আমরা জানি। এ দুটো শাসন ব্যবস্থা কী এক করে দেখার কোনো সুযোগ আছে? যদিও উভয়ে নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করেছেন ও শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন।

মৌলিক এ পার্থক্যটুকু বুঝতে না পারার কারণে অথবা দৃষ্টির আড়ালে রয়ে যাবার কারণে অথবা স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায় স্বীকার না করার কারণে বিশ্ব ইতিহাসে মুসলিম শাসকদের আমলে তাদের দ্বারা সংঘটিত এমনসব ঘটনা, যা ছিল সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষা, দর্শন আর আকিদার পরিপন্থী, সেসব ইসলামী শাসন এর ইতিহাস হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে পরিচিত হয়ে আসছে বা কৌশলে একটি বিশেষ মহল কর্তৃক পরিচিত করানো হচ্ছে। এর ফলে এসব দেখে, শুনে-জেনে অমুসলিমরা এমন কি মুসলমান ঘরের অনেক সন্তানও "ইসলামী

www.pathagar.com

শাসন ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা, উপযোগিতা, বাস্তবতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্নে তোলেন, এটা প্রকৃত অর্থেই ইসলামের জন্য, বিশ্ব মুসলমানদের জন্য তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এক বিরাট দুর্ভাগ্যই বলতে হবে এবং এর পাশাপাশি ইবলিস ও তার অনুসারীদের এক বিরাট সফলতাও বটে।"

আজকের বিশ্বে প্রায় সাতান্নটি মুসলিম দেশের কোনোটিতেই পরিপূর্ণ ইসলামী শাসন কায়েম নেই, কিন্তু পশ্চিমা ও অমুসলিম বিশ্ব, এমনকি কোনো কোনো মুসলিম দেশও। এসব মুসলিম দেশসমূহের মধ্য হতে কোনো কোনোটিকে ইসলামী শাসন এর দেশ বলে চালিয়ে দেয় বা দিচ্ছে। কিন্তু কে না জানে যে, আজকের এসব মুসলিম দেশসমূহের দুএকটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণই সুশাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত অধিকাংশই অতি সচেতনভাবেই ইসলামী শাসন এর কট্টর বিরোধী, নিজেদের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ ক্ষুণ্ন হবার ভয়ে। বরং তারাই হলেন এ পথে সবচেয়ে বড় বাধা। বাস্তবিকই কাফির- মুশরিকেরা আজ আর মুসলিম জনমানসের নিকট ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পথে কোন ফ্যাক্টর নয়, কারণ তারা তাদের নিজেদের ব্যর্থতা ও অপারগতায় এতটা বেশি কালিমালিপ্ত ও হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত যে, মুসলিম বিশ্ব যদি সত্যিকারভাবেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে বা বাস্তব পদক্ষেপ নেয় তা হলে সমগ্র বিশ্বের সম্মিলিত কুফরি, মুশরেকি শক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টাও এ পথে কোনো কার্যকর বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না এটা দিবালোকের মতো বাস্তব সত্য। কিন্তু সমস্যা হয়েছে উল্লিখিত মুসলিম নামধারী শাসক তাদের গোষ্ঠী ও অনুসারী দল, উচ্ছিষ্টভোগী চেলা-চামুণ্ডরা। এরা মুসলমান পরিচয়ে, মুসলমান জনগোষ্ঠীর নেতা এবং ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম সেজেই ইসলাম তথা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় ও কার্যকর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বস্তুত আমরা যখন ইসলামী শাসন এর কথা বলি তখন এ কথাই বোঝাতে চাই যে, প্রকৃত অর্থেই ইসলামী বিধি-বিধান তথা ইসলামী জীবন পদ্ধতি শাসক ও প্রজাবর্গ সকলের ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক, পারিবারিক বা সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক অর্থাৎ মনুষ্য জীবনের সার্বিক দিক যুগপৎভাবে নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করছে। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ যেসব বিধি-বিধান বা আইন-কানুন দিয়ে দেশ, সমাজ বা রাষ্ট্র ও তার আওতাধীন সকল নাগরিকের জীবনকে শাসন করছেন, সেই একই বিধি-বিধান এবং আইন-কানুন দ্বারা তারা নিজেরাও একই সাথে শাসিত হচ্ছেন বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ও বিচ্যুতি ব্যতিরেকে। আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এসব বিধি-বিধান ও আইন-কানুনগুলো হলো ইসলামের সেইসব মৌলিক বিধি-বিধান ও নির্দেশসমূহ, যা ইতোপূর্বে আমরা

www.pathagar.com

অলঙ্ঘনীয়, অপরিবর্তনীয় এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে অভিহিত করেছি। শাসক এখানে বিধান রচনাকারী নন, বরং তিনি এসব বিধি-বিধানসমূহকে বাস্তবে প্রয়োগকারীর ভূমিকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত মাত্র। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, লাভ-ক্ষতি, চাওয়া-পাওয়ার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে উঠে তিনি এখানে বিধান রচনাকারীর একজন প্রতিনিধি মাত্র।

অধুনা বিশ্বে জেনে-বুঝে যেখানে পরিকল্পিতভাবে, অসৎ উদ্দেশ্যে তাড়িত হয়ে ইসলামী শিক্ষা তথা ইসলাম এর বিরুদ্ধে বিরতিহীন প্রচার প্রোপাগান্ডা চালু রয়েছে, সেখানে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এসব অপপ্রচার চিৎকার আর বিষোদ্‌গার হলো মল্লযুদ্ধে রত সেই তরুণের মতো, যার আসন্ন পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গেছে প্রতিপক্ষের হাতে। বাস্তবিকই বিগত প্রায় দুটি শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় রেনেসাঁ, ফরাসি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব এবং কম্যুনিষ্ট বিপ্লব" ইত্যাদি পরিচয়ে তথাকথিত বিপ্লব এর নামে গালভরা চটকদার বুলি আওড়িয়ে এ বিশ্ববাসীকে, বিশ্বের সমস্যা নিপীড়িত, রোগশোক, ক্ষুধাজরা'য় জর্জরিত জনসাধারণকে মুক্তি-প্রগতি-শান্তি আর নিরাপত্তার কথা বারংবার শোনানো হয়েছে অবিরামধারায়, বিরতিহীনভাবে। কিন্তু আফসোস্। বিশ্বের জনগণ সেই বহু কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত সুখ-শান্তি, মুক্তি-সমৃদ্ধি আর সার্বিক নিরাপত্তা তো পায়ই নি, বরং তাদের সমগ্র জীবন পূর্বের চেয়ে আরও বেশি করে সমস্যাকবলিত হয়েছে, তাদের এবং তাদের বংশধরদের সার্বিক নিরাপত্তা আরও বেশি করে বিঘ্নিত হয়েছে। সাধারণ এ জনগোষ্ঠী বার বার মিথ্যে আশার বাণীতে প্রতারিত ও আশাহত হয়ে অবিশ্বাস, অনাস্থা আর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের আশার বাণী শোনানো সেইসব মহান নেতাদের প্রতি ভ্রু-কুঞ্চিত করে তাকিয়েছিল বহু পূর্বেই, কিন্তু অধুনা বিগত পাঁচ কি ছয়টি অথবা বড়জোর আট দশক ধরে এমন অবস্থা ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, ভ্রু-কুঞ্চিত করে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা প্রতারিত ও আশাহত সেই জনগোষ্ঠীটি ঘৃণ্য আর অবজ্ঞায় তাদের সেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে দলে দলে দৃঢ় পায়ে সকল ভয়-ভীতি আর অপপ্রচারের সয়লাবকে উপেক্ষা করে পূর্ণ সদিচ্ছা-নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার সাথে সর্বজনীন ও শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের কোলে আশ্রয় নিয়ে ধন্য হতে শুরু করেছে, আর এই ঘটনাই তথাকথিত প্রগতিবাদী ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, তথা ইসলাম বিদ্বেষী মহলের গাত্রদাহের কারণ। উক্ত মহলটি বিশ্বব্যাপী জালের মতো বিস্তৃত সকলপ্রকার প্রচার মাধ্যম জুড়ে তার স্বরে চিৎকার শুরু করেছে নয়া নয়া চটকদার ও নেতিবাচক বিশেষণে ইসলামকে বিশেষিত করে, মনের সকল ক্ষোভ, ঘৃণা আর উষ্মার প্রকাশ ঘটিয়ে, মল্লযুদ্ধে প্রতিপক্ষের হাতে বেদম মার খেয়ে নিশ্চিত আসন্ন পরাজয়ের সম্মুখীন দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য সেই তরুণের মতো।

আজ খোদ অমুসলিম দেশসমূহের প্রায় প্রতিটি দেশেই একটি উল্লেখযোগ্য

www.pathagar.com

সংখ্যক জনগোষ্ঠীই মুসলমান। এ সংখ্যা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধির দিকে ধাবিত হচ্ছে অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে। বিগত শতাব্দীতে ১৯৩৪ সাল হতে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত, অর্ধশতাব্দী সময়কালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এ বিশ্বে অন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের তুলনায় ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের অর্থাৎ মুসলমান বৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা বেশি। বিশ্বে এ সময়কালের মধ্যে খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী বেড়েছে শতকরা ৪৭জন, হিন্দুধর্মের অনুসারী বেড়েছে ঐ একই সময়কালে শতকরা ১১৭জন, অথচ এর বিপরীতে ঐ একই সময়কালে মুসলিম বৃদ্ধির হার রীতিমত চমকে দেবার মতো। এই সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা হিসেবে ২৩৫জন। (দেখুন THE CHOICE. BY AHMAD DEEDAT, znd VoLUME, PAGE NO 133.

পুরাতন বা নতুন নির্বিশেষে এসব মুসলমান যে খুব শীঘ্রই সংঘটিত হয়ে তাদের নিজেদের, তথা তাদের সমাজকে ইসলামী শাসন এর আওতায় ঢেলে সাজাবে, অর্থাৎ তারা ইসলামকে শুধুমাত্র একটি ধর্ম এ প্রতিষ্ঠিত ধারণা হতে মুক্ত করে, একটি সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এ ধারণায় বাস্তবে রূপ দিয়ে দেখাবে তা বলাই বাহুল্য। এ প্রক্রিয়া আধুনিক বিশ্বে যে শুরু হয়েছে শুধু তা নয় বরং এ প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়েছে সফলতার পথে, সে কথা লোকমুখে শোনা বা পত্র-পত্রিকায় জানার দরকার নেই, সমগ্র বিশ্ববাসী তা প্রত্যক্ষ করছে তাদের চোখের সামনেই। আফগানিস্তানে কুড়ি লক্ষ শহীদের আত্মাহুতির বিনিময়ে রুশ পরাশক্তির শোচনীয় পরাজয় এবং এরপরে সমগ্র বিশ্বের রক্তচক্ষু, হুমকি-ধমকি, ভয়-ভীতি, প্রলোভনকে চরম সাহসীকতার সাথে উপেক্ষা করে সেখানে ইসলামী শাসন কায়েম, চেচনিয়ার মুসলমান যাদের বর্তমান জনগোষ্ঠীর প্রায় শতকরা একশতজনই তাদের পুরো জীবনকালই ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইসলামী সমাজ তথা ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল চেতনা হতে দূরে থেকেছে বা থাকতে বাধ্য হয়েছে, সেসব মুসলমানদের মধ্যেই ইসলামী জজবার বিস্ময়কর উত্থান অথবা ঐশ্বর্য, সুখ আর বিলাসবহুল জীবনের সকল মায়া, লোভ-প্রলোভনকে উপেক্ষা করে, দুপায়ে ঠেলে নিজের কোটি কোটি টাকার সমুদয় সম্পদ ইসলাম কায়েমের পথে অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে পাহাড়ের গুহায় বছরের পর বছর শুকনো রুটি খেয়ে দিনাতিপাত করার মতো কষ্টকে হাসিমুখে, অম্লান বদনে স্বীকার করে নেবার মত ওসামা বিন লাদেনদের আবির্ভাব অথবা ইসরাঈলি বর্বর সৈন্যবাহিনীর অত্যাধুনিক ট্যাংক ও কামান বহরের সামনে মাত্র সাত বছর বয়সী মুসলিম শিশুর খালি হাতে পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো বিস্ময়কর ঘটনাবলি তো সেই সত্যেরই স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে।

www.pathagar.com

এরকম একটি আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এসে বিশ্বব্যাপী মুসলিম চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উচিত ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে যে কয়টি মৌলিক ভিত্তির ওপরে ভর করে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, সেসব মৌলিক নীতি তথা মৌলিক বিধি-বিধানসমূহকে সহজ, সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল বোধগম্য ভাষায় উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণসহ সর্বশ্রেণীর মানুষদের কাছে তুলে ধরা।

এ পদক্ষেপ দ্বারা এ বিশ্ব দুভাবে লাভবান হবে। প্রথমতো এই যে, মুসলিম উম্মাহর যেসব সদস্য (তারাই সংখ্যায় বেশি) ইসলামী শাসন ও মুসলিম শাসন এর গোলক ধাঁধায় পথহারা ও বিভ্রান্ত হয়ে হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত, তাঁদের দৃষ্টির সম্মুখ হতে একটা বড় ভুল এর অপসারণ ঘটবে। এর পাশাপাশি এই গোষ্ঠীটি অতি দ্রুত নিজেরাই নিজেদের কল্যাণের জন্য ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যমী, উদ্যোগী হয়ে ওঠবে। আর দ্বিতীয় যে লাভটি হবে, তা হলো এই যে, ইসলামবিরোধী জনগোষ্ঠী কল্যাণকর ও বাস্তবধর্মী একটি সমাজ ব্যবস্থা তার বিভিন্ন দিক, এরকম শাসন ব্যবস্থার আওতায় ছোট-বড় সকল শ্রেণীর নাগরিকের জীবন-মান ও মূল্যায়ন, সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি আর নিরাপত্তা (যা ধর্ম-বর্ণ, স্থান, কাল-পাত্র নির্বিশেষে প্রতিটি মানব সদস্যের একমাত্র প্রধান আকাঙ্ক্ষা। এসবের সম্ভাব্যতা ও নমুনা দেখতে পেলে তাদের মধ্য হতে বিবেকবান একটি গোষ্ঠী দ্রুত ইসলামের পানে আকৃষ্ট হবে। শুধু বিবেকবান গোষ্ঠীই বা বলি কেন। বরং সেসব জনসাধারণও যারা রাজনৈতিক, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে জুলুম আর নিষ্পেষণের শিকার হয়ে আছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর যুগের পর যুগ। ইসলামী শাসন এর বাস্তব ফলাফল দেখতে পেলে তারা সকল বাধা-বিপত্তি, সকল লোভ, মোহ ও পিছটান ফেলে ছুটে আসবে ইসলামের দিকে ঠিক সেইভাবে, যেভাবে মদীনার আনসারগণ ছুটে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন ইসলামের কোলে, পাছে মদীনার ইহুদিরা ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদেরকে পেছনে ফেলে দেয়। এই চেতনা আর ব্যগ্রতা নিয়ে।

এই চেতনার একমাত্র কারণ হলো এখানে অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় মুক্তিকামী জনতার বহুল আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির নিশ্চিত গ্যারান্টি রয়েছে। প্রত্যাশিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাধ্যমে সকল ধরনের পরাধীনতা হতে শৃঙ্খল মুক্তির পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা রয়েছে। বস্তুত ইসলাম এর আগমনই হলো মানুষের মুক্তি কে নিশ্চিত করার জন্য। আর মুসলমানদের সামষ্টিক ও জাতিগত মিশনও হলো বৃহত্তর মানবতাকে তথা সমগ্র বিশ্বের মজলুম ও নিপীড়িত মানবকুলকে মুক্তির ঠিকানা দেখানো। আর তারা এ কাজটি করে তাদের শাসন ব্যবস্থা তথা তাদের আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র ক্ষমতা দ্বারা। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার এই মহান ও মৌলিক

www.pathagar.com

দর্শনটির একটি চমৎকার প্রমাণ ও দলিল হিসেবে আমরা উপস্থাপন করতে পারি। পারস্য বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সাদ বিন আবিওয়াক্কাস (রাঃ) কর্তৃক পারস্য দরবারে প্রেরিত দূত হযরত রাবীই-বিন্-আমের (রাঃ) ও পারস্য সম্রাট রুস্তম এর মধ্যে সংঘটিত কথোপকথনের সেই ইতিহাসখ্যাত ঘটনাটি।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম : একটি সংবিধান

পৃথিবীর বুকে যেখানেই যখন কোন শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়, তখন অবশ্যই তার জন্য প্রয়োজন হয় কিছু রীতিনীতি, বিধি-বিধান, এসব রীতিনীতি বা বিধানাবলিকেই আমরা আইন বলে জানি। এ বিশ্বে একটা সময় ছিল, যখন রাজা-বাদশাহ্‌রা তাদের ইচ্ছামত দেশ চালাতেন। তারা যা চাইতেন বা যা বলতেন নির্দেশ আকারে, সেটাই ছিল উক্ত রাজার আওতাধীন রাজ্যের জন্য আইন বা বিধি-বিধান। তাদের কথাই ছিল রাজ্যের সংবিধান। রাজা-বাদশাহ্‌গণ এক্ষেত্রে প্রজাসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া ও তাদের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য ছিলেন না, দিতেনও না। তারা দেখতেন তাদের নিজ ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠী স্বার্থ। নিজেদের আরাম-আয়েশ, সুখ-সুবিধা নিশ্চিত করা ও নির্বিঘ্ন রাখার জন্য যে কোন নির্দেশ জারি করতে পারতেন যা আইন হিসেবে মর্যাদা পেত। ইচ্ছা হওয়া মাত্র জনগণের ওপর ট্যাক্স ধার্য করতে, বাড়াতে পারতেন। জনগণ সে বর্ধিত ট্যাক্স বা কর দিতে পারবে কিনা বা দেবার ক্ষমতা রাখে কিনা, এখানে সেটা গৌণ বিষয়, মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াত এই যে, কর আদায় হলে রাজার ভাণ্ডার তথা টাকশাল পূর্ণ হবে, স্ফীত হবে যা প্রকারন্তরে তার ও তার পরিবারসহ গোষ্ঠীর ভোগ-বিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে অবদান রাখবে। রাজা-বাদশাহ্ যখন নতুন কর ধার্য করেছেন বা প্রচলিত করের পরিমাণ বর্ধিত করেছেন, প্রয়োজন বুঝেছেন বলেই করেছেন, কাজেই সেটাই আইন। এর প্রতিবাদ করা, এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করা, অথবা এ কর-ট্যাক্স না দেয়া বা দিতে না চাওয়া, এসব হলো দেশের আইনের সুস্পষ্ট লংঘন। দণ্ডনীয় অপরাধ!!

সভ্যতার এক পর্যায়ে এসে সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষ তাদের দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র কীভাবে বা কোন আইন-কানুনের ভিত্তিতে চলবে, তা পূর্ব হতেই নির্ধারণ করে নিতে শুরু করে এবং এই পূর্ব নির্ধারিত বিধি-বিধানগুলোই লিখিত আকারে রাখা হয়, সংরক্ষণ করা হয়। এটাকেই আমরা সংবিধান বলে জানি। (এখানে প্রসঙ্গত এ কথাটিও বলে রাখা দরকার যে, এ বিশ্বে মানব

www.pathagar.com

ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধানটি প্রদান করেছিলেন ইসলামের নবী, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায়। সর্বপ্রথম দেশে লিখিত সংবিধান প্রণয়ন, ইসলামেরই অমর কীর্তি। আজ প্রতিটি দেশে দেশে তাদের নিজস্ব সামাজিক চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষা-দর্শন বিশ্বাস ও ব্যক্তি এবং সামষ্টিক জীবনে অর্জনীয় লক্ষ্যকে সামনে রেখে লিখিত সংবিধান রচনা করে থাকে, এসব সংবিধানকে প্রতিটি দেশই অতি পবিত্র জ্ঞান করে থাকে। জাতীয় নেতা-নেত্রী ও দেশের কর্ণধারগণ সময় সুযোগ পেলেই তাদের ভাষণে-বিবৃতিতে তাদের বুকের রক্ত দিয়ে হলেও এ মহা পবিত্র সংবিধানকে রক্ষা করার দৃপ্ত প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। নতুন করে তাদের শপথকে নবায়ন করে থাকেন!!

সংবিধান হলো আইনের লিখিত সামষ্টিক রূপ একটি গ্রন্থ। এখন একটি গ্রন্থ এটি, যাতে সমাজে বা রাষ্ট্রে অনুসৃতব্য ব্যক্তি বা সমষ্টি সকলের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান তথা আইনকে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। প্রতিটি সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র-ই তাদের নিজ নিজ দেশের সংবিধানকে মহান ও পবিত্র বলে জাহির করতেও সে ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট থাকে। এই পবিত্র সংবিধানই তো কোনো দেশ বা সমাজে তার বুকে লিপিবদ্ধ সাংবিধানিক ধারা বা সাংবিধানিক আইন এর বলে সেখানে পতিতাবৃত্তি চালানোর অনুমতি প্রদান করে। এই পর্হিত কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ তাদের দোসর ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা সুবিধা ও আইনগত সহায়তা প্রদান করে থাকে আর সকলপ্রকার সুস্থ বিবেক বর্জিত এ ঘৃণিত অপবিত্র কাজটিকে টিকিয়ে রাখে!

কোনো কোনো দেশ ও সমাজে তথাকথিত পবিত্র এই সংবিধান এর সাহায্য নিয়েই আরও জঘন্য, সভ্যতার জন্য কলঙ্কজনক কর্মকাণ্ড সমকামিতা কে বৈধ বলে, আইন সিদ্ধ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইডেনসহ বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশে) তা চালু রাখা হয়েছে এবং সমাজে এর বিস্তার ঘটানো হচ্ছে মহামারির আকারে। এ কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, সহজসাধ্য করা হচ্ছে আইনগত, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে, এর বিরোধিতা করাকে রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। মানবতার জন্য অভিশাপরূপী এ কর্মকাণ্ড ঐ সমস্ত সমাজকে কতটা গ্রাস করেছে সে কথা উপলব্ধি করার জন্য শুধু মাত্র এটুকু জানা-ই যথেষ্ট যে, একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মাত্র শহর নিউইয়র্ক এর মোট পুরুষ জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ পুরুষই হলো সমকামী। বিস্ময়ে হতবাক হবার মতো এ তথ্যটি দিয়েছেন বিখ্যাত তার্কিক ইসলাম প্রচারক, বিগত শতাব্দীর একজন অন্যতম খ্যাতিমান দায়ী ইলাল্লাহ্ শেখ আহমদ দীদাত, তাঁর

www.pathagar.com

লেখা গ্রন্থ "THE CHOICE" এ। (দ্রঃ THE CHOICE, VOL II, PAGE NO 77, BY AHMAD DEEDAT, SOUTH AFRICA)

যদি একটিমাত্র শহরের চিত্র-ই এই হয়, তা হলে ঐ দেশের বাহান্নটি অঙ্গরাজ্যের আনাচে-কানাচে না জানি লুকিয়ে আছে আরও কত বীভৎস ও জঘন্য চিত্র!

এ হলো দুটি নমুনামাত্র, বিভিন্ন দেশের সংবিধান ঘাঁটাঘাঁটি করলে বহু পুঁতি গন্দময় অপবিত্র ও জঘন্য কর্মকাণ্ডকে বৈধ ও আইনসিদ্ধ করার চিত্র পাওয়া যাবে, সেসব কর্মকাণ্ডকে সৃষ্টির সূচনাকাল হতে স্থান, কাল, পাত্র, ধর্ম, বর্ণ-গোত্র, সমাজ, ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রতিটি সুস্থ ও বিবেকসম্পন্ন মানুষই অন্যায়, অশ্লীল ও অপবিত্র বলে জেনে ও মেনে এসেছে।

প্রশ্ন হলো, এ ধরনের অপবিত্রতাকে ধারণ করে কী কোনোদিন কোনো সংবিধান পবিত্র বলে স্বীকৃত হতে পারে? কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা স্থান ততক্ষণ কী করে পবিত্র বলে বিবেচিত হয়, যতক্ষণ তার গায়ে বিন্দু পরিমাণ অপবিত্রতার সংশ্লিষ্টতা বজায় থাকে? মানবতার কি নির্মম ও নিদারুণ জিল্লতী যে পবিত্র-অপবিত্রের চিরন্তন ও স্বতঃসিদ্ধ ধারণাটিকেও আজ অক্ষত রাখা হয় নি!

যারা সংবিধান রচনা করেন তারা মানুষ। এবং এই মানুষই (এক বা একাধিক) মূলত সংবিধান এর সাথে আইন রচনা করেন। অর্থাৎ বিশ্বের দেশে দেশে প্রচলিত সংবিধানগুলো আর কিছুই নয়, তা হলো মনুষ্য রচিত আইনের সামষ্টিক রূপ (Collective Form) যারা এ গ্রন্থ রচনা করেন এবং তারা যে জনগোষ্ঠীর পক্ষ হতে প্রতিনিধিত্ব করেন, তাদের সম্মিলিত রুচি, বিশ্বাস, শিক্ষা ও দর্শনেরই চিত্র ফুটে ওঠে রচিত উক্ত সংবিধান নামক আইনের গ্রন্থটিতে।

এখন প্রশ্ন হলো, মানুষ কী মানুষের জন্য আইন রচনা করতে পারে? সে ক্ষমতা ও যোগ্যতা কী মানুষের আছে? সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে যদিও খুবই বিস্ময়কর, তবুও একটি দুর্বলতম সৃষ্টি হলো এই মানুষ। সে জানে না আগামীকাল কী ঘটবে? সে জানে না তার দৃষ্টি সীমারেখার বাইরে কী আছে? সে বাইরের পৃথিবীকে জানাতো দূরের কথা, তার নিজের সত্তাকেই কী সে পূর্ণরূপে জানে? সে কী বোঝে সে কী চায়? আজ তার যেটা চাওয়া, কালই যে সেই একই বস্তু তার নিকট চরম ঘৃণ্যতম ও বর্জনীয় একটি বিষয়ে পরিণত হবে না, সে বিষয়ে কী সে পূর্ণমাত্রায় নিশ্চিত? বস্তুত পক্ষে তার অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দুর্বলতা, ত্রুটি ও অক্ষমতা এত বিরাট ও ব্যাপক যে সে তারমত অপর কোনো মানুষের জন্য তো দূরের কথা এমনকি তার নিজের জন্যও কোনো আইন

www.pathagar.com

তৈরি করতে পারে না বা তার যোগ্যতা রাখে না, এটা তার জন্মগত ও সত্তাগত কিংবা তার স্বভাবজাত দুর্বলতা, তবে এটি মানুষের ব্যর্থতা নয়, এটি দোষেরও নয়।

এ কাজের ক্ষেত্রে সে কীভাবে দুর্বল, কতটুকু দুর্বল এবং কোন কোন কারণে তার এই দুর্বলতা, যার ফলে সে আইন রচনা করতে পারে না বা তা করার মতো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা রাখে না, তা আলোচনা করতে হলে পৃথক একটি গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন পড়ে (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আমার লেখা "মানব সম্পদ উন্নয়নে আল-কুরআন"। দয়া করে সেটি পাঠ করে দেখুন) বিধায় এখানে সে কথার বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও আলোচনা করার সুযোগ নেই। আমরা শুধু এ কথাটি দ্বিধাহীন চিত্তে ও অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার ও ঘোষণা করতে চাই যে, মানুষের অনেক সফলতা, সক্ষমতা-ক্ষমতা আছে, সে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে ও করতে পারে, এটা ঠিক, কিন্তু এর বিপরীতে এটাও ঠিক যে, এ বিশ্বে এখন অনেক কিছুই আছে, যা মানুষের সকলপ্রকার ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক শক্তি যোগ্যতা ও ক্ষমতার বাইরে। এটা মানুষের মানবীয় দুর্বলতা আর এই দুর্বলতার মধ্যে এটিও একটি যে, সে নিজের বা অপরের জন্য তখনই কোনো ধরনের আইন তৈরি করতে পারে না। কোনো আইনের উৎস সে হতে পারে না।

সংক্ষেপে আমরা অন্তত এটুকু বুঝে নিতে পারি যে, মানুষ নিরপেক্ষ নয়, সে দয়া-মায়া, কাম-ক্রোধ, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, দয়া-মায়া ও প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদির ধারক। সে তার সমগ্র জীবনব্যাপী এসব দোষ-গুণ দ্বারা প্রতিনিয়তই প্রভাবিত হয়ে থাকে। সে ক্রোধে ফেটে পড়ে, আবেগে উদ্বেলিত হয়, খুশিতে আটখানা হয়ে পড়ে আবার দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়। দয়া-মায়ার প্রভাবে যেমন ত্যাগী হয় তেমনি এর বিপরীতে আবার লোভে লালায়িত হয়, আবার অন্য দিকে হিংসা-বিদ্বেষ এর কারণে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে। এতকিছুর দ্বারা সে খুব সহজে প্রতিনিয়তই প্রভাবিত হবার ফলে সর্বদাই কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের পক্ষে ঝুঁকে পড়ে নয়তো কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের বিপক্ষে চলে যায়। সমগ্র জীবনব্যাপী এমনটি চলতে থাকে, এ প্রক্রিয়া মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যতক্ষণ জীবন টিকে থাকে ততক্ষণ তাকে ঘিরে এ ধারা চালু থাকে। ফলে এটা নিরেট বাস্তবতা যে, মানুষ তার জীবনে কোনও নিরপেক্ষ হতে পারে না। সে তার দৃষ্টিতে হয় সত্যের পক্ষে থাকে নয়তো থাকে সত্যের বিপক্ষে অর্থাৎ বাতিলের পক্ষে এ উভয় অবস্থার মধ্যবর্তী কোন অবস্থান এখন নেই, যাকে আমরা নিরপেক্ষ বলে অভিহিত করতে পারি। মানুষ কখনোই এম· অবস্থানে উন্নীত হতে পারে না অর্থাৎ যে তার ···গ্র জীবনে এক তিল মুহূর্তে জন্যও নিরপেক্ষ হতে পারে না।

www.pathagar.com

মানুষ যেহেতু নিরপেক্ষ হতে পারে না সেহেতু সে যদি কোনো বিধি-বিধান বা আইন-কানুন তৈরি করে তবে তা অবশ্যই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হবে। তার তৈরি আইন তার নিজ দেশের বা নিজ গোষ্ঠী বা গোত্র অথবা নিজ ধর্ম ও ভাষা-ভাষি অথবা নিজ ব্যক্তি বা বংশীয় স্বার্থরক্ষা করতে যেয়ে একই সঙ্গে অপর দেশ অথবা জাতি, অপর গোষ্ঠী অথবা বংশ বা পরিবার অথবা অপর ব্যক্তির স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করবে তাদের অধিকারকে পদদলিত করবে। মানুষ রচিত আইন যেমন সর্বজনীন হতে পারে না, তেমনি তা উক্ত আইন রচনাকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমকালীন সময়কালকে অতিক্রম করে কালোত্তীর্ণ হতে পারে না। ফলে মনুষ্য রচিত আইন সর্বজনীন হবার পরিবর্তে একটি বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর জন্যই সীমাবদ্ধ হবে। একই সাথে এই আইন কালোত্তীর্ণ হবার পরিবর্তে একটি বিশেষ কাল বা সময়ের জন্য হবে (এ ছাড়াও মনুষ্য রচিত আইন অতি অবশ্যই তা রচনাকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মানবীয় মৌলিক ত্রুটিগুলোকে, চিন্তা, দর্শন, শিক্ষা-বিশ্বাস এর অপূর্ণতাসহ সকল ত্রুটিকে অবশ্যই ধারণ করবে, ফলে তাদের রচিত আইন-কানুন অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য) এসব কারণেই বিশ্বের প্রতিটি দেশে দেশে শাসনক্ষমতা অধিষ্ঠিত শাসক গোষ্ঠী বা সমাজের উত্থান-পতন, আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন সংবিধান-সংশোধনী এর নামে সংবিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে। সংবিধানে বর্ণিত আইনের রচয়িতাগণই নিজেদের গরজে নিজেদের হাতেই এ আইনকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বর্জন বা সংশোধন করেন। আজ পর্যন্ত কোনো সংবিধান রচনাকারী ব্যক্তি-গোষ্ঠী কেউই দাবি করেন নি। তাদের রচিত সংবিধানটি চিরন্তন, পরিবর্তনযোগ্য নয়।

সর্বকালে, সর্বযুগে, সর্বস্থানে ও সকলের জন্য পক্ষপাতহীন, চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় বিধি-বিধানই হলো উন্নত, সর্বজনীন ও কালোত্তীর্ণ আইন-কানুন। এসব বিধি-বিধান বা আইন-কানুনগুলো সকলপ্রকার ত্রুটি ও দুর্বলতা হতে মুক্ত হবার পাশাপাশি মানুষের স্বাভাবিক সহজাত সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোকে লালন করবে, তা বিকাশের পথে সহায়ক হবে এবং মানুষের মধ্যে যতরকম নেতিবাচক ও অকল্যাণকর প্রবৃত্তিসমূহের অস্তিত্ব কল্পনা করা যেতে পারে, সে সবগুলোকে দূর করতে বা অবদমিত করে রাখতেও সে সক্ষম হবে। এসব বিধি-বিধানগুলো এমন হবে যে, তা প্রতিটি মানুষকে তার স্থান-কাল-পাত্র, বর্ণ-ভাষা-কৃষ্টি, ধর্ম-গোত্র-বংশ এসব কিছুর উর্ধ্বে উঠে মানুষের একটিমাত্র মূল পরিচয় মানুষ হিসেবে সর্বজনীন পরিচিতিতে গ্রহণ করবে এবং সেই সাথে তার সকল মৌলিক অধিকার এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে ও তা পূরণের জন্য পূর্ণমাত্রায় সক্ষম হবে। অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-অবিচার ও শোষণ তাকে রক্ষা করবে, এ ক্ষেত্রে তার

www.pathagar.com

গোত্র-ধর্ম, বর্ণ-ভাষা-কৃষ্টি ইত্যাদি কোনো কিছুতেই সে গ্রাহ্য করবে না। বরং এর বিপরীতে তাকে বিবেচনা করতে তার একটি মাত্র সর্বজনীন পরিচয় মানুষ এবং শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে।

মানুষের কিছু অধিকার এমন থাকে যা শুধুমাত্র কিছু মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট, কিছু অধিকার তার এমন থাকে, যা শুধুমাত্র রাষ্ট্র সরকার বা প্রশাসন এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কিছু অধিকার এমনও থাকে, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল অর্থাৎ পুরো মানবজাতির সাথে সংশ্লিষ্ট। এসব অধিকারগুলোর সবই তার জন্মগত তথা সৃষ্টিগত অধিকার, মানুষ হয়ে জন্মাবার কারণে সে এসব অধিকারের হকদার হয়েছে। কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ প্রশাসন বা রাষ্ট্র এসব অধিকারকে সংকুচিত করতে বা বাতিল করতে পারে না, আইন এমন হওয়া উচিত যে, মানুষের এসব মৌলিক অধিকারসমূহকে সংকোচন, বাতিল বা পরিবর্তন করার যেকোনো প্রচেষ্টা আইন দিয়েই রোধ করা যাবে। এসব অশুভ প্রচেষ্টা যত ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা শক্তিশালী রাষ্ট্র বা শাসনের পক্ষ হতেই হোক না কেন! যখনই হোক না কেন বা যে স্থানেই হোক না কেন। বর্তমান বিশ্বে উন্নত-অনুন্নত যেকোনো দেশেই হোক না কেন প্রচলিত আইন-কানুন উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি হতে নিদারুণভাবে বঞ্চিত। প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্রের আওতায় প্রচলিত সবকটি আইন-কানুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণের জায়গা এটা নয়, এখানে সে সুযোগও নেই। আমি বরং এর স্বপক্ষে পশ্চিমা একজন দার্শনিকের উক্তি এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি। পশ্চিমা জগতে বর্তমান সময়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বহুল আলোচিত এক দার্শনিক, Oxford, Cambridge এবং Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, যার রচিত প্রায় পঁয়তাল্লিশটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ বিশ্বের প্রায় ২৭টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং তাঁর কোনো কোনো বই বিশ্বে Best seller এর মর্যাদা পেয়েছে। সেই জগৎবিখ্যাত পশ্চিমা দার্শনিক Dr. Edward De bond তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ Parallel Thinking এর ভূমিকায় লিখেছেন।

"In a changing world, western thinking is failing. It is failing not because it is being applied ineffectively but because there are deep-seated inadequacies and dangers in the system it self."

ভাবানুবাদ : পরিবর্তনশীল বিশ্বে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-দর্শন ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। তা ব্যর্থ হচ্ছে এই কারণে নয় যে, তা প্রয়োগে কোনো ত্রুটি করা হচ্ছে, বরং তা ব্যর্থ হচ্ছে এই কারণে যে, এর গভীরে প্রোথিত রয়েছে অপূর্ণাঙ্গতা,

www.pathagar.com

(চিন্তা-চেতনার) এই পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে এই বিপদ। (দ্রঃ Parallel thinking, By edward de bond, published by Viking, 1994, ISBN 0-670-85126-4, ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

অন্যত্র তিনি বলেন– In a rapidly changing world traditional thinking system is failing because it was never designed to deal with change. The system is inadequate, it is dangerous. It is complacent.

ভাবানুবাদ : দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রচলিত দর্শন পদ্ধতি (চিন্তা-চেতনা) ব্যর্থ হচ্ছে– কেননা, এটা কখনই এভাবে তৈরি করা হয়নি যাতে তা বিবর্তনের সাথে খাপ খেতে পারে। এ পদ্ধতিটিই অপূর্ণ, বিপৎসংকুল এবং (মিথ্যা) আত্মপ্রসাদে ভরপুর! (দ্রঃ ঐ, ভূমিকা)

যে চিন্তা-চেতনা, পদ্ধতি আর দর্শনকে ভিত্তি করে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব, এমনকি সমগ্র বিশ্বব্যাপী আইন-কানুন, সমাজ ও শাসন পদ্ধতি গড়ে ওঠেছে সে সম্বন্ধে তাদের নিজেদের এ অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তির পাশাপাশি আসুন আমরা এটাও দেখি যে, ঐ পশ্চিমা বিশ্বেরই জ্ঞানী-গুণী ডান, বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিরা ইসলামী আইন-কানুন তথা বিধি-বিধান সম্বন্ধে কী মন্তব্য করেন। "In 1952, French lawyer declared that they convinced that Islamic law was capable of adapting to any circomstences" (সূত্র The Path of Faith, page-63, by Abdul Mazid Aziz al-Zindani IIFSO-48)

ভাবানুবাদ : "১৯৫২ সালে ফরাসী আইনবীদগণ ঘোষণা করেন যে, তাঁদের এ বিশ্বাস জন্মেছে, যে ইসলামী আইন-কানুন যেকোন পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম।"

ইসলামী দর্শন ও চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী ও এই জীবন ব্যবস্থার অনুসারী না হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের এসব জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ বড় রকমের খেসারত দিয়ে অনেক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতেই বিশ্ববাসীকে শেষ পর্যন্ত নিজেদের রচিত আইন-কানুন ও শাসন ব্যবস্থা, জীবন পদ্ধতির অসারতা শোনানোর পাশাপাশি ইসলামী আইন-কানুন ও শাসন ব্যবস্থার উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা শোনাতে বাধ্য হয়েছেন। আমরাও আমাদের বক্তব্যে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় এই সব আইন-কানুনের কথাই বলি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামী রাষ্ট্র ও আইনের শাসন

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় আমরা যখন আইনের শাসন বোঝাতে চাই তখন আমরা মূলত ইসলামের অনুসারী নিষ্ঠাবান মুসলমান (তা যত বড়ই নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী মুসলমান হোক না কেন) তথা কোনো মানুষ অথবা মানুষের কোনো একটা গোষ্ঠী রচিত আইন নয় বরং একমাত্র সার্বভৌম শক্তি, নিরপেক্ষ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত দ্বারা প্রদত্ত আইনের কথা বলি। কারণ তাঁর প্রদত্ত আইন-কানুন তথা শরীয়ত এর পূর্ণ অনুসারী এর ব্যাপারে তিনি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ (اَلْجَاثِيَةْ ١٨)

অর্থাৎ, অতঃপর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের ওপর, অতএব এর অনুসরণ করুন এবং মূর্খ-নির্বোধদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। (সূরা আল-জাসিয়া-১৮)

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রদত্ত এই শরীয়তও তাকে তিনি যেভাবে বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা করেছেন বাস্তবে বিধি-বিধান তথা আইন-কানুন হিসেবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন, ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় আইনের শাসন বলতে আমরা মূলত সেইসব আইন-কানুন, বিধি-বিধান তথা শরীয়তকেই বোঝাই। উল্লিখিত আয়াতে কারিমা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, এই শরীয়তের সকল আইন-কানুনই সুমহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কর্তৃক প্রদত্ত। বস্তুত আইন রচনার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এর। কারণ তিনিই একমাত্র সার্বভৌম শক্তি। হুকুম দেবার সকল ক্ষমতা একমাত্র এবং শুধুমাত্র তাঁর। এ ব্যাপারে তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণাটি, দেখুন।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ط وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ـ (يُوْنُسْ ـ ٤٠)

অর্থাৎ, আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ কুরআনকে বিশ্বাস করবে এবং কেউ কেউ বিশ্বাস করবে না। বস্তুত তোমার পরওয়ার দেগার যথার্থই জানেন দুরাচারদিগকে। (সূরা ইউনুস-৪০) এই ক্ষমতা আর অধিকার বলে তিনি শুধু মানুষই নয়, বরং সৃষ্টি জগতে জানা-অজানা সকল জীব-জন্তু, এমন কী আমাদের

www.pathagar.com

নিকট জড়পদার্থ বলে পরিচিত সকল কিছুর জন্যই প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান, আইন-কানুন তিনিই প্রদান করেছেন। তিনিই যেহেতু সকল কিছুর একচ্ছত্র স্রষ্টা, তাঁরই জানা থাকার কথা সকল কিছুর ফিতরাত, কীসে তাদের ভালো আর কীসে মন্দ। যেহেতু এসব বিধি-বিধানগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত সেই হেতুসঙ্গত কারণেই এগুলো কোনো মানুষ, কোনো গোষ্ঠী, বর্ণ, ভাষা-ভাষী বা অঞ্চলের লোকের জন্য পক্ষপাত দুষ্ট নয়, বরং এগুলো হলো সবরকমের দুর্বলতা, ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা হতে পূর্ণমাত্রায় মুক্ত এবং মানুষের জন্য সর্বোত্তম মানের কল্যাণকর ও উপযোগী। এ উপযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, স্থান, কাল-পাত্র এসকল কিছু কোনো বাধা নয়। ইসলামী শাসনে মুসলমানরা যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলার এসব বিধি-বিধান অনুযায়ী শাসন কার্য, দেশ-সমাজ, রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন তখন তা ব্যতিক্রমহীন নিরপেক্ষতার মাধ্যমে প্রয়োগ করতে বাধ্য। সেখানে গোষ্ঠী বা কোনো প্রতাপশালী দল, ক্ষমতাধর ব্যক্তি, স্বয়ং শাসক অথবা অন্য কোনো ধরনের সম্পর্ক এ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এর কোনো সুযোগই নেই। স্বয়ং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলার নির্দেশ হলো –

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ـ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ـ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ـ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْتُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ (اَلنِّسَآءُ ـ ١٣٥)

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারেরা, তোমরা ন্যায়ের ধারক হও এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান করো। তোমাদের সুবিচার ও ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যের কারণে যদি তোমাদের নিজেদের বা তোমাদের পিতা-মাতা, অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী বা গরিব হয় তবে তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্-ই তার বেশি শুভাকাঙ্ক্ষী। অতএব তোমরা বিচার-ফায়সালা করতে যেয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশির, কামনা-বাসনার অনুসরণ করে, ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা হতে দূরে সরে যেও না। তোমরা যদি ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল এবং সত্যপরায়ণতা হতে দূরে সরে যাও তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ সে সকল কার্যকলাপ সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় অবহিত, যা তোমরা করে থাক।" (সূরা আন্-নিসা-১৩৫)

www.pathagar.com

এ ধরনের স্পষ্ট নির্দেশ এর পরে কোন মুসলমান, যিনি আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহির ভয় তার অন্তরে পোষণ করেন, তার পক্ষে কী সম্ভব ন্যায়বিচার ও সত্যপরায়ণতার বিপরীতে কোনো ফায়সালা করা? (আহযাব–৬২)

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় আইনের শাসন বলতে আমরা ঐ সকল চেতনা সংবলিত ঐশী বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলিকেই বুঝিয়ে থাকি। এসব আইন অলঙ্ঘনীয়, অপরিবর্তনীয় এবং প্রশ্নাতীত। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে বিশ্বে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সরকারের এ ক্ষমতা নেই যে তারা কোনো প্রয়োজনের ছুতায়, পরিবেশ এর দোহাই বা অন্য কোনো কারণ দর্শিয়ে এসব বিধি-বিধান তথা ইসলামী শরীয়তের আইন-কানুনকে রদ বা পরিবর্ধন বা পরিবর্তন করতে পারে। কোনো জনপ্রিয় কিরামতওয়ালা কামিল পীর, আউলিয়া-দরবেশ, রাজা-বাদশাহ্ প্রচণ্ড ক্ষমতাধর ও জনপ্রিয় নেতার পক্ষেও এ সকল আইন-কানুন, বিধি-বিধানকে পরিবর্তন তো দূরের কথা, এ সংক্রান্ত কোনো পরামর্শ প্রদান বা প্রশ্ন তোলারও অধিকার নেই বিন্দুমাত্র। এসব বিধি-বিধান তাদের কারো একক বা সমষ্টি স্বীকৃতিরও মুখাপেক্ষি নয়। এসব ঐশী বিধি-বিধান তাদের কারো একক বা সামষ্টিক স্বীকৃতিরও মুখাপেক্ষি নয়। এসব ঐশী বিধি-বিধানও সে আলোকে আল্লাহ্‌র পেয়ারা হাবীব মোস্তাফা (সাঃ) কর্তৃক বিশ্লেষিত, নির্দেশিত ও প্রদর্শিত আইন-কানুন এতটাই নির্ভেজাল যে, এগুলোর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-সংশয় প্রকাশের বা পোষণের অবকাশ নেই, অন্তত কোনো মুসলমানের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কারণ এগুলোতে নিঃশর্ত ও প্রশ্নাতীত বিশ্বাস স্থাপন হচ্ছে একজনের পক্ষে মুসলমান হবার প্রাথমিক ও মৌলিক শর্ত। মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কর্তৃক প্রদত্ত ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কর্তৃক বিশ্লেষিত-নির্দেশিত বিধি-বিধানগুলোর কোনো একটির ব্যাপারেও সন্দেহ-সংশয়ে নিপতিত হয়ে আর যাই হোক না কেন, অন্তত পক্ষে কারো পক্ষে মুসলমান হওয়া বা মুসলমান থাকা যায় না। এ ধরনের মানসিকতা পোষণকারীদেরই ইসলামের পরিভাষায় মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও এরা নিজেদের মুসলমান পরিচয়ে পরিচিত করে থাকে সমাজে। এদের ব্যাপারেই কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ـ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا* اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ج وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ (اَلنِّسَآء ـ ١٥١ ـ ١٥٠)

www.pathagar.com

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী, তাছাড়া আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে করি প্রত্যাখ্যান এবং এর মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত পক্ষে কাফির, আর কাফিরদের জন্য অপমানজনক আজাব প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা আন-নিসা ১৫০-১৫১)

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রের ধারণা প্রকট। এখানে একটি সমাজ বা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তথা নাগরিকের মতামতের ভিত্তিতে আইন-কানুন বা বিধি-বিধান রচিত হয়ে থাকে। রচিত এসব আইনের পরিবর্তন পরিবর্ধন-পরিমার্জন অথবা যেকোন ধরনের সংশোধনিও হয়ে থাকে ঐ এক সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে। ভালো-মন্দ বা নৈতিকতার যেকোন ধারণা সংখ্যাগরিষ্ঠের জোয়ারে পদদলিত হলেও তাতে কোনোরকম পরওয়া করা হয় না।

নৈতিকতার যেকোনো মানদণ্ডেই বিচার করুন না কেন সমকামিতা হলো অন্যায়-অশ্লীল, অনৈতিক ও পুরো মানব সমাজের জন্য চরম অপমানজনক ও ক্ষতিকারক একটি বিষয়। ধর্ম-বর্ণ, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বই এটিকে এক সময় অনৈতিক, অশ্লীল ও অন্যায় বলে জানত এবং মানত। রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানেও এটিকে একটি ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলেই স্বীকৃত ছিল, এখনও বিশ্বের অনেক দেশে তা ঘৃণ্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। একটি বিশেষ জনপদের কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা দর্শন-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলেই কী এই জঘন্যা ঘৃণ্য ও অশ্লীল কাজটি কখনও ন্যায়বৈধ ও আইনসিদ্ধ, ব্যক্তির অধিকার বলে বিবেচিত হতে পারে? অথচ দুঃখের বিষয় হলো এই যে, তাই হয়েছে। মানবতার জন্য কলঙ্কজনক ও অন্যায়-অশ্লীল এই কর্মটি বিশ্বের কোনো কোনো দেশে বা সমাজে এখন আর অন্যায়-অশ্লীল ও অবৈধ বলে বিবেচিত হয় না বরং সেই সুনির্দিষ্ট জনপদের অধিবাসী নাগরিক ও বাসিন্দাদের ব্যক্তিগত অধিকার বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইডেনসহ এ বিশ্বের তথাকথিত উন্নত ও আধুনিক গণতন্ত্র এর ধ্বজাধারী বলে পরিচিত কয়েকটি রাষ্ট্রে এটিকে অর্থাৎ ঘৃণ্য, জগণ্য ও অনৈতিক সমকামিতা নামক কর্মকাণ্ডটিকে তাদের রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানে বৈধ ও ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকারের আওতায় এনে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এটিকে এখন সেসব দেশে আর অনৈতিক বলে বিবেচনা করা হয় না। এটি এখন একজন ব্যক্তির রুচি ও পছন্দের ব্যাপার। এটি তার ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে গণ্য। এটি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা প্রচলিত কোনো আইন দ্বারাই আর বিচারযোগ্য অপরাধ নয়!! চিন্তা-দর্শন আর বোধ বিশ্বাসের এই পরিবর্তনটুকু সময়ের ব্যবধানে সংঘটিত হয়েছে, ঐ নির্দিষ্ট জনপদের জনগণ এর

www.pathagar.com

ন্যায়-অন্যায় শ্লীল-অশ্লীল ইত্যাদি বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক ও ধ্বংসাত্মক পরিবর্তনের অনিবার্য ফলাফল হিসেবে। সেখানে এটিকে আইন দিয়ে বৈধ বলে স্বীকার করেছেন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিকভাবে তা মেনে নিয়েছেন, শুধুমাত্র এই কারণে যে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এটিকে বেআইনী-অবৈধ, অশ্লীল বলে মনে করে না। যেহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানে ঐ রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধ্যান-ধারণা, বোধ-বিশ্বাস আর চিন্তা-দর্শনের প্রতিফলন থাকতে হয় তাই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের এই কর্মকাণ্ডটির প্রতি পোষণ করা দৃষ্টিভঙ্গির স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের রাষ্ট্রীয়বিধানে এটিকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়ে। এখন এটি হলো রাষ্ট্রের সংবিধানে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি বৈধ কর্মকাণ্ড ও ব্যক্তিগত অধিকার।

পক্ষান্তরে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় এ ধরনের কোনো পরিস্থিতি বা সুযোগের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। এখানে নৈতিক-অনৈতিক, বৈধ-অবৈধ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির সংজ্ঞা মানুষ বা মানুষের একটি গোষ্ঠী নির্ধারণ করে না বরং তা নির্ধারণ করেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলা ও তাঁর পেয়ারা হাবীব (সাঃ) ইসলামে কোনোটি বৈধ, কোনটি অবৈধ, কোনোটি ন্যায় অথবা কোনটি অন্যায় এ সব পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এগুলো এত স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এগুলোর কোনো একটির ব্যাপারেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় বা দ্বিধায় পড়ে যাবার অবকাশ রাখা হয়নি। এসব বিধি-বিধানগুলোকে মূলত দুটো উৎসতে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এই দুটি উৎসর সম্মিলিত প্রকাশ হলো ইসলাম। উৎস দুটির একটি হলেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং এবং অপরটি হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর জীবনী, তাঁর কথা কাজ, পদ্ধতি, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ, তাঁর অনুমোদন, যাকে এক কথায় আমরা তাঁর সুন্নত বলে জানি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এর নাযিল করা বিধি-বিধান যার সংগৃহীত ও সামষ্টিক রূপ হলো আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত, এই দুটো মিলেই ইসলাম। এই ইসলাম এর যেসব বিধি-বিধান, তা ব্যতিরেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে, বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের নামে উক্ত বিধি-বিধানকে পাশ কাটিয়ে অন্য কোনো বিধান রচনা ও তার অনুসরণ বা প্রয়োগ এর কোনো সুযোগ ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় নেই। কারণ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন।

وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ـ(اَنْعَام ـ٣٤)

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বিধানে পরিবর্তনের অধিকার কারো নেই। (সূরা আনআম-৩৪)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এর এসব অলঙ্ঘণীয় অপরিবর্তনীয় এসব বিধি-বিধান এর উৎস দুটি আল্লাহ্‌পাক হিফাযত করেছেন এক বিস্ময়কর নৈপুণ্যতায়। এ বিশ্বের যেখানেই যান, পূর্ব বা পশ্চিমে, উত্তরে বা দক্ষিণে, গ্রামেগঞ্জে বা শহরে-প্রান্তরে যেখানেই যান না কেন, যখনই যান না কেন, এদুটি বস্তুকে অতি সহজে আপনার ও অপরিবর্তিতাবস্থায় ঠিক তেমনটি, যেমনটি নাযিল হয়েছিল আজ হতে দেড়হাজার বছর পূর্বে। মনুষ্য সমাজের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করেই না আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলা এ দুটি উৎসকে সংরক্ষণ করেছেন এবং সহজলভ্য করেছেন!

সুদ ইসলামে হারাম। ইসলামী আইনের উক্ত দুটি সূত্রের বরাতে তা চিরদিনের জন্য, সকলের জন্য, সকল যুগ সমাজ ও পরিবেশ এর জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম এর পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, এমন কি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশটুকুও হারাম- বিনা প্রশ্নে পরিত্যজ্য। কোনো জনপদের জনগণ আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলা বা তার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলিত ধরনের দোহায় দিয়ে বা লেন-দেন এর সুবিধার কথা বলে কোনো রাজনৈতিক নেতা, অর্থনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী, ক্ষমতাশীন সম্প্রদায় বা গণভোটের মাধ্যমে প্রতিফলিত ফলাফল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রায় ইত্যাদির দোহায় দিয়ে সুদকে বা তার অংশবিশেষকে একটা মুহূর্ত সময়ের জন্য বা কোনো বিশেষ ক্ষুদ্রতম এলাকার জন্য বা পুরো মানব সমাজের কোটি কোটি সদস্যের মধ্য হতে একজন মাত্র ব্যক্তির জন্যও বৈধ বা হালাল বলে ঘোষণা করতে পারে না। একইভাবে অশ্লীলতা, ব্যভিচার, বেশ্যাবৃত্তি, সমকামিতা অর্থাৎ অশ্লীলতার অন্যায়-অবিচারের মত, প্রকাশ্য বা গোপন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সূত্র আছে তা হারাম। চিরতরের জন্য সকলের জন্য সকল স্থানের জন্য তা চূড়ান্ত ও স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে গেছে।

কিয়ামত পর্যন্ত এ বিশ্বে শত চেষ্টা করেও কোনো শক্তিই এর ব্যত্যয় অর্থাৎ হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম বলে ঘোষণা করতে পারবে না। এ দুষ্কর্মটি যদি কোনো স্থানে, কোনো কালে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটেই যায়, তা হলে ঐ শাসন ব্যবস্থাটি কোনক্রমেই আর "ইসলামী শাসন ব্যবস্থা" বলে বিবেচিত হবার যোগ্যতা রাখে না। এ শাসন ব্যবস্থাটি তখন কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়, অনৈসলামিক, সেক্যুলার না অন্য কিছু তা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়– আমরা শুধু এটুকু জানি যে তা আর যাই হোক না

www.pathagar.com

কেন, অন্তত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা যে সেটা নয়, এটা একশতভাগ খাঁটি ও নিরেট সত্য একটি বাস্তবতা। হতে পারে উক্ত শাসন ব্যবস্থায় তথা উক্ত সমাজে ইসলামের কোনো কোনো বিধি-বিধান, আইন-কানুন তখনও চালু রয়েছে। চালু রেখেছেন, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের কর্ণধারগণ নিজেদের এবং নিজেদের গোষ্ঠী বা অনুসারীদের সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে এটা হলো এক ধরনের সুবিধাবাদী রূপ। এ ধরনের সুবিধাবাদিতা ইসলামে মোটেও স্বীকৃত নয় বরং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এর দৃষ্টিতে চরম ঘৃণ্য ও শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ। যেমন মহান আল্লাহ্পাক এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে সাবধান করে বলেছেনঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ـ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ـ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ (البَقَرَة ـ٨٥)

অর্থাৎ, "তবে কী তোমরা কিতাবের (কুরআনের) একাংশ বিশ্বাস করো এবং অবিশ্বাস করো অপর অংশকে? তবে জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে, তাদের এ ছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে অপমান আর লাঞ্ছনার শিকার হবে আর কিয়ামতের কঠিন দিনে তাদেরকে ভয়াবহ আযাবের মধ্যে নিপতিত করা হবে। তোমরা যা করো সে ব্যাপারে আল্লাহ্ মোটেও বেখবর নন।" (সূরা বাকারা আয়াত-৮৫)

উল্লিখিত আয়াতে স্পষ্টভাবেই বলে দেয়া হয়েছে-এ ধরনের সুবিধাবাদি কর্মকাণ্ডের কোনো বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

www.pathagar.com

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বন্দেগীর চেতনায় ইসলামী শাসন

ইসলামী শাসনে এক ধরনের বন্দেগীর চেতনা আছে যা অন্য কোনো শাসনে, এমনকি মুসলিম শাসন এর মধ্যেও থাকে না। ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা শাসকবর্গের হাতে হঠাৎ করে পাওয়া কোনো সুবর্ণসুযোগ নয়, নয় আলাদিন এর জাদুর চেরাগ। বরং এর বিপরীতে তার বা তাদের হাতে এ শাসন ক্ষমতা কঠিন একটি আমানত। পুরো দেশ, জাতি, রাষ্ট্রও তার আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান, সকল সম্পদসহ সকল কিছুই তাঁদের কাছে গচ্ছিত একটি আমানত। এর প্রতিটি সম্পদ, তা অর্জন ও ব্যয়ের খাত এবং এ রাষ্ট্র সীমানায় বসবাসরত প্রতিটি ব্যক্তি এমনকি জীব-জন্তুরও ভালো-মন্দ সকল কিছুর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কঠিন কিয়ামতের দিনে জবাবদিহি করতে হবে। এ জন্য শাসকবর্গ সবসময় এক ধরনের মানসিক চাপের মধ্যে কাটান না জানি তাঁর অজান্তে– অগোচরে রাষ্ট্র সীমানায় বসবাসরত কারো ওপরে অত্যাচার হয়, আর তার জন্য তাঁকে কাল কিয়ামতের মাঠে জবাবদিহি করতে হয়। এ জন্য ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় কেউ যেচে এ ক্ষমতা নিজের হাতে নিতে চান না, পাবার চেষ্টা করেন না। এ ধরনের প্রচেষ্টা করা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তার যতই যোগ্যতা থাকুক তাকে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় না। ইসলামের সঠিক স্পিরিট ও চেতনার ধারক একজন মুসলমান নিজের কাঁধে এ কঠিন বোঝা চাপিয়ে নেন না বরং সম্ভাব্য সকল বৈধ পথ খোঁজেন এ দায়িত্ব হতে দূরে থাকার। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) পূর্ণ অনুসরণ করেন এবং এ বিশ্বাসও রাখেন যে তাঁকে অতি অবশ্যই একদিন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এর নিকট দাঁড়াতে হবে তাঁর প্রতিটি কর্মকাণ্ড ও চিন্তা-চেতনার জবাবদিহি করার জন্য, তার দৃষ্টিসীমায় রয়ে গেছে আল্লাহ্‌র হাবীব মোস্তাফা (সাঃ)-এর সেই বিখ্যত উক্তিটি– তিনি যেটি করেছিলেন তাঁর প্রিয় সাহাবী হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ)-এর প্রতি, হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) তাঁর নিকট উচ্চপদে অর্থাৎ শাসন ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য মনের বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) নিম্নের বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন।

"হে আবু যার, তুমি খুব দুর্বল ব্যক্তি। আর এ রাষ্ট্রীয় পদ অতি বড় দায়িত্ব ও আমানতের ব্যাপার। কিয়ামতের দিন লজ্জা আর লাঞ্ছনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে এ জিনিস। তবে যে লোক এর অধিকার যথাযথ আদায় করবে ও এ ব্যাপারে তার ওপরে যে দায়িত্ব আসে তা ঠিক ঠিকভাবে পালন করবে সে হয়ত তা থেকে মুক্তি পাবে।"

www.pathagar.com

এ চেতনা জাগ্রত থাকার কারণেই একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান কখনও এ ধরনের কঠিন দায়িত্বপূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ পদের জন্য আগ্রাহান্বিত হন না, নিজ হতে তা পাবার প্রচেষ্টা করেন না। (আবার ইসলামী পদ্ধতিতে তার ওপর কোনোরূপ দায়িত্ব অর্পিত হলে তা হতে তিনি ফিরেও থাকেন না, দায়িত্ব এসে গেলে তা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই)। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর অন্তিম মুহূর্তে তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসেবে তাঁর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর নাম প্রস্তাব করলে তিনি ক্রোধে অগ্নীশর্মা হয়ে প্রস্তাব উত্থাপনকারীর উদ্দেশে বলেন।

"আল্লাহ্ তোমাকে সুপথে পরিচালিত করুন। আল্লাহ্র শপথ। আমি কখনও এরূপ খেয়াল করি নি। তোমাদের ব্যাপারে আমার কোন আকর্ষণ নেই। সরকার প্রধানের পদটি আমি কোনোরূপ প্রশংসাযোগ্য জিনিস হিসেবে পাই নি যে, আমার পরিবারের জন্য তার আকাঙ্ক্ষা করব। শাসন কর্তৃত্ব যদি কোনো উত্তম বস্তু হয়ে থাকে তা হলে আমরা তা পেয়ে গেছি। আর যদি তা নিকৃষ্ট হয়ে থাকে তাহলে উমার পরিবারের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে (উমারকে) উম্মাতে মুহাম্মাদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমি নিজেকে খুবই কষ্ট দিয়েছি এবং আমার পরিবার-পরিজনকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রেখেছি। এ জন্যও যদি আমি কোনোরূপ শাস্তি বা পুরস্কার লাভ ছাড়াই নিষ্কৃতি পেয়ে যাই তবে আমি বড়ই ভাগ্যবান (মাওলানা মওদূদী (রহ.) এর লেখা হতে এ উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে– ইসলামে মানবাধিকার, লেখক মুহাঃ সালাহুদ্দীন, গ্রন্থের ১৮৪ পৃষ্ঠা হতে)

এ হলো ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় একজন মুসলমান এর দৃষ্টিতে শাসন ক্ষমতা ও সরকারি পদসমূহের প্রতি পোষণকৃত দৃষ্টিভঙ্গি। উক্ত মন্তব্যের প্রতিটি ছত্রেছত্রে ফুটে ওঠেছে একজন আল্লাহ্ভীরু শাসক এর এই অনুভূতি, যে তাঁর এ সুযোগ ও ক্ষমতা ও তাঁর আওতায়কৃত সকল কর্মকাণ্ডের জন্য সন্দেহাতীতভাবে তাঁকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন এর নিকট প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় একজন শাসক বা একটি শাসকগোষ্ঠী যে মূল দর্শন বা চেতনাকে বাস্তবে প্রয়োগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকেন তা হলো প্রথমত সমাজে মানুষের মনোজগতে বা তাদের চিন্তা-চেতনায় ইলাহ এর আসনে প্রতিষ্ঠিত যেকোনো শক্তির উলুহিয়াতকে উৎখাত করে, নির্মূল করে সে স্থলে একমাত্র ও শুধুমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে ইলাহ এর আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে তাঁর উলুহিয়াত কে সর্বশক্তি দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা করবে। উপাস্যের আসনে যেকোনো শক্তির কর্তৃত্বকে সে অস্বীকার করবে, ধ্বংস করবে এবং একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকেই সেখানে প্রতিষ্ঠত করবে।

www.pathagar.com

একইভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনায়, তাদের বিশ্বাসে ও আকিদায় যতরকম এর বাতিল রব অধিষ্ঠিত আছে (যেমনটি মিসরের প্রাচীন সমাজে ফেরাউন তৎকালীন মিসরবাসীর সম্মুখে রব এর আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং নিজেকে রব বলে ঘোষণাও দিত) তাদের সকল ধরনের রুবুবিয়াত কে উচ্ছেদ করে তদ্বস্থলে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার রুবুবিয়াত কে পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠা করবে। তিনিই যে এ বিশ্ব-মখলুকাতের একমাত্র রব সে বিশ্বাস ও স্বীকৃতিকে মানুষের মনে ও তাঁর আওতাধীন সমাজে কায়িম করবে।

এর পরে তৃতীয় যে কাজটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মৌলিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তা হলো এই যে, এ সমাজ তথা বিশ্বে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এর মুলুকিয়াত কে প্রতিষ্ঠা করা। বস্তুত এ পুরো বিশ্বজাহান আল্লাহ্র এখানে কেউ যখন রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করে তখন সে– তারা তার বা তাদের আওতাধীন রাষ্ট্রে অর্থাৎ ভূ-খণ্ডে নিজের বা নিজেদের কর্তৃত্বশীল, পূর্ণ স্বাধীন কর্তৃত্বশীল বলে মনে করে এবং তা জনগণের মনেও প্রতিষ্ঠা করাতে থাকে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এটি একটি নির্জলা মিথ্যা। বিশ্বের কোথাও কোনো ভূ-খণ্ডে কোনো মানুষের নিরংকুশ কর্তৃত্ব নেই। পুরো ভূ-খণ্ডই হলো একমাত্র এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলার। এই ভূ-খণ্ডের ওপরে নিরংকুশ কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁর, এই সত্যকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় সন্দেহাতীত ও প্রশ্নতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা ও প্রতিষ্ঠিত রাখা।

দেশ তথা সমাজের মানুষের মনে ইলাহ, রব ও মালিক হিসেবে এক ও লা-শরীক আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়েই ইসলামী শাসন তার যাত্রা শুরু করে এবং এই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এর এই উলুহিয়াত, রুবুবিয়াত ও মুলুকিয়াতকে টিকিয়ে রাখাটাই তার মৌলিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই তিনটি মৌলিক বিষয়কে অক্ষুণ্ন ও অপরিবর্তিত রাখে ততক্ষণ তাকে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা যায়। বস্তুত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতালাআকে এই তিনটি পরিচয়ে স্বীকার করে নেওয়া এবং সে স্বীকৃতী মত বাস্তবে যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাই হলো একজন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ এবং রাষ্ট্রের মূল ইবাদত। বন্দেগী, বন্দেগীর এই চেতনা নিয়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় শাসকবর্গ তাঁদের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। যেহেতু তাঁরা কখনোই এবং কোনোভাবেই নিজেদের রব, ইলাহ্ ও মালিক এই তিন ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করান না বরং ঐ তিনটি পরিচয় এর একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ্র উক্ত পরিচয়সমূহকে তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করেন সেই অর্থেই ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় ও অধিষ্ঠিত শাসককে

www.pathagar.com

খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে এবং ইসলামী এই শাসন ব্যবস্থায় যতক্ষণ বন্দেগীর এই চেতনাটুকু অক্ষুণ্ন থাকে ততক্ষণ তাকে খিলাফত নামে অভিহিত করা যথাযথ ও যৌক্তিক।

অপরদিকে মুসলিম শাসন ব্যবস্থায় একজন শাসকের মনে বন্দেগীর এই সুমহান চেতনা অক্ষুণ্ন-অক্ষত থাকে না। তার কাছে ক্ষমতা হলো একটি অতি বড় মহার্ঘ বস্তু। এই মহার্ঘ বস্তুটি হাতে পেলে অচিরেই সে নিজেই নিজেকে আংশিক বা পূর্ণভাবে রব ইলাহ এবং মালিক এর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে অথবা এ ক্ষমতায় ভাগ বসায়। বিষয়টি অনেক ব্যাখ্যা ও আলোচনা সাপেক্ষ, বিতর্কও উঠতে পারে তবে এ অবস্থায় বা এরকম অনেক শাসনকাল ও শাসকের ইতিহাসে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান যারা নামে মুসলমান ছিলেন ইসলামী রসম-রেওয়াজ মেনে চলতেন, ইবাদত-বন্দেগীর আনুষ্ঠানিকতাও তারা পালন করতেন কিন্তু এরই পাশাপাশি তারা বাদশাহ্ হিসেবে প্রজা সাধারণের নিকট হতে সিজদাহ আদায় করেছেন নিজেদের জন্য সন্তুষ্ট চিত্তে। বায়তুল মাল এর অর্থকে নিজের ব্যক্তিগত আয়, ব্যক্তি সম্পদ হিসেবে দেখেছেন এবং যথেষ্টভাবে যখন খুশি ব্যবহার করেছেন এ ব্যাপারে কারো নিকট কোনো জবাবদিহি করেন নি। একজন মানুষকে যেসব কারণে হত্যা করা বৈধ, সেসব কারণ ব্যতিরেকেই নিজেদের স্বার্থরক্ষা বা নিজেদের খেয়াল-খুশি ক্রোধ বাস্তবায়নে অকারণে মানুষকে হত্যা করেছেন, করিয়েছেন রাষ্ট্রীয় ফরমান বলে। তার ইচ্ছাটাই ছিল এখানে মুখ্য, আইনের সমমর্যাদা সম্পন্ন। এভাবে তিনি নিজেকে সেরূপ কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করেছেন। যেরূপ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তার পাবার কথা ছিল না বরং তা ছিল একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এর। এরকম ক্ষমতা পাওয়া তার জন্য ছিল চরম সফলতা। এটি রক্ষার জন্য বা পাওয়ার জন্য সে শুধু আকাঙ্ক্ষাই করে নি বরং সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়েছে, এর জন্য ন্যায়- অন্যায়, বৈধ-অবৈধ এর সীমারেখাও অনায়াসে ডিঙ্গিয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদা হতে বিচ্যুত হয়ে পারিবারিক রাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটান। ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে সম্মানিত সাহাবী হযরত আমির মুয়াবিয়া (রাঃ) তাঁরই পুত্র ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া নিজ ক্ষমতাকে সুসংহত করতে তৎপর হলেন, অপরদিকে ইমাম হোসেন (রাঃ) একজন মুসলমানের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ হুকুমতে-ইলাহিয়াকে পুনরুদ্ধারে তৎপর হলেন, উভয়ের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। ইয়াজিদ বিন-মুয়াবিয়া ও তাঁর দলবল সকলপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করলেন, তার হাতে ক্ষমতার বাগডোর ধরে রাখার জন্য এটা হারানো তাঁর দৃষ্টিতে তাঁর জন্য ছিল চরম এক ক্ষতি। তাই তিনি এর জন্য সম্মানিত সাহাবীদের তাঁদের পরিবার

www.pathagar.com

এমনকি শিশুদেরও রক্ত প্রবাহিত করে ছাড়লেন। ইতিহাসে দুঃখজনক-কলঙ্কজনক এক হৃদয়বিদারক অধ্যায়ের সাথে নিজেকে জড়িত করে ছাড়লেন! এ ঘটনার দুটো পক্ষ, এক পক্ষে ছিলেন আল্লাহ্‌র সেসব বান্দাহ, যাঁরা হুকুমতে ইলাহিয়া বা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, তথা ইসলামী খিলাফতকে উদ্ধার, প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করাটাকে নিজেদের জন্য করণীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে দেখেছেন, এর জন্য জীবনকেও বাজি রেখেছেন। অকাতরে সপরিবারে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন-এঁদের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ এসবের চেয়ে বন্দেগীর চেতনাই ছিল বড়। আপস করলে এঁরা নবী (সাঃ)-এর বংশধর হিসেবে যথেষ্ট ইজ্জত ও সম্মানের সাথে বাঁচতে পারতেন কিন্তু তাঁরা আপসের পথ বেছে নেন নি। নিয়েছেন আত্মোৎসর্গের পথ। আর দ্বিতীয় পথটির দৃষ্টিতে বন্দেগীর চেতনা নয় বরং ছিল ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থ। এ ঘটনাটি ছিল ইসলামী শাসন ও মুসলিম শাসন এ দুয়ের প্রকৃষ্ট এক উদাহরণ।

সম্মানিত পাঠক, উমাইয়া কিংবা আব্বাসীয়, ফাতেমী কিংবা ওসমানীয় খিলাফত মোগল শাসনকাল, এসবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন অনুগ্রহপূর্বক। এমন অনেক শাসক ও শাসকগোষ্ঠীর অস্তিত্ব দেখতে পাবেন যারা নিজেদের বা নিজেদের গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতাপ্রাপ্তি নিশ্চিত বা প্রাপ্ত ক্ষমতাকে সংহত করতে কতই না ছলচাতুরী করেছেন। কত অমূল্য নিষ্পাপ প্রাণ-ই না সংহার করেছেন, কত নির্মম জুলুম নির্যাতন-ই না তারা চালিয়েছেন, এগুলোতো ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এগুলোকে অস্বীকার করা যাবে কী? এগুলো মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস তো হতে পারে, কিন্তু ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস কোনমতেই তা হতে পারে না, যদিও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম শাসকগণ ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামের আচার-আচরণ ও রীতিনীতি অনুসরণ করে চলেন তখনও।

তাই আমরা যখন ইসলামী শাসন ব্যবস্থার কথা বলি তখন আমরা মূলত কুরআন, হাদীস ও সীরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও এই উৎসদ্বয় হতে নিঃস্বরিত আইনের নিরপেক্ষ অবিকৃত ও যথাযথ প্রয়োগে যে শাসন, সেই শাসন ব্যবস্থার কথাই বলি, সেই শাসন ব্যবস্থাকেই বোঝাতে চাই। এখানে দেশের একজন সাধারণ নাগরিক যেভাবে আইনের গণ্ডিতে বাঁধা থাকেন। ঠিক তেমনিভাবেই এ একই আইনের গণ্ডিতে বাঁধা থাকেন দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি অর্থাৎ খলীফা স্বয়ং। এখানে উভয়ের ক্ষেত্রে আইন ও বিধি-বিধান প্রয়োগ ও কার্যকর করার বেলায় বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটানোর কোনো সুযোগ নেই। আমরা ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় সেই চেতনার কথা বোঝাতে চাই, যে চেতনার উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই নিম্নের ঘটনায়। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে তখন আর রাসূলুল্লাহ্

www.pathagar.com

(সাঃ) হলেন সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক। ইসলামী বিধি-বিধানও সে সময় চালু হয়েছে ও তার প্রয়োগ হচ্ছে। এরকম একটি সময়ে কুরাইশ বংশের একজন নারী যার নাম ছিল ফাতেমা। তিনি চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে পড়লেন ও তাঁর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ প্রমাণিতও হলো। সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবংশের একজন মহিলার হাতকাটা যাবে সামান্য চুরির দায়ে (!) এরকম ধ্যান-ধারণায় অনেকেই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা শলাপরামর্শ করে কীভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট এ শাস্তি রদ করার আবেদন করা যায় তা ঠিক করলেন। যেহেতু হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)কে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) খুব স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন তাই তাঁরা হযরত উসামা (রাঃ)-এর মাধ্যমেই আবেদনটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট পেশ করল এবং হযরত উসামা (রাঃ) তাঁদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উক্ত অভিযুক্ত মহিলাকে মাফ করে দেবার সুপারিশ করে বসলেন। মহানবী (সাঃ) এরূপ আবেদনের প্রেক্ষিতে কঠোর ভাষায় উসামা (রাঃ)কে জবাবে বললেন– "হে উসামা! আল্লাহ্র স্থিরকৃত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করে অনধিকার চর্চা করছ। খবরদার! আর কখনও এরূপ ভুল করবে না।" এরপরে তিনি শুধু এখানেই থেমে না থেকে হযরত বেলাল (রাঃ)কে আদেশ দিয়ে সকল মুসলমানদের মসজিদে নববীতে একত্রিত করালেন। মুসলমানগণ মসজিদে নববীতে একত্রিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রথমে আল্লাহ্র হামদ পেশ করলেন এবং তিনি এর পরে সকলের উদ্দেশে বললেন," "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস এই জন্যই হয়েছে যে, তারা সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে আইন অনুসারে শাস্তি কার্যকর করত কিন্তু বিশিষ্ট লোকদের কোনো শাস্তি প্রদান করত না। আমার জীবন যার হাতের মুঠোর ভেতরে সেই মহান সত্তার কসম যদি ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদও এরূপ করত, তবে আমি তারও হাত কাটতাম" (মুত্তাফিকুন আলাইহি)

বস্তুত এ ঘটনাটি শুধুমাত্র সে যুগের মুসলমানদের জন্যই শিক্ষণীয় ছিল না বরং এটি এখনও এবং আগামী দিনেও সকল মুসলমান এর জন্য শিক্ষামূলক একটি ঘটনা। বিশ্বের যেখানেই ইসলামী শাসন কায়েম হোক না কেন, যখনই কায়েম হোক না কেন সেই শাসন ব্যবস্থায় আইন প্রয়োগ ন্যায়-বিচার ও সাম্যের ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনার মূল চেতনাকে সুস্পষ্টরূপে ধারণ করেই তা হতে হবে। তবেই সেটি ইসলামী শাসন!

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইসলামী শাসন ও গণতন্ত্র

আলোচনার এক পর্যায়ে ইতোপূর্বে আমরা ইসলামী শাসন এর সাথে বর্তমান যুগে প্রচলিত গণতন্ত্র এর দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা বিরোধ কোন পর্যায়ে ও কীভাবে, তার কিছুটা আলোকপাত করেছি। আমরা দেখেছি ইসলামী শাসন একটা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে– মৌলিক এ দর্শন সর্বজনীন, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয় স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে। আমরা আমাদের ইতোপূর্বেকার বিশদ আলোচনায় এটাও দেখেছি সবিস্তারে যে, বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রের যে কাঠামো তাতে উল্লিখিত মৌলিক গুণাবলির কোনোটিই নেই, এ গণতন্ত্র কোনো সুনির্দিষ্ট দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না, এবং একটি দর্শনের ভিত্তিতে এ গণতন্ত্র গড়ে ওঠলেও তা নিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে-এর সর্বজনীন ও স্থায়ী কোনো দর্শন নেই– থাকে না।

প্রচলিত গণতন্ত্রে আমরা দেখতে পাই বিশ্বাসের অবক্ষয়, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, চিন্তা-চেতনা, রুচি-অভিরুচির বিবর্তন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক উত্থান-পতনের সাথে সাথে গণতন্ত্র তার মৌলিকত্বকে নিয়তই পরিবর্তন করে বা করতে বাধ্য হয়। প্রচলিত এ গণতন্ত্র একজন ব্যক্তি, একটি গোষ্ঠী বা একটি জাতি তথা একটি সমাজের অবক্ষয়কে রোধ করতে পারে না বরং কখনও কখনও এ ধরনের গণতন্ত্র-ই একটি গোষ্ঠী, একটি জাতি বা একটি সমাজ এর অধঃপতন ও ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে থাকে। আমি সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোকে ধ্বংস করে ছাড়ে, সে কথা বর্তমান বিশ্বের সচেতন ও বিবেকবান সমাজ বিজ্ঞানীরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন। উদ্ভূত এরকম পরিস্থিতির সুযোগেই গণতন্ত্রকে হত্যা করে স্বৈরাচারের জন্ম হয়। গণতন্ত্রের মানসপুত্র ও জানবাজ নেতারাই শেষ অব্দি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারে রূপান্তরিত হয়ে যান। বেশি দূরে যেতে হবে না– আমাদের নিজেদের সমাজে, দেশেই আমরা তা দেখেছি। আমাদের আশপাশে এবং বর্তমান বিশ্বের তৃতীয় বিশ্ব বলে পরিচিত দেশসমূহে এবং আজ এক অতি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীরাই ভালো বলতে পারবেন এ ধরনের ঘটনার পেছনে মূল কারণটি কী? কিন্তু ইসলামী শিক্ষা-বিশ্বাস আর দর্শনের আলোকে আমরা যদি ঐ বিষয়টিকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করি তা হলে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত গণতন্ত্রে আমরা মোট দুটি মৌলিক ত্রুটি দেখতে পাই। এখানে এ দুটি ত্রুটির কারণ-ধরন নিয়ে বিশদ আলোচনা করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই যদিও, তবুও আমরা আমাদের দাবির সমর্থনে অতি সংক্ষেপে এ দুটি ত্রুটিকে নির্দেশ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তা নাহলে এর বিপরীতে ইসলামে গণতন্ত্রের রূপ ও কাঠামোকে সম্যক উপলব্ধি করতে আমাদের বেগ পেতে হতে পারে।

www.pathagar.com

ইতোপূর্বেই আমরা দেখেছি যে, প্রচলিত গণতন্ত্রে আইনের উৎস হলো জনগণ। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের পছন্দ-অপছন্দ ও ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করেই আইন রচিত হয়। তাদের চিন্তা-চেতনা, বোধ-বিশ্বাস নীতি-নৈতিকতা। জীবন সম্বন্ধে পোষণ করা দৃষ্টিভঙ্গি তথা দর্শনের ওপর ভর করে এসব আইন রচিত হয়ে থাকে। এ আইন এর প্রয়োগও হয় তাদের ওপরে, রচনাও করে থাকে তারা নিজেরাই। (আব্রাহাম লিংকনের সেই বিখ্যাত উক্তি "Governmert of the people, By the people and for the people" এখানে স্মরণযোগ্য) যেহেতু দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠীর হাতে থাকে দেশের যাবতীয় সম্পদ, ক্ষমতা, প্রশাসন যন্ত্র ও মিডিয়া ইত্যাদি। তাই শাসকবর্গ বা তাদের অনুসারী একটি গোষ্ঠী অতি সহজেই সকল ক্ষমতা সম্পদ, সুযোগ ও রাষ্ট্রীয় প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে অতি সহজে তাদের চাওয়া বা তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে দেশের সকল জনসাধারণকে না হলেও অন্ততপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি অংশকে মটিভেট করতে পারেন। এই মটিভেশনের ফলে অচিরেই দেশের জনসাধারণের মধ্য হতে সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি অংশ শাসকগোষ্ঠীর তাঁবেদারে পরিণত হয়ে পড়ে, ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা ও প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে। শেষে অচিরেই এমন একটি সময় আসে যখন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত গোষ্ঠীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা চাওয়া-পাওয়া ও মতামতের প্রতিফলনের নামে গণতন্ত্র রক্ষা ও বাস্তবায়নের মুখরোচক বুলি আওড়িয়ে নিজেদের ইচ্ছাকেই আইনে পরিণত করে ফেলেন। এক্ষেত্রে শাসক গোষ্ঠী ও তাদের তাঁবেদার জনসাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার আবরণে যেকোনো আইন রদ, বাতিল, রচনা বা জারি করতে পারে এবং আমরা দেখতে পাই, তারা তা করেও থাকে অহরহ। আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি সে কথা, পুনরায় তার পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে, প্রচলিত গণতন্ত্র ব্যক্তি-গোষ্ঠী বা সমাজ কারো অবক্ষয় রোধ করতে পারে না। বরং ঐ গণতন্ত্র সমাজ ও রাষ্ট্রের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে মাত্র। এ উক্তি শুধু আমাদের একার নয় বরং এ উক্তিটি করেছেন আধুনিক গণতন্ত্র ও পশ্চিমা দর্শনের জনক বলে পরিচিত প্লেটো (Plato) স্বয়ং তিনি বলেছেন–

"Plato and critias were in agreement that unconirolled democracy was the ruin of the state"

ভাবানুবাদ : প্লোটো ও ক্রিটিয়াস এ বিষয়ে একমত পোষণ করতেন যে অনিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র মানে হলো রাষ্ট্রব্যাবস্থার ধ্বংস (দ্রঃ :Parallel Thinking. লেখক Edward De Bono, পৃষ্ঠা- 7)

প্লেটো গণতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন কিন্তু সে গণতন্ত্রকে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণের কথাও তিনি বলেছেন। এ নিয়ন্ত্রণটুকু করবে কে? প্লেটো তাঁর বহুল বিখ্যাত গ্রন্থ

www.pathagar.com

রিপাবলিকে সে এ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণের এ ক্ষমতা থাকবে সমাজের বিশেষ একটা শ্রেণীর হাতে, এই বিশেষ শ্রেণীটিকে তিনি গার্ডিয়ান নামে অভিহিত করেছেন, এরা হলো সমাজ বা রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণী। এভাবে স্বভাবতই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই গার্ডিয়ান শ্রেণীটিকে নিয়ন্ত্রণ করবে কে? কখনও যদি এই গার্ডিয়ান শ্রেণীটি বা শাসক গোষ্ঠীকে স্বেচ্ছাচারী ভূমিকায় নামতে চায় বা নেমেই পড়ে তবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার পথ কী, আর এই নিয়ন্ত্রণটি আরোপ করবেই বা কে? এ ব্যাপারে তিনি অস্বাভাবিকভাবে নীরব। বস্তুত এটিই হলো প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় মৌলিক ত্রুটি, প্রথম মৌলিক ত্রুটিও আমরা ইতোমধ্যে আমাদের বিস্তারিত আলোচনায় দেখেছি তা হলো আইনের উৎস সংক্রান্ত। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত গণতন্ত্রের মৌলিক দুটি ত্রুটি, একটি হলো এর আইনের উৎস হলেন জনগণ, আর দ্বিতীয় ত্রুটি হলো এ ব্যবস্থাটিকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণের কোনো কার্যকর সূত্র নেই।

অপরদিকে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা হলো প্রকৃত অর্থে এবং বাস্তবিকই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। গণতন্ত্রকে এর সঠিক কাঠামোতে ধারণ করে অক্ষত রাখে এবং এর মর্যাদাকে সে অক্ষুণ্ন রাখে ও সেই সাথে ইসলাম গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণও করে থাকে। প্রচলিত গণতন্ত্রের যে দুটি মৌলিক ত্রুটি আমরা দেখেছি ইতোপূর্বে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার একটিমাত্র পদক্ষেপ দ্বারা এ দুটো বৃহৎ ও প্রধান মৌলিক ত্রুটিসমূহকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করা হয়েছে। আর সেই পদক্ষেপটি হলো আইনের উৎস জনগণ নয়। বরং আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র ও একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন–

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ـ (يُوْسُف ـ ٤٠)

অর্থাৎ, 'সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়।' (সূরা ইউসুফ-৪০)

অন্যত্র তিনি আরও বলেন-

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ـ (الاَعْرَاف ـ ٥٤)

অর্থাৎ সাবধান! সৃষ্টি তাঁর এবং হুকুমও চলবে তাঁরই। (সূরা আ'রাফ-৫৪)

তাঁর আইন-ই আইন। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রশ্ন অবান্তর। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এ আইনে কোনোরূপ পরিবর্তন অসম্ভব, তিনি সুস্পষ্টরূপে তাঁর প্রিয় রাসূল (সা.) ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে নির্দেশ দিচ্ছেন–

www.pathagar.com

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ ـ (الاَنْعَام ـ ١١٦)

অর্থাৎ, "আর হে মুহাম্মদ, আপনি যদি দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের কথামত চলেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে দেবে। তারা তো শুধু অনুমানের.অনুসরণ করে। তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথা বলে।" (সূরা আল-আন'আম-১১৬)

অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠতা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মৌলিক উৎস অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত কোনো আইন বা বিধি-বিধানকে পরিবর্তন করতে পারে না। বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত নির্দেশকে তাঁর পেয়ারা হাবীব মোস্তফা (সা.) নিজের জীবদ্দশায় যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেটাই হলো আইনের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ও রূপ। আর ইসলামী আইনের এ ব্যাখ্যা শাসক ও শাসিত উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান ও ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন-

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ ـ

অর্থাৎ, "যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যে আমার অবাধ্য হলো, সে আল্লাহরই অবাধ্য হলো।"

আর অপর দিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পাক কালাম মজিদে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন–

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ـ (النِسَآء ـ ٨٠)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করে।" (সূরা নিসা-৮০)

কাজেই এখানে সহজেই বোধগম্য যে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ জনগণ বা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ কারোর পক্ষেই ব্যক্তি স্বাধীনতা মানবাধিকার নারী স্বাধীনতা মুক্ত চিন্তা আধুনিকতা বা প্রগতিশীলতার সাথে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করার সুযোগ নেই। এ ধরনের সুযোগের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনার অস্তিত্বও এ শাসন ব্যবস্থায় কল্পনা করা যায় না। ইসলাম যে গণতন্ত্রের কথা বলে বা ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় যে গণতন্ত্র চালু থাকে তা হলো নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র। এখানে নিয়ন্ত্রণকারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, দেশের বা প্রশাসনের ব্যক্তিগণ নন। এ শাসন ব্যবস্থায় দেশের প্রশাসক হলেন একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্র, যিনি আল্লাহপাকের এ নিয়ন্ত্রণকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন মাত্র। নিয়ন্ত্রণের তাঁর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব থাকে না।

www.pathagar.com

ইসলাম হলো একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র বা Ideological state' একটি সুনির্দিষ্ট, পূর্বঘোষিত, প্রকাশ্য ঘোষিত, শাশ্বত ও সর্বজনীন আদর্শকে ধারণ ও ঐ আদর্শের ওপর ভিত্তি করে ঐ আদর্শেরই নিষ্ঠাবান অনুসারীদের হাতে এ রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি গড়ে ওঠে ও তাঁদের দ্বারাই তা পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে বা তার অপব্যবহার করে এমন কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার ক্ষমতা কারোরই থাকে না যার দ্বারা সে আদর্শের ভিত্তিতে এ রাষ্ট্রটি গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয়ে আসছে, তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি বা তার আদর্শ বিচ্যুতির কারণ ঘটতে পারে বা তার ঘোষিত আদর্শের সাথে এ রাষ্ট্রটি সাংঘর্ষিক অবস্থার মুখোমুখি হয়ে পড়তে পারে। এতটুকু নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখাটা এই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিতান্তই প্রয়োজন ও যৌক্তিক, একথা অস্বীকার করার কোনো পথ নেই। এ জন্যই আমরা ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় যে গণতন্ত্র, সে গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র বলে অভিহিত করেছি।

নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতাটুকু প্রশ্নাতীতভাবে অনস্বীকার্য। নিয়ন্ত্রণের এই যে প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা, তা একটি বিশেষ সীমারেখা পর্যন্ত। আমাদের দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে বিভিন্ন সময়ে সামরিক শাসকরা তাদের শাসনের এক পর্যায়ে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে অন্তর্বর্তী সময়টুকুতে যে ধরনের নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের সুযোগ বা অধিকার প্রদান করে থাকে এবং সামরিক শাসন হতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উত্তরণের বিভিন্ন ধাপে যে ধরনের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও শিথিল করে থাকেন গণতন্ত্রের ওপর, এটা সে ধরনের নিয়ন্ত্রণ নয়। বরং ইসলাম গণতন্ত্রকে স্বৈরাচারী ভূমিকায় পর্যবসিত হওয়া থেকে রক্ষা করে, গণতান্ত্রিক স্তর হতে বিচ্যুতি হওয়া থেকে বাঁচিয়ে তোলে। গভীর বিশ্লেষণে ভেবে দেখলে দেখতে পাবেন যে, ইসলাম গণতন্ত্রকে যেকোনো ধরনের বিচ্যুতি হতে রক্ষা করে ও যথেচ্ছাচারে গা ভাসিয়ে দেবার সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়ে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহকে অক্ষুণ্ন রাখে ও তা নিশ্চিত করে তোলে।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে দেশ ও রাষ্ট্রের জনগণ, সরকার তথা সকলে মিলে তাদের প্রয়োজন মত বিধি-বিধান তথা আইন-কানুন রচনা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা প্রয়োগ করতে পারে, তবে শুধুমাত্র দুটি বিষয়ের প্রতি এক্ষেত্রে তাদেরকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে, তার প্রথমটি হলো এই যে, নতুন যে বিধান বা আইনটি তারা রচনা করছেন বা করতে যাচ্ছেন তা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস তথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার নির্দেশ ও তাঁর পেয়ারা হাবীব মোস্তফা (সা.)-এর সুন্নাহ এবং তাঁর প্রধান চার সহচর, যাদেরকে আমরা খোলাফায়ে রাশেদা বলে জানি, তাঁদের কর্মপদ্ধতির বিপরীত যেন না হয়। আর এর পরে দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি তাদের দৃষ্টি রাখতে হবে তা হলো এই যে, তাদের মধ্যে এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই প্রক্রিয়াটি হতে হবে পারস্পরিক

www.pathagar.com

শলা-পরামর্শের ভিত্তিতে। এ দুটি মৌলনীতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে তা মেনে চলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় শাসকবর্গ জনগণ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের নিরিখে যে কোনো বিধান রচনা ও জারি করতে পারেন। এটিই হলো ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র। দেড়হাজার বছর পূর্বে মরুভূমির বুকে পশ্চাৎপদ জাতির ভেতর হতে একজন উম্মি নবীর ওপর নাযিল হওয়া বিধি-বিধান এত বহু বছর, বহু শতাব্দীর পরে এসে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান যুগোপযোগী আইন রচনা করতে বা আইনের উৎস হতে পারে কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। যদিও এই একটি প্রশ্নই বিগত কয়েকটি শতাব্দী ধরে পশ্চিমা বিশ্বসহ মুসলিম বিশ্বের ইসলাম বিদ্বেষী একটি অংশ কর্তৃক সচেতনভাবে চর্চিত ও আলোচিত হয়ে আসছে–আজও এই প্রশ্নটি নিয়তই উত্থাপিত হয়ে থাকে ইসলাম বিরোধিতার ক্ষেত্রে। বস্তুত ইসলাম সমাজ সভ্যতার বিবর্তন ও অগ্রগতিকে ধারণ করে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। ইসলামী দর্শনের এখন একটি অভ্যন্তরীণ শক্তি ও নিজস্ব স্বকীয়তা আছে যে, যেকোনো আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়েও ইসলামকে শাশ্বত ও নতুন বলেই মনে হবে। এর মূল কারণটি হলো এই যে, ইসলাম কখনই কোনো নির্দিষ্ট কাল বা যুগকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় না বরং ইসলামের সকল কিছুর মূলে রয়েছে মানুষ। মানুষ ও তার প্রয়োজনকে ঘিরেই ইসলাম আবর্তিত হয়, ফলে যুগ, কাল, সমাজ অর্থনীতি ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, মানুষ যেহেতু বিশ্বে অবস্থান করে, তাই ইসলামও তাকে কেন্দ্র করেই যুগ হতে যুগান্তরে আবর্তিত হতে থাকে। কোনো একটি যুগে এসেও ইসলামকে পুরনো বা সেকেলে, সময়োত্তীর্ণ অনুপযোগী বলে মনে হয় না।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিভিন্ন জাতি দেশ, স্থান, কাল, পাত্র ও ভৌগোলিক অবস্থানে প্রয়োজনের নিরিখে বিবর্তিত সামাজিক ধারার আইন-কানুন 'ই জাতি হদ' বা Expositlon of thoughts এর মাধ্যমে (ইসলামের মৌলিক রিধি-বিধান শিক্ষা ও দর্শনকে সামনে রেখে, সেই আলোকে) প্রণয়নের সুযোগ আছে বলেই ইসলাম সর্বকালের জীবনাদর্শ বলে স্বীকৃত। এ দুর্লভ গুণটির কারণেই ইসলাম কোনোদিন সেকেলে হয় নি, এটির কারণেই ইসলাম কোনো পরিবর্তিত যুগে সমকালীন প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী পথ, পদ্ধতি, বিধি-বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে সক্ষম। চিন্তা ও কর্মের এতটা স্বাধীনতা আছে বলেই ইসলাম শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন-বিধান, পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন দর্শন। পৃথিবীর অন্য কোনো জীবন পদ্ধতি বা দর্শনে চিন্তা ও কর্মের এতটা স্বাধীনতা প্রদান করা হয়নি।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায় ঃ পরামর্শভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসন

ইতোপূর্বের অধ্যায়ে আমরা আইনের শাসন এর বিভিন্ন দিক আলোচনা করতে যেয়ে বলেছি যে, ইসলাম হলো গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। গণতান্ত্রিক কাঠামো অবয়ব ও তার সকল মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলি হতে যেকোনো ধরনের বিচ্যুতিকে সে রক্ষা করে। এর পাশাপাশি একথাও আমরা বলেছি যে ইসলামে গণতন্ত্র প্রচলিত গণতন্ত্রের ন্যায় বাঁধা-বন্ধন ও নিয়ন্ত্রণহীন উন্মুক্ত নয় বরং তার বিপরীত– এখানে গণতন্ত্র হলো সুষ্ঠু স্পষ্ট সীমারেখার আওতায় সুনিয়ন্ত্রিত। সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার নির্দেশ করা বিধি-বিধান দ্বারা এখানে গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ভবিষ্যতেও ঐ একইভাবে তা বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমহীনভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে। এখানে ক্ষমতাধর কোনো শাসকগোষ্ঠী বা প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় কোনো ধর্মীয় প্রভাব বা অন্য কোনোপ্রকারে গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। কারো জন্য এ ধরনের কোনো সুযোগ বা কর্তৃত্ব ইসলামে আদৌ স্বীকৃত নয়।

প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাধিকের জোরে যেসব সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে, সেসব বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ওপর অর্থাৎ সমাজবাসীর ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতের প্রতিফলন। এ মতামত, গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যদি সকল নীতি-নৈতিকতার বিরোধীও হয় তাদের পোষণকৃত আদর্শ ও বিশ্বাসের পরিপন্থীও হয় তবুও তা তারা মেনে নিতে বাধ্য। তারা তা মানতে ও মেনে চলতে বাধ্য কারণ, এটি তখন ঐ দেশ বা সমাজের স্বীকৃত আইনে পরিণত হয়ে যায়। এভাবে সময়, সমাজ, সামাজিক মূল্যবোধ, ভূ-রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক ও আদর্শিক পরিবর্তনসহ বিভিন্ন রকমের কার্যকরণের ফলে একটা সময় এমন আছে যে, সমাজের অধিকাংশ জনগণ তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ঐ একই সমাজের ক্ষুদ্র অথচ ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী একটি জনগোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে। এই ক্ষুদ্র অথচ প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীই নিজেদেরসহ আপামর জনসাধারণের জন্য কল্যাণ-অকল্যাণ করণীয়-বর্জনীয় নির্ধারণ করে। সকল ক্ষমতা, প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা, বিত্ত-বৈভবসহ আনুষঙ্গিক অনুকূল পরিবেশ এর জোরে তারা যদি শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতার সাগরে গা ভাসিয়ে দিতে চায় তবে তারা তা অনায়াসে পারে এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা তা করেও থাকে। এটা বর্তমান যুগে যেমন সচারাচর দেখা যায় তেমনি প্রাচীনকালেও তা ছিল। প্রাচীন গ্রিস (এথেন্স) এর সেই ইতিহাসখ্যাত ত্রিশ স্বেচ্ছাচারী শাসক (Thirty Tyrant) এর কথা তো রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানেন। আজও দেশে দেশে সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের হাতে দেশ ও সমাজের জন্য তাদের দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের

www.pathagar.com

সার্বিক ক্ষমতা নিবদ্ধ থাকে। ক্ষুদ্র এই জনগোষ্ঠীই (আমাদের দেশে চৌদ্দ কোটি জনগণের বিপরীতে মাত্র তিনশত জন) তাদের নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ, আলাপ-আলোচনা করেই তো আইন রচনা বা বাতিল বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা সংশোধন করেন। এখানেও তারা দাবি করেন যে তারা পরামর্শভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন এবং তাদের এ দাবি যথার্থই বটে।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থাতে একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক অপর দিকে তেমনি তা পরামর্শভিত্তিকও বটে। অর্থাৎ পরামর্শের ভিত্তিতে এ শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে। এ পরামর্শ যেমন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের মধ্যে, ঠিক তেমনি তা অপর দিকে শাসকবর্গও শাসিত জনসাধারণের মধ্যেও। এ উভয় ক্ষেত্রে যথাযথ পরামর্শের ভিত্তিতে যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদনের কথা ইসলামে বলা হয়েছে। এটা ঐচ্ছিক কোনো ব্যাপার নয়, বরং এটা বাধ্যতামূলক সকলের জন্য সর্বাবস্থায়। পরামর্শ করা বা পরামর্শ নেয়া যেমন বাধ্যতামূলক তেমনি সকল অবস্থায় যৌক্তিক পরামর্শ দেয়াটাও বাধ্যতামূলক। এটা ব্যক্তি বা সমষ্টি উভয়ের ক্ষেত্রেই দায়িত্ব হিসেবে বিবেচ্য। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের এটি হলো অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি। এটি হলো ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত এর রুহ বলা চলে। কিন্তু প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রচলিত গণতন্ত্রে পরামর্শ এর ধরন ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, এ উভয়ের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা এ বিষয়ে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথমেই আমরা যে বিষয়টি দেখব তা হলো ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় অনুসৃতব্য বিধি-বিধান, আইন-কানুনের মূল ও একমাত্র উৎস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা এই পরামর্শ সংক্রান্ত বিষয়ে কী নির্দেশ দান করেছেন। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ـ (اٰلِ عِمْرَان ـ ١٥٩)

অর্থাৎ, "আপনি তাদের সাথে সার্বিক বিষয়ে পরামর্শ করুন।" (সূরা আলে-ইমরান-১৫৯) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর দৃষ্টিতে তাঁর নিকট পরকালীন জীবনে নাজাত ও মুক্তি পাবার যোগ্য লোকদের গুণাবলি বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও তিনি ঐসব লোকদের জীবনে এ গুণটির (পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ) উপস্থিতির কথা বলেছেন-

যেমন দেখুন-

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ (الشورٰى ـ ٣٨)

www.pathagar.com

অর্থাৎ, "যারা নিজেদের রব এর হুকুম মানে, নামায কায়িম করে, নিজেদের যাবতীয় কর্মাদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সমাধা করে এবং তাদের যে রিজিক দান করি তা হতে খরচ করে।" (শুরা-৩৮)

কুরআনুল কারীম হতে উদ্ধৃত করা উল্লিখিত আয়াত দুটির প্রথমটির দিকে পুনরায় দৃষ্টি দানের জন্য সম্মানিত পাঠকদের অনুরোধ করছি- যেখানে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব মোস্তফা (সা.)কে নির্দেশ দিচ্ছেন তাদের সাথে (هم) যাবতীয় প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে পরামর্শ করতে। আরবী ভাষায় هم একটি সর্বনাম যার অর্থ হলো 'তাদের' 'তাহাদের' 'তাহাদিগের' ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সা.)কে নির্দেশ দানের বেলায় এই 'তাহারা' বা 'তাদের' বা 'তাহাদিগের' শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কাদের বোঝাতে চেয়েছেন। এটা নিশ্চিত যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গী-সাথী আসহাব তথা যাদের মধ্যে তিনি তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন সেসব জনসাধারণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। রাষ্ট্রপ্রশাসন ও সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের সাথে পরামর্শ করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাদেরকে একীভূত করার কথা বলেছেন। আমরা অন্যভাবে এ কথাটাও বলতে পারি যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এখানে নির্দেশ দিয়ে এটা বাধ্যতামূলক করেছেন। তাঁর প্রিয় রাসূলসহ সকলের জন্য সকল কাল ও সমাজের জন্য একটি অলঙ্ঘনীয় মৌলনীতি তা হলো এই যে, প্রশাসন তথা রাষ্ট্র চলবে শাসক ও শাসিত উভয়ের পরাস্পরিক শলাপরামর্শের মাধ্যমে, শুধু শাসক এর একার ইচ্ছা বা অভিলাষ অনুযায়ী নয়।

পারস্পরিক শলা-পরামর্শ এর গুরুত্ব ইসলামে কতটুকু, এ কথা বুঝতে হলে আমাদের এটা লক্ষ্য করতে হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিটি মুহূর্ত সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হতেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর প্রত্যক্ষ অহী দ্বারা, করণীয়-বর্জনীয় প্রতিটি কাজের নির্দেশ ও নির্দেশনাসহ যার কাছে সবসময় আসা-যাওয়া করতেন আল্লাহপাকের মহান সম্মানিত ফিরিশতা অহী বাহক জিবরাঈল (আ.), যে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের পছন্দ বা নিজের মতানুযায়ী কিছু করতেন না বা বলতেন না বরং তিনি যা বলতেন তা সবই হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার নির্দেশ অনুযায়ী, কোনো ফায়সালাই তিনি নিজের হতে করতেন না, বরং তাই করতেন যা করার জন্য তিনি নির্দেশপ্রাপ্ত হতেন যার ব্যাপারে স্বয়ং কালামে পাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাক্ষ্য দিচ্ছেন, কুরআনুল কারীমের ভাষায়–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ـ (اَلنَّجْمُ ـ ٣ ـ ٤)

অর্থাৎ, তিনি (রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ থেকে কিছু বলেন না, তিনি তো শুধু তাই বলেন– যা তাঁর প্রতি অহী করা হয়। (সূরা আন্ নজম, ৩-৪)

www.pathagar.com

এতে এ কথা প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ না নিজের থেকে কিছু বলেছেন আর না তিনি আল্লাহর নাযিল করা নির্দেশ বা বিধানাবলির সাথে কিছু সংমিশ্রণ করেছেন।

এই হলো যে, রাসূল (সা.)-এর ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সাক্ষ্য; সেই রাসূলুল্লাহকেই নির্দেশ দেয়া হলো– তিনি যেন তাঁর সকল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাজকর্মেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তাঁর সকল সাথীদের সাথে পরামর্শ করে নেন। এ বিষয়টি হতেই এ কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় পারস্পরিক পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ ও অলঙ্ঘনীয় এবং কেন তা এ শাসন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ ও মৌলিক শর্তসমূহের মধ্যে একটি।

এ নির্দেশ যখন তাঁর (রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর নাযিল হয় তখন তিনি মদীনার রাষ্ট্রপতি প্রশাসক। সেখানে তাঁর রাজ্য আছে সেই রাজ্যের সীমানা আছে প্রশাসন ও নাগরিকগণও আছে-তিনি স্বয়ং সেই রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠাতা ও অধিনায়ক। তাঁর নিঃশ্বর্ত ও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্যের ওপরেই ঐ রাষ্ট্রের বা সমাজের (এমনকি সমগ্র মনুষ্য প্রজাতির সকল সদস্য প্রতিটি নর-নারীর বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য) সকলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিশেষ করে পারলৌকিক অন্তহীন জীবনের সাফল্য সুখ ও শান্তি নির্ভর করছে। সেই তাকেও কিনা সকল সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাজকর্মে তাঁর সঙ্গী-সাথী আসহাবদের সাথে পরামর্শ করে নিতে বলা হয়েছে।

একটি জনগোষ্ঠী বা একটি গোষ্ঠী (হোক না তা কোন একটি শাসক গোষ্ঠী) যখন পারস্পরিক শলাপরামর্শ এর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে করণীয় বিষয় স্থির করে নেয় যখন তারা তাদের যেকোনো সমস্যা বা যেকোনো বিষয়ের ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও শলাপরামর্শ দ্বারা স্থির করে নেয়, তখন এ প্রক্রিয়ার একটি দারুণ ও দির্ঘস্থায়ী ফলপ্রসূ মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব (Psychological effect) পড়ে। ছোট-বড় সকলের মনের মধ্যে একটি সংঘবদ্ধ চেতনা গড়ে ওঠে মনস্তত্ত্বের ভাষায় যাকে Team spirit নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কোন একটি গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হবার ক্ষেত্রে এটি একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ বা "Inavitable componentহিসেবে স্বীকৃত। এটির অভাব ঘটলে কোনো গোষ্ঠী বা সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের সাথেই তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরভাবে এবং সফলতার সাথে বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

একটি দল বা গোষ্ঠীতে বিভিন্ন মন-মেজাজ, মেধার বিভিন্ন স্তর, রুচি পছন্দের বৈপরীত্য, বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন দিকে দক্ষ-অদক্ষ, দুর্বল, সক্ষম, পারদর্শী, অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ সদস্য থাকে। সকলের আন্তরিক অকৃত্রিম ও নিষ্ঠাপূর্ণ

www.pathagar.com

অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে পরামর্শটুকু করা হয় কোন বিশেষ প্রয়োজন বা সমস্যাকে কেন্দ্র করে সে ক্ষেত্রে সকলে নিজ নিজ মেধা, রুচি, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, পছন্দ ও অপছন্দ এবং প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার আলোকে তাদের নিজ নিজ মতামত পেশ করে থাকে ফলে তাৎক্ষণিকভাবে একটি বিষয়কে ভিত্তি করে তার বিভিন্ন দিক নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়ে যায়, সেখানে উপস্থিত সদস্যগণ অন্য সদস্যের আলোচনা ও বিশ্লেষণ হতে এমন একটি ধারণা ও চিত্র সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়ে পেয়ে যান, যা ইতোপূর্বে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল বা এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি আলোচ্য বিষয়ে গড়ে ওঠে যে দৃষ্টিভঙ্গি তিনি ইতোপূর্বে পোষণ করতেন না। এভাবে আলোচনা-পরামর্শে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়টিতে নিজ নিজ জ্ঞান অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে নিতে পারেন। যেমনি-তেমনি সকলের অংশগ্রহণের ফলে বিষয়টি কোনো একক ব্যক্তির এজেন্ডা না হয়ে সকলেরই এজেন্ডা হিসেবে গড়ে ওঠে। এর ফলে গৃহীত সিদ্ধান্তটিও সঙ্গত কারণেই কোন একক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত না হয়ে বরং সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হিসেবে রূপ নেয় এবং এর অনিবার্য আরও একটি ফল এই হয় যে, গৃহীত সিদ্ধান্তটি তখন সর্বাধিক ত্রুটিমুক্ত এবং সর্বাপেক্ষা সঠিক সিদ্ধান্ত হিসেবে গড়ে ওঠে। এর বাস্তব প্রমাণ রয়েছে– আমাদের সম্মুখেই। সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী প্রখ্যাত ইমাম হযরত আবু হানিফা (রহ.)-এর কথা চিন্তা করুন। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণ কী? তাঁর ফিক্‌হী মাসয়ালা সারা বিশ্ব জুড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখক মুসলমানদের নিকট তাদের প্রাত্যহিক জীবনে গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণীয় হয়ে ওঠার পেছনে মূল কার্যকারণটি কী এই নয় যে, তাঁর উদ্ভাবিত মাসয়ালা-মাসায়েলগুলো যুক্তির বিচারে ও কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিকোণ হতে সবচেয়ে বেশি সঠিক ও ত্রুটিমুক্ত বলে স্বীকৃত? তিনি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য এক দুরূহ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, এক বিরাট খেদমত করেছেন মুসলিম জাতির। তিনি তাঁর জীবনে কুরআন-হাদীস বিশ্লেষণ করে প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ মাসয়ালা চয়ন করেছেন। জীবনের এমন কোনো অঙ্গন নেই, যে অঙ্গনের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় মাসয়ালা তিনি চয়ন করেননি। এই বিশাল ৬ (ছয়) লক্ষ মাসয়ালাসমূহের মধ্যে তিনি নিজের জীবনে, নিজের সিদ্ধান্তে চয়ন করেছেন মোট ৮৩ (তিরাশি) হাজার (আটত্রিশ হাজার ইবাদাত সংক্রান্ত ও পঁয়তাল্লিশ হাজার মুয়ামালাত সংক্রান্ত) আর বাকি ৫ লক্ষ ১৭ হাজার মাসয়ালা মাসায়েল চয়ন হয়েছে। সামষ্টিক আলাপ-আলোচনা, বিচার- বিশ্লেষণ, সামষ্টিক গবেষণা ও শলাপরামর্শের মাধ্যমে। তাঁর প্রায় ৪০ (চল্লিশ) হাজার ছাত্র বা শিষ্য ছিল। কোন একটি সমস্যাকে তিনি তাঁর সেসব ছাত্র-শিষ্যদের সামনে পেশ করতেন। ছাত্রদের সাথে তিনিও তা নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণে অংশ নিতেন। কখনও কখনও এমন হতো যে জটিল একটি বিষয় নিয়ে দিনের পর দিন এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাসের পর মাস আলোচনা

www.pathagar.com

চলত। কুরআন-হাদীস ও রাসূলুল্লাহ (সা.)সহ তাঁর সম্মানিত সাহাবীদের জীবন হতে উদ্ধৃতি তথ্য ও প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে যুক্তি পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন ও খণ্ডন চলত। আলোচনা যুক্তিনির্ভর ও প্রাণবন্তু হয়ে ওঠত। ছাত্ররা একটি সমস্যার সমাধান খুঁজতে যেয়ে হাজারো যুক্তি তথা হাদীস ও কুরআনের দলিল শিক্ষা পেয়ে যেতেন। অবশেষে একটা সময় আসত সকলের সম্মিলিত পর্যালোচনার মাধ্যমে। যে মাসয়ালাটি বের হয়ে আসত, তা হতো সর্বাপেক্ষা যুক্তিনির্ভর, সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল ও ত্রুটিমুক্ত এবং একই সাথে ইসলামের মৌলিক দর্শনের সাথে সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্মিলিতভাবে শলা-পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার ফলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব এই হয় যে, আলোচ্য বিষয়টিতে ঐকমত্য হয়ে যাবার ফলে তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় কার্যত কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় না। একটি সিদ্ধান্ত যদি একটি গোষ্ঠী বা সমাজের সর্বসম্মত ঐকমত্যের ওপর ভিত্তি করে গৃহীত হয়, তবে সে সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো কার্যকর বিরোধিতা অন্তত ঐ সমাজের ভেতর হতে আসবে না, ফলে গৃহীত সিদ্ধান্তটি বাস্তবে রূপ দেবার ক্ষেত্রে কোনোরকম অন্তর্কলহ বা পারস্পরিক বিরোধিতা, বাধা বিপত্তি, ঝগড়া তর্ক বা বাদ-প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয় না, যার ফলে সমাজে ভ্রাতৃত্ব ঐক্য, সামাজিক সম্প্রীতি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট বা বিঘ্নিত হবার মত কোনো কারণের উদ্ভব ঘটে না।

প্রতিটি মানুষই মনে করতে থাকে যে গৃহীত সিদ্ধান্তটি তার নিজের দেয়া সিদ্ধান্ত। তার নিজের মতামতটিই সামষ্টিক সিদ্ধান্তের রূপ নিয়ে বাস্তবে প্রয়োগ হচ্ছে। ফলে প্রত্যেকে সিদ্ধান্তটির সাথে সার্বক্ষণিকভাবে নিজের আত্মিক ও মানসিক সংশ্লিষ্টতা অনুভব করেন এবং সিদ্ধান্তটি বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানের প্রচেষ্টা চালিয়ে সর্বাপেক্ষা কার্যকর অবদান রাখার চেষ্টা করেন। এখানে শাসকগোষ্ঠী বা তাদের কেউ এ ধরনের উন্নাসিকতায় ভোগার সুযোগ পান না যে, এটি তার বা তাদের দুটি কয়েকজনের মতামত। তারা তা প্রশাসনিক বা রাষ্ট্রীয় নির্দেশ বা আইনের আকারে চাপিয়ে দিয়েছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার ওপর আর এসব জনতা তাঁদের এই সিদ্ধান্তকেই বাস্তবে রূপ দিচ্ছে মাত্র। অপর দিকে সাধারণ জনগণের মধ্য হতেও কারো এ ধরনের হীনম্মন্যতায় ভোগার কোন রকম অবকাশ সৃষ্টি হয় না যে, গৃহীত এ সিদ্ধান্তটি তাদের ওপর কোন ব্যক্তি বা কোন প্রভাবশালী গোষ্ঠী কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এটি তাদের নিজেদের বোধ-বিশ্বাস আর মতামতের প্রতিফলনকে ধারণ করেনি। বস্তুত এখানে না কোন পক্ষের আত্মপ্রসাদে উল্লসিত হবার সুযোগ আছে আর না কোন পক্ষের হীনম্মন্যতায় ভোগার কোন রকমের শংকা আছে। কোন একটি রাষ্ট্র-দেশ বা সমাজে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে মতপার্থক্য মানসিক দূরত্ব, সম্প্রীতি-সৌহার্দ ও আস্থার বিঘ্নঘটা, অনাস্থা সৃষ্টি

www.pathagar.com

হওয়া বা অবিশ্বাসের সূত্রপাত ঘটাসহ সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির যে কয়টি প্রধান মৌলিক কারণ থাকে তার মধ্যে কোন একটি গোষ্ঠীর (মূলত শাসকগোষ্ঠী বা যাদের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত) এ ধরনের উন্নাসিকতায় ভোগা এবং এর বিপরীতে অপর কোন গোষ্ঠীর (মূলত শাসিত গোষ্ঠী বা সাধারণ জনগণ) হীনম্মন্যতায় ভোগা হলো অন্যতম একটি কার্যকারণ।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা ও শলাপরামর্শের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়-সামাজিক ও প্রশাসনিকসহ সকল ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের এ প্রক্রিয়াতে বাধ্যতামূলক করে দেবার মাধ্যমে সূক্ষ্মদর্শী মহাজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামী দর্শন ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি সমাজ বা রাষ্ট্রে অনৈক্য বিশৃঙ্খলা, অনাস্থা অবিশ্বাস সৃষ্টির মাধ্যমে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ও ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে তার সকল সম্ভাবনা ও পথকে বন্ধ করে দিয়েছেন।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় জনগণের মতামত ও সেই আলোকে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি পরামর্শ সভা (Consultative council) থাকে যার অপর নাম হলো ইসলামী পরিভাষায় মজলিস এ শুরা। এ মজলিস এ শুরার সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ গোপন ও স্বাধীন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসেন। অবশ্য স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বা আমীর তথা ইসলামী রাষ্ট্রের মূল দায়িত্বশীল প্রশাসকেরও ইখতিয়ার থাকে এ ব্যাপারে (অন্তত ক্ষুদ্র একটি অংশকে শুরার সদস্য পদে) মনোনয়ন দেবার, তবে তা বাধ্যতামূলক নয় যদিও। ইসলামী সমাজে ইসলামী শিক্ষা দর্শন ও ভাবধারায় উজ্জীবিত ও শিক্ষিত মুসলমান জনগণ তাদের দৃষ্টিতে ইসলামী দর্শনের মানদণ্ডে বিবেচিত যোগ্য, আল্লাহভীরু সৎ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান অনুসারী, জ্ঞান, দক্ষতা, সততা, আমানতদারী ও দূরদর্শিতায় অপেক্ষাকৃত সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন মুসলমান ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে পরামর্শ সভা বা মজলিস এ শুরা বা দেশের পার্লামেন্ট এ পাঠাবেন, এটা জনগণের ঐচ্ছিক কোন ব্যাপার নয় বরং এটা তার দায়িত্ব, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, পাশাপাশি ইবাদতও বটে। একে পাশ কাটিয়ে যাবার কোন সুযোগ নেই। পার্লামেন্ট বা শুরার এসব সম্মানিত সদস্যরা প্রকৃতই তাদের বাস্তব জীবনে ইবাদাতগুজার, আল্লাহভীরু, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান অনুসারী ব্যক্তিরাই হয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের যোগ্যতা ও পরিচয় তুলে ধরতে যেয়ে কুরআনুল কারীমের এক স্থানে বলেন–

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ (٢) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (٣) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ (٤) وَالَّذِيْنَ هُمْ

www.pathagar.com

لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ (٥) اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ (٦) فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰالِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ (٧) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ (٨) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ـ (٩) ' (المؤمنون ٢-٩)

অর্থাৎ, "যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। যারা বিরত থাকে অপ্রয়োজনীয় বেহুদা কাজ হতে। যারা যাকাতের ব্যাপারে (প্রদান-আদায় ও বিতরণ) তৎপর হয়। যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, নিজেদের স্ত্রী ও সেই মহিলাদের ছাড়া, যারা তাদের মালিকানায় আছে এ ক্ষেত্রে তারা ভর্ৎসনাযোগ্য নয়। অবশ্য এদের ছাড়া অন্যকিছু চাইলে তারাই সীমালংঘনকারী হবে। যারা তাদের আমানত ও ওয়াদাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং নিজেদের নামাযগুলোর পূর্ণ হিফাযত করে।" (সূরা মু'মিনুন ২-৯ আয়াত)

অতঃপর অন্যত্র তিনি তাদের পরিচয় তুলে ধরতে যেয়ে আরও বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ه وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ه (٧٢) وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا (٧٣) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ (٧٤) (اَلْفُرْقَان٧٢ـ٧٤)

অর্থাৎ, (আর রাহমানের বান্দাহ তো তারা) যারা মিথ্যার সাক্ষী হয় না, আর কোনো অর্থহীন বিষয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে হলে ভদ্র মানুষের মতই অতিক্রম করে। যারা নিজেদের রবের নির্দেশ দ্বারা নসিহত করা হলে তারা সে ক্ষেত্রে অন্ধ ও বধির হয়ে পড়ে থাকে না এবং যারা দোয়া করতে থাকে; হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দ্বারা আমাদের চক্ষুসমূহের শীতলতা দান করো এবং আমাদের পরহেজগার লোকদের ইমাম বানাও। (সূরা ফোরকান, ৭২-৭৪)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ (٣٢) وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣٨) وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ (٣٩) (اَلشُّوْرٰى ـ٣٧ـ٣٨ ـ٣٩)

www.pathagar.com

অর্থাৎ, যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজকর্ম হতে ফিরে থাকে আর রাগ হলে তা ক্ষমা করে। যারা নিজেদের রবের আদেশ মেনে নামায কায়েম করে, নিজেদের যাবতীয় কর্মাদি পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন করে আর তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা হতে খরচ করে। আর তাদের ওপর যখন অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয় তখন তার মোকাবিলা করে।' (সূরা আশশুরা, ৩৭-৩৯)

উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় বর্ণিত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি সম্পন্ন লোকসমূহ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কোনো সত্তার নিকট না তাদের মাথা নত করার মত লোক, আর না তারা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো বা কোনো শক্তির সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পরওয়া করেন। এরা না কোনো আর্থিক-বৈষয়িক প্রলোভনে পড়ে বিচ্যুত হবার সম্ভাবনা আছে আর না তারা তাদের নিজেদের সুযোগ-ক্ষমতা ও প্রভাব এর অপব্যবহার করে কোনো শাসক বা শাসক গোষ্ঠী বা কোনো দায়িত্বশীলকে সত্য পথ হতে বিচ্যুত করবেন। তাঁরা ভয়লেশহীনভাবে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট জবাবদিহির চেতনাকে মনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করে ও শুধুমাত্র তাঁরই (আল্লাহর) সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁদের মতামতকে ব্যক্ত করবেন। এখানে তাঁর মতামত কার পক্ষে বা কার বিপক্ষে গেল তার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা তিনি করবেন না। সে সুযোগও ইসলাম তাঁদের দেয়নি।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় পরামর্শ সভায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর আদর্শ ও শিক্ষার পরিপন্থী কোনো ধরনের কোনো পরামর্শ কেউ প্রদান করবেন না। না বুঝে, ভুলক্রমে যদি কেউ তেমন কোনো পরামর্শ প্রদান করেও থাকেন এবং তা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতামতও হয় তা সত্ত্বেও আমীর বা রাষ্ট্রপতি বা সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ব্যক্তি সে পরামর্শ মানতে বাধ্য নন। বরং তিনি একাই কুরআন ও হাদীস হতে অকাট্য প্রমাণসহ তথ্য উপস্থাপন করবেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি মতামতকে তুলে ধরবেন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিপরীতে। এ ক্ষেত্রে তাঁর একার মতই যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের খেলাফ হয় কিন্তু তা যদি কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বা সামঞ্জস্যশীল হয় তবে তিনি অন্য সকলের মতামতকে উপেক্ষা করবেন এবং অপরদিকে অন্য সকলেই অর্থাৎ পরামর্শ সভার সকল সদস্যগণই তাদের নিজ নিজ মত ও যুক্তিকে পরিত্যাগ করে তাঁর একার মতকেই মেনে নিতে বাধ্য। এভাবেই একটি বিতর্কিত বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করবেন। এরকম একটি ঘটনার উদাহরণ হতে পারে খলীফাতুর রাসূল বলে বিবেচিত আমীরুল মুমিনীন মুসলমানদের প্রথম খলীফা সিদ্দিকে আকবর আবু বকর (রা.)-এর জীবনের সেই ঘটনাটি। আল্লাহর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের অব্যবহিত পর পরই আরবের কিছুকিছু গোত্র ইসলামী রাষ্ট্রকে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি ঘোষণা করে। তারা ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান ও দর্শন যেমন– তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত বা

www.pathagar.com

নামায-রোযা-হজ ইত্যাদি ঠিকই মেনে চলত কিন্তু শুধুমাত্র যাকাত দিতে তাদের অনীহা প্রকাশ করে। তারা নিজেদের মুরতাদও ঘোষণা করেনি বরং মুসলমান পরিচয়েই মুসলিম সমাজে অন্য মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করছিল। যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে তাদের আর কোনো অপরাধ ছিল না।

তাদের প্রতি কী আচরণ করা যায়-ইসলামী রাষ্ট্র তাদের ব্যাপারে কী ধরনের ব্যবস্থা নেবে? মজলিসে শুরায় এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলল, আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রা.) শুরা সদস্যদের সম্মুখে সমস্যাটি তুলে ধরে তাদের মতামত চাইলেন– পরামর্শ দিতে বললেন। তাঁর নিজের মতটিও তিনি শুরার বৈঠকে পেশ করলেন। তিনি (হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চান তা জানিয়ে দিলেন, মজলিসে শুরার সদস্যদের সামনে। মজলিসের শুরার সম্মানিত সদস্যগণ যারা সকলেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতেগড়া ব্যক্তিত্ব তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাঁরই সাহাবী ছিলেন, যেমন হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত সালমান ফারসী (রা.) এরকম বাঘা বাঘা সাহাবীরাও ছিলেন ঐ মজলিসে শুরার সদস্য হিসেবে। মজলিসে শুরার সম্মানিত সদস্যগণ বিস্তর আলাপ-আলোচনা, শলা-পরামর্শ করলেন কিন্তু তারা ঐকমত্যে উপনীত হতে পারছিলেন না। অধিকাংশ সদস্যগণ যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় রাজি নন– ওমর (রা.) স্পষ্ট করে বলেই ফেললেন যে, তারা এক কালেমায় বিশ্বাসী মুসলমান তাদের বিরুদ্ধে আমরা কীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারি? তাঁরসহ অনেক সম্মানিত সাহাবীদেরই মত ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) ওপরে, ঈমান পোষণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, কোনো মতেই সঙ্গত হবে না, কিন্তু খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর মতে অনড় পাহাড়ের মত অবিচল রইলেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পুনরায় তাঁর মত পেশ করে বললেন, "আল্লাহর কসম, যাকাত প্রত্যাখ্যানকারীরা যদি আমাকে একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জামানায় দিত। তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" তাঁর এই মতের সমর্থনে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদীস এর উদ্ধৃতি দিলেন– যেখানে তিনি (সা.) বলেছেন, "ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের দায়িত্বে যেসব অধিকার বর্তাবে, সর্বাবস্থায় তাদের নিকট থেকে তা আদায় করে নেয়া হবে।" তাঁর মুখ হতে এ কথা শোনার পর হযরত ওমর (রা.)সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীগণ অর্থাৎ শুরার সে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার বিরোধিতা করছিলেন। তারা তাদের মতামতকে বদল করলেন এবং হযরত আবু বকরের (রা.) মতকে মেনে নিলেন। পরিশেষে যাকাত অস্বীকারকারীদের নিকট হতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে যাকাত আদায় করা হয়।

www.pathagar.com

এ ঘটনার দুটি দিক রয়েছে, যা আমাদের বিবেচনা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দাবি রাখে আগামী দিনের পথ চলার জন্য তা হলো এই যে, মজলিসে শুরার বা পরামর্শ সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর দর্শন ও শিক্ষানুযায়ী না হওয়াতে একা হযরত আবু বকর (রা.) তা শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত এই বলে মেনে নেন নি। এর বিপরীতে তিনি বরং এ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের বিরোধিতা জারি রাখেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সাথে তাদের সামনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব মোস্তফা (সা.)-এর শিক্ষাকে অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ভাষায় তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ তা হলো এই যে, মজলিসে শুরার দ্বিধান্বিত সদস্য ও সাহাবীবৃন্দ তাঁদের মতামতের বিপরীতে খলীফার মুখ হতে যখন আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর বাণী তথা হাদীস শুনলেন তখনই তাঁদের সকলের নিজ নিজ যুক্তি মতামত মুহূর্তেই বিনা বাক্যব্যয়ে প্রত্যাহার করলেন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মতের প্রতি (যা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং যদিও তা একা খলীফার বা সংখ্যালঘিষ্ঠের মত) অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করলেন এবং এভাবে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। এ ঘটনাটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় পরামর্শ গ্রহণ ও প্রদানের পুরো প্রক্রিয়া ও তার সঠিক পদ্ধতিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এর তাৎপর্য বোঝা সহজ হয়ে যায়।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান (যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন) তিনি এই পরামর্শ সভা বা মজলিস এ শুরার (Consultativ council) এর মতামত নিতে ও তাদের কাছে তার কর্মকাণ্ডের সার্বিক জবাবদিহি করতে বাধ্য। বস্তুতঃ এ ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় যে লাভ তা হলো ক্ষমতা দর্পে সমগ্র জনসাধারণের আনুগত্য, প্রশাসনিক সুবিধা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ (বায়তুল মাল) হাতে পেয়ে একজন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী বা আমীর বা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার যিনি নিজেও একজন মানুষ, মানবীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ধারণ করেই একজন মানুষ এবং একই সাথে একজন রাষ্ট্রপ্রধান, তাকে স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী হবার জাত থেকে রক্ষা করে। এ জন্যই প্রচলিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেভাবে আমরা নির্বাচিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান বা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে তাদের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে পদদলিত করে, তাদের সকল অধিকারের প্রতি বৃদ্ধাঙুলি প্রদর্শন করে, গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার এর জন্ম নিতে দেখি ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় সে রকম কোনো অবস্থার কথা কল্পনাও করা যায় না ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত এ শাসন ব্যবস্থাটি ইসলামী দর্শন ও শিক্ষার ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং তার সকল মৌলনীতিসমূহকে নিজের মধ্যে ধারণ করে রাখবে।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ

সহজলভ্য ন্যায়-বিচার

বর্তমান বিশ্বে দুএকটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সবকটি দেশে ন্যায়-বিচার একটি অলীক স্বপ্ন, একটি কুহেলিকায় পরিণত হয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ আইন, আইনের যথেচ্ছ প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ, ক্ষমতাধর শাসক ও প্রভাবশালী ধনীগোষ্ঠী কর্তৃক বিচার ব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার বা ব্যক্তিগত ক্ষমতা, সামাজিক অবস্থানগত সুবিধা, অর্থনৈতিক সচ্ছলতাসহ রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বিচার এড়িয়ে যাওয়া বা বিচারকে বিলম্বিত করা, পক্ষপাতিত্বপূর্ণ বিচার, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে বিচারকদের প্রভাবিত করা, বিচারক ও বাদী বা বিচারক ও আসামি এদের মধ্যে তৃতীয় অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির উপস্থিতি ইত্যাদিসহ আরও বহুবিধ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বোধগম্য কারণে ন্যায়-বিচার বাস্তবে প্রতিষ্ঠা পায় নি বা প্রতিষ্ঠা করা যায় নি।

বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাই, দেশ বা সমাজের অধিকাংশ জনগণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকগণই সামাজিক-রাজনৈতিক, আদর্শিক ও আর্থিকসহ নানাবিধ কারণে বিভিন্নভাবে জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়ে থাকে। জুলুমের শিকার হয় সমাজের পক্ষ হতে, সরকারের পক্ষ হতে অথবা নিজ গোষ্ঠী বা আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ হতে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নির্যাতিত অধিকার বঞ্চিত মজলুম ব্যক্তি তার অধিকার আদায়ে অথবা তার প্রতি কৃত জুলুম এর বিচার চেয়ে আইনের আশ্রয় চাইবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু এ স্বাভাবিক প্রবণতার পথেই রয়েছে অনেক রকম অস্বাভাবিক ধরনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ, ছোট ও বড় বাধা এবং বিপত্তি। বিবাদী যদি ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী হয়ে থাকে আর তার বিপরীতে ফরিয়াদি যদি হয় সাধারণ জনগোষ্ঠীর একজন, দুস্থ, অসহায় ও গরিব, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা দেখতে পাই উক্ত মজলুমের পক্ষে জুলুম-অত্যাচার ও অবিচারসমূহ নীরবে মুখ বুজে সয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। আদালতের দোরগোড়ায় পৌঁছতে হলে ভালো উকিল তার চড়া ফিস, কোর্টের সরকারি নির্ধারিত খরচ, মহুরি ও দালালদের খরচ ও এর পাশাপাশি তার নিজের যাতায়াত ব্যয়নির্বাহ করতে একজন মজলুমের শেষ সম্বলটুকুও বিক্রয় করতে হয়। এতকিছুর পরে কোনো মজলুমের পক্ষে আদালতের বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব যদি হয়ও, কিন্তু তাতে লাভ হয় না কারণ, আসামি মহল তাদের আর্থিক ও সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নামি-দামি উকিল নিয়োগ করে নানাবিধ সত্য-মিথ্যা কারণ উপস্থাপন করে সময় প্রার্থনার নামে বিচার প্রক্রিয়াকে প্রলম্বিত করে থাকে। এর অনিবার্য ফল এই দেখা দেয় যে প্রলম্বিত বিচার প্রক্রিয়ার দরুন ফরিয়াদির ওপর আর্থিক চাপ বেড়ে যায় যা প্রকারান্তরে মজলুমকে বিচার প্রার্থনা ও মামলা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে

www.pathagar.com

নিরুৎসাহিত করে তোলে। কারণ তার পক্ষে প্রতিদিন উকিলের মহুরির খরচ জোগানো, চাকরি-ব্যবসা বা গৃহস্থালি কাজ ফেলে আদালতে হাজিরা প্রদানসহ অন্য আনুষঙ্গিক খরচ জোগানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে কারণ, তার পক্ষে যেটুকু গেছে তা ফিরে পাবার চাইতে যেটুকু আছে সেটুকু কোনোমতে টিকিয়ে রাখাটাই তার নিজ অস্তিত্বের জন্য বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। এ ছাড়াও রয়েছে সমাজে প্রভাবশালীদের পক্ষ হতে চাপ হুমকি-ধমকি, ধনীদের পক্ষ হতে নানা রকম প্রলোভন-প্ররোচনা। এসব এত বেশি সাধারণ ঘটনা সচরাচর ঘটে চলেছে যে, আমাদের কাছে এর কোনোটিই অপ্রত্যাশিত বলে মনে হয় না। প্রতিদিন প্রতিনিয়তই আমাদের সমাজে এর উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।

প্রভাবশালী অহংকারী-ক্ষমতাদর্পী জালিম এর হাতে নির্যাতিত হয়ে দুস্থ, অসহায়, বৃদ্ধ ভূ-স্বামীর হাতে পড়শিরদ্বারা শেষ ভিটামাটিটুকু জাল দলিলের মাধ্যমে হারিয়ে অশীতিপর বৃদ্ধা, সন্ত্রাসী ডাকাত এর হাতে সহায় সম্বল হারিয়ে বিপন্ন পরিবার, ক্ষমতাসীনদের সোনার ছেলেদের হাতে সর্বস্ব হারিয়ে যুবতী, রাজনৈতিক ও আদর্শিক মতবিরোধের কারণে ক্ষমতাসীনদের হাতে যুবক সন্তান হারিয়ে বৃদ্ধা মা, স্বামী হারিয়ে বিধবা স্ত্রী, ভাই হারিয়ে কিশোরী বোন, বাবা হারিয়ে এতিম অবুঝ শিশু প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় অনাহারে, অর্ধাহারে, আশ্রয়হীন অবস্থায় ব্যথা-বেদনায় ক্ষুধা-পিপাসায়, ভয়ে আর শংকায় কাঁদছে। বিচার না পেয়ে, প্রতিকার না পেয়ে নীরবে নিভৃতে হাত তুলে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছে, স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাঁর নিজের ভাষায় সে চিত্র তুলে ধরেছেন কুরআনুল কারীমের পাতায়-

সাহায্যকারী রাষ্ট্রশক্তির কথা বলা হয়েছে আরবীতে, যাকে বলা হয়ে থাকে সেই সুলতান বা রাষ্ট্রশক্তিই হলো ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা যার মৌলিক দর্শন হলো ইসলাম। এই ইসলাম মানুষকে সকলপ্রকার অন্যায়-অত্যাচার জুলুম আর অজ্ঞানতার আঁধার হতে বের করে সততা, ইনসাফ, সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি-নিরাপত্তা ও জ্ঞান এর আলোতে নিয়ে আসে। মানুষের ভেতর-বাহির উভয় সত্তাকে উজ্জ্বল স্বর্গীয় আলোতে উদ্ভাসিত করে তোলে। মহান আল্লাহ নিজেই সে কথার ঘোষণা দিচ্ছেন তার ভাষায়–

يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ -

অর্থাৎ, তাই এই দর্শনের সূক্ষ্ম এই অনুভূতিটুকু উপলব্ধি করার কারণে ইসলামের অনুসারী বরং বলা উচিত নিষ্ঠাবান ও খাঁটি অনুসারীদের হাতে যখন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পায় তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইতোপূর্বে উল্লিখিত আয়াতে (সূরা নিসা-৭৫) চিহ্নিত সেসব অসহায় নির্যাতিত-নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের বুকফাটা আর্তনাদ ও কষ্টের প্রতিকারে তৎপর হয়

www.pathagar.com

ত্বরিতগতিতে। খোলফায়ে রাশেদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ হযরত ওমর বিন আঃ আজিজ এর শাসনামল এর সেই সোনালি দিনগুলোর কথা বাদ দিলেও পরবর্তীকালে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার চরম বিচ্যুতি ও অধঃপতনের যুগেও কোনো কোনো মুসলিম শাসকের শাসনামলে এ কথার সাক্ষ্যবাহী ঘটনার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের এই ভারতবর্ষে ইসলামী শাসন এর ক্ষয়িষ্ণুকাল এর শেষ উজ্জ্বল নক্ষত্র, ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী দরবেশ সম্রাট আওরঙ্গজেবকে আমরা উদাহরণ হিসেবে টেনে আনতে পারি। ইসলামী দর্শনে উজ্জীবিত এই মহাপুরুষ জিন্দাপীর আলমগীর কী দ্রুততার সাথে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠায় কর্মতৎপর ছিলেন, তারই প্রমাণ হিসেবে নিচের ঘটনাটি দেখুন।

একদিন সম্রাট আলমগীরের একদল সৈন্যবাহিনী একজন মুসলমান সেনাপতির অধীনে পাঞ্জাবের এক পল্লীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পথে জনৈক ব্রাহ্মণের এক অপরূপ সুন্দরী কন্যার প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় মুখশ্রী দেখে লোভাতুর সেনাপতি তার পিতার নিকট মেয়েটিকে বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং সিদ্ধান্ত জারি করেন যে আজ থেকে একমাস পরেই তিনি তার বাড়িতে বর বেশে উপস্থিত হবেন। কন্যার পিতা স্বয়ং আলমগীরের শরণাপণ্ন হলেন এবং তাকে সমস্ত ঘটনাটা বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সম্রাট তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন– "যাও, নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যাও নির্দিষ্ট দিনে আমি তোমার বাড়ি উপস্থিত থাকব।" ব্রাহ্মণ নানা চিন্তার ঝুঁকি নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। সত্যিই কী সম্রাট স্বয়ং আসবেন? না তাঁর পক্ষ হতে কোনো প্রতিনিধি পাঠাবেন? আর যদি সত্যিই তিনি আসেন তবে সঙ্গে নিশ্চয়ই লোক-লস্কর, হাতি-ঘোড়া কম আসবে না, তাদের থাকতে দেবে কোথায় ইত্যাদি অনেক চিন্তা।

অবশেষে সমস্ত চিন্তার অবসান ঘটিয়ে বিবাহের আগের দিন সম্রাট আলমগীর একাই এসে উপস্থিত হলেন ব্রাহ্মণের বাড়িতে। ব্রাহ্মণ হতবাক। সম্রাট ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক জীর্ণ কামরায় সারারাত ইবাদত-উপাসনা ও মোনাজাত-প্রার্থনা, অশ্রু-বিসর্জন করে কাটালেন। ব্রাহ্মণের পরিবারবর্গ অবাক। ইনি কাঁদছেন কেন? এর কিসের অভাব? প্রশ্নের উত্তর তারা পেলেন না আর সাহস করে জিজ্ঞেস করতেও পারলেন না। যাহোক, পরদিন মোঘল সেনাপতি বর বেশে ব্রাহ্মণের ঘরে উপস্থিত হলেন। বললেন, বিবাহের পূর্বে আপনার কন্যাকে একবার দেখা উত্তম। আপনার কন্যা কোথায়? ব্রাহ্মণ সম্রাটের শেখানো অনুযায়ী সম্রাটের কামরার দিকে ইশারা করলেন। সেনাপতি ঘরে প্রবেশ করেই দেখলেন উলঙ্গ তরবারি হাতে সম্রাট স্বয়ং, উদভ্রান্ত যৌবনের বুকভরা আবেগ আর মুখভরা হাসি নিমেষেই উবে গেল। যে সেনাপতির দাপটে শত্রু- সৈন্য থর থর করে কাঁপে, যার হৃদয়ে ভয়ভীতি আর দুর্বলতা স্থান পায় না, আজ সেই হৃদয় কালবৈশাখী ঝড়ের মত দুরু দুরু শব্দে যেন কেঁপে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করলেন কিন্তু দুঃখ, লজ্জা, শাস্তি আর অপমানের আশঙ্কায়

www.pathagar.com

জ্ঞানহারা হয়ে বলিষ্ঠদেহ সেনাপতি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কন্যার পিতা সম্রাট আলমগীরের সুবিচার, দায়িত্ববোধ আর অসাম্প্রদায়িক ভূমিকা দেখে আনন্দে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললেন, আপনি আমার, বিশেষ করে আমার কন্যার ইজ্জত রক্ষা করেছেন। আপনার এই ঋণ অপরিশোধ্য। সম্রাট ব্রাহ্মণকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে বললেন, ভাই এই মহান দায়িত্ব আমার, আমি যে আমার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছি এতেই আমি ধন্য।

সম্রাট আলমগীর আজ নেই সত্য, কিন্তু তাঁর মহিমান্বিত অমরকীর্তি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে রয়েছে ঐ গ্রামের অণু-পরমাণুতে। ঐ ঘটনার পরই ঐ পল্লীর নামকরণ হয় আলমগীর (চেপে রাখা ইতিহাস, লেখক গোলাম আহমদ মোর্তজা-১৩০-১৩১ পৃষ্ঠা)

উল্লিখিত ঘটনাটি একটি বাস্তবিকই চমকপ্রদ উদাহরণ, যা এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, ন্যায়-বিচার করাটা বিচারপ্রার্থীর ওপরে অনুগ্রহ করা নয় বরং যার নিকট বিচার প্রার্থনা করা হলো তাঁর এবং সর্বোপরি স্বয়ং রাষ্ট্রীয় কর্ণধার এর দায়িত্ব এটি তাকে যেকোনো মূল্যে পালন করতেই হবে। আইনকে খুঁজতে বিচার প্রার্থীকে আইনের দ্বারেদ্বারে ধন্না দিয়ে ফিরতে হয় না বরং আইন হাতে প্রশাসক বিচারক স্বয়ং বিচারপ্রার্থীর দ্বারে উপস্থিত হন, তার প্রতি কৃত জুলুম এর প্রতিকার বিধানে ও তার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে। একদল নিষ্ঠাবান প্রকৃত খাঁটি মুসলমানের হাতে যখনই শাসন ক্ষমতা আসে তখন সেখানে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা নয় বরং প্রকৃতরূপে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পায়।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার সাথে সাথে আইনকে কঠোর নিরপেক্ষতা ও সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করার মাধ্যমে জুলুম, অবিচার, অন্যায় করার সকলপ্রকার রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আওতায় সামাজিক অবকাঠামোকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়ে থাকে যে, সেখানে পাপের সকলপ্রকার উৎসকে সম্ভাব্য সকল পন্থায় নির্মূল বা অবদমিত করে রাখা হয়। অন্যায়-অবিচারসহ যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা জাগিয়ে তোলা হয় যথাযথ শিক্ষা ও সামাজিক সবরকম প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে। একজন ব্যক্তি ইচ্ছে করলেও জুলুম করতে পারে না। জুলুম করার জন্য মানসিক ইচ্ছার পাশাপাশি যে আনুষঙ্গিক উপকরণ এর প্রয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রে, তার অপ্রতুলতার কারণে। জুলুম করার কোনো সহজ ও অনুকূল পরিবেশ ইসলামী সমাজে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় থাকে না। এ রকম প্রতিকূল পরিবেশে সকলপ্রকার বিধি-নিষেধ ও বেড়াজাল ডিঙিয়ে নীতি-নৈতিকতার সীমানা মাড়িয়ে কোনো দুর্বৃত্ত যদি কারো প্রতি তিল পরিমাণ জুলুম করেও ফেলে তবে তার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয়ে প্রতিকার প্রার্থনার জন্য বিচারক বা আদালতের সংস্পর্শে আসার পথকে সকলপ্রকার বাধা-বিপত্তি ও

www.pathagar.com

প্রতিবন্ধকতা মুক্ত করে রাখা হয় রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক আয়োজনের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের যেকোনো প্রান্ত হতে যেকোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যেকোনো সময় তার বা তাদের প্রতি কৃত অপরাধ বা জুলুমের বিচার চেয়ে বিচারকের দরবারে যেন হাজির হতে পারে। হোক না তা স্বয়ং রাষ্ট্রীয় কর্ণধার আমীর বা তার দোসরদের কারো বিরুদ্ধে যাচিত বিচার। এ পথে না কোনো উকিল এর ফি, না কোনো কোর্ট ফি, আর্থিক অসচ্ছলতা, অসঙ্গতি, সামাজিক পশ্চাৎপদতা বা প্রভাবহীনতা বা অন্য কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এখানে মৌলিক যে প্রশ্ন তাহলো রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা। অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থা ফরিয়াদির অভিযোগ যাচাই করে দেখবে, বিবাদী ব্যক্তির বক্তব্য শুনবে, তথ্য প্রমাণ সাক্ষী ও বিচার-বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে রায় দিয়ে মজলুম ব্যক্তির প্রতি কৃত জুলুমের বিচার করে তার হক আদায় করে দেবে। এ কাজে প্রয়োজন হলে সে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী বা আমীর কিংবা রাষ্ট্রের যেকোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তিই হোক না কেন তাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্ণধার রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ কারো কারো বেলায় Immunity নামে একটি বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয়। যা হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য আদালতের বিচার ও আদালতের নিকট তার কৃতকর্ম হতে বাঁচার জন্য একটি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। এটি একটি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এর কোনো সুযোগ ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতাধীন বিচার ব্যবস্থায় কল্পনাও করা যায় না।

বিচারকের নিকট বিচার চাইবার সাথে সাথে রাষ্ট্র অনতিবিলম্বে তৎপর হবে এবং বিচারপ্রার্থী ফরিয়াদি ও বিবাদী উভয়কেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে আদালতে বিচারকের সম্মুখে হাজিরা দিতে বাধ্য করবে। এ পক্ষে বাদী-বিবাদীর আর্থ-সামাজিক পরিচিতি, ক্ষমতা-প্রভাব এসব কোনো কিছুই আদালত গ্রাহ্য করবে না। এখানে কারোর জন্যই কোনো ধরনের Immunity বা রক্ষাকবচ নেই আদালতে জবাবদিহি ও প্রাপ্যশাস্তি হতে আত্মরক্ষা করার মত।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার এ মৌলনীতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র, এর পরে খোলাফায়ে রাশেদার আমলে এমনকি এর পরে যখন ইসলামী শাসন তার যথাযথরূপে টিকতে না পেরে রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়ে পড়েছে সেই রাজতান্ত্রিক শাসনামলেও বিচারের ক্ষেত্রে বলা চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মৌলনীতিকে সমুন্নত রেখেছিল অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং সফলতার সাথে।

খোলাফায়ে রাশেদার চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.)-এর এরকম একটি ঘটনা ইবনে আসাকির তাহযীব তারিখ গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করেছেন মুহাম্মদ সালাহউদ্দীন তার রচিত ইসলামে মানবাধিকার নামক গ্রন্থটিতে এবং তা নিম্নরূপ: "হযরত আলী (রা.) বাজারে এক খ্রিষ্টানকে তাঁর বর্মখানি বিক্রি করতে দেখলে তিনি তাকে বললেন, এ বর্মটি আমার। খ্রিষ্টান অস্বীকার করলে তিনি

www.pathagar.com

কাজী শুরাইহ (রা.)-এর আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন। কাজী সাহেব হযরত আলী (রা.)-এর নিকট সাক্ষী তলব করেন। তিনি তা পেশ করতে অপারগ হন। কাজেই খ্রিষ্টান ব্যক্তির পক্ষেই মামলার রায় দেওয়া হলো। হযরত আলী (রা.) স্বয়ং এ রায় গ্রহণ করে বললেন, শুরাইহ! তুমি সঠিক রায় দিয়েছ। মামলার রায় শুনে খ্রিষ্টান ব্যক্তি হতবাক হয়ে গেল। বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল- এতো পয়গম্বর সুলভ ন্যায়-বিচার। আমীরুল মুমিনীনকেও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। তাঁকে নিজের বিপক্ষে রায় শুনতে হয়। প্রকৃতপক্ষে বর্মটি আমীরুল মুমিনীনেরই। এটা তাঁর উটের পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল, আমি তা উঠিয়ে নিয়েছিলাম। (মুহাম্মদ সালাহউদ্দীন ইসলামে মানবাধিকার, আধুনিক প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ২০৪)

অপরদিকে উমাইয়া রাজ বংশের শাসনামলের ঐ একই সূত্র হতে উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন, দেখুন– "এই কাজী মুহাম্মদ ইবনে ইমরানের আদালত থেকে খলীফা আবু জাফর আল মানসুরের নামে আরও একটি মামলার সমন জারি করা হয়েছিল। কতিপয় উট মালিক তাদের অধিকার প্রসঙ্গে মামলা দায়ের করেছিল। কাজী সাহেব সমনে উল্লেখ করেছিলেন যে, হয় এসব লোকের অধিকার তাদের ফিরিয়ে দিন নতুবা আদালতের সামনে হাজির হোন। মসজিদে নববী সংলগ্ন আদালতের উন্মুক্ত চত্বরে খলীফা হাজির হলেন। মামলার শুনানির পরে কাজী উট মালিকদের পক্ষে এবং খলীফার বিপক্ষে আদালতে রায় ঘোষণা করেন (সূত্র ঐ) এতো গেল সেই হাজার বছর পূর্বের ঘটনা। বস্তুত সময় ও কালের সাথে এ ধরনের সংশ্লিষ্টতা নেই বরং এর সংশ্লিষ্টতা হলো ব্যক্তির সাথে ব্যক্তি বা সমষ্টির বিশ্বাস এর সাথে। তাই আমরা দেখতে পাই ইসলামের কট্টর দুশমন, মোগল সম্রাট আকবর এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতিটি ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপ এর বিরুদ্ধে প্রাণপণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন মুজাদ্দেদ আলফেসানী হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ শিরহিন্দ (রহ.) সাহেব। আল্লাহর ওয়াস্তে পরিচালিত তাঁর জিহাদ আকবরের সকল বিরোধিতা সত্ত্বেও সাফল্য লাভ করে এবং আকবরের সেই কুখ্যাত দীন-ই-ইলাহী তার মৃত্যুর সাথে সাথেই সমাধিপ্রাপ্ত হয়। আকবর পুত্র জাহাঙ্গীরও পিতার ন্যায় দুঃশ্চরিত্র-মাতাল ও কট্টর ইসলামবিরোধী ছিলেন। সিংহাসনে বসামাত্রই তাঁর সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। ইসলামের খাঁটি মুজাহিদ মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রহ.)-এর সাথে। এক পর্যায়ে প্রবল পরাক্রান্ত ভারতেশ্বর সম্রাট জাহাঙ্গীর একজন ফকির-দরবেশ-মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর নিকট হার স্বীকার করলেন এবং নিষ্ঠাবান মুসলমানে পরিণত হলেন। সেই সাথে তিনি এ ওয়াদাও করলেন যে, তিনি ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন পূর্ণ ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী।

একজন পথচ্যুত নামধারী মুসলমান এবং সেই একই ব্যক্তি যখন পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানে এবং তাঁর হাতে থাকে ইসলামের

www.pathagar.com

শাসন ক্ষমতা বা বিচারক্ষমতা, এ রকম অবস্থায় বিচার ব্যবস্থা কতটা নিরপেক্ষ ইনসাফপূর্ণ মহিমান্বিত ও ন্যায়-বিচারে পরিণত হয় তা বোঝার জন্য সংক্ষেপে সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্র বর্ণনা করার পর আমরা এখন দেখব পরিবর্তিত একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে আদর্শ অনুসরণীয় অনুকরণযোগ্য একমাত্র নেতা মেনে নেয়া ইসলামের সত্যিকার অনুসারী সম্রাট জাহাঙ্গীরের জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে।

একদিন রূপ-লাবণ্যের জীবন্ত প্রতীক নূরজাহান আয়নার সামনে তাঁর রূপচর্চা করছিলেন। এমন সময় এক বিকৃত মস্তিষ্ক হিন্দু প্রজা কেমনভাবে একেবারে নূরজাহানের কক্ষে উপস্থিত হয়ে পড়েন। নূরজাহান সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুলি করলে হিন্দু প্রজা মারা যান। মৃতের আত্মীয় শিকল টানলেন এবং জাহাঙ্গীরের নিকট বিচারপ্রার্থী হলেন নূরজাহানের বিরুদ্ধে। জাহাঙ্গীর তাঁর প্রিয়তমা বিশ্বসুন্দরী নূরজাহানের বিচার করে রায় দিলেন– নূরজাহানের প্রাণদণ্ড। সকলেই অবাক হলেন; সেদিনের জাহাঙ্গীর আর আজকের জাহাঙ্গীরের মধ্যে অনেক দূরত্ব, অনেক ব্যবধান; আগে ছিলেন ধর্মমুক্ত রাজা আর এখন হচ্ছেন ধর্মযুক্ত বাদশাহ। সারা ভারতে যিনি সব থেকে বেশি অবাক হয়েছিলেন তিনি তার সহধর্মিনী, চিরসঙ্গিনী নূরজাহান। নূরজাহান কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, "হে স্বামী, পুরনো দিনের কোনো কথা কী আপনার মনে নেই! আমার প্রেম, ভালোবাসা, মায়া, সেবা সমস্ত কিছু একটু মনের তুলাদণ্ডে কী ওজন করলে হোত না?" জাহাঙ্গীর চোখভরা জল নিয়ে বললেন, "প্রিয়া নূরজাহান, আমি আমার মনের তুলাদণ্ডে তোমার সারা জীবনের সবকিছু এক পাল্লায় চাপিয়েছি, আর অন্য পাল্লায় চাপিয়েছি হযরত মুহাম্মদের (সা.) আইনকে; বার বারই আমার কাছে ভারি হয়েছে ইসলামের আইনের নির্দেশ। ইসলামের আইনে তুমি তাকে হত্যা করতে পারতে কারোর প্রাণনাশের বা ব্যভিচারের অপরাধে, কিন্তু সে দোষ তো তার ছিল না; সে ছিল বিকৃতমস্তিষ্ক। অতএব আবার বলছি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত–তোমার প্রাণদণ্ড।" বিচারপ্রার্থী স্বপ্ন দর্শনের মত নাটকীয় ইসলামী বিচার ব্যবস্থা দেখে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "হে বাদশাহ আমরা আর প্রাণদণ্ড দেখতে চাই না, নূরজাহানকে আমরা ক্ষমা করলাম। আমরা আজ বুঝলাম ইসলাম সত্যিই শান্তি ও সত্যের নিরপেক্ষ ধর্ম।" (দ্রষ্টব্য : চেপে রাখা ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৩৯, লেখক গোলাম আহমদ মোর্তজা বর্ধমান, ভারত)

উপরোল্লিখিত পর পর তিনটি ঘটনা তিনটি যুগ হতে চয়ন করা হয়েছে। এ দ্বারা আমরা এ কথাই প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি যে, ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় একজন বিচারকের নিকট বাদী-বিবাদী কারোরই শিক্ষা-দীক্ষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং পরিচিতি, প্রভাব ও ক্ষমতা কোনো কিছুই ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার পথে বিবেচ্য নয় এবং তা কখনোই এ পথে কোনক্রমেই অন্তরায় হিসেবে দাঁড় হতে পারে না। তার কোনো রকম দূরতম শংকা বা সম্ভাবনাও নেই।

www.pathagar.com

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র তার সকল প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা ব্যবহার করে বিচারপ্রার্থীকে সবরকম সাহায্য ও নিরাপত্তা প্রদান করতে বাধ্য। বিচারকর্ম সম্পাদনের পথে কোন রকম বাধা বিপত্তির যদি উদ্ভব হয়েও যায় তবে তা দূর করার মুখ্য দায়িত্ব হলো সরকার বা বিচার বিভাগের, বিচার প্রার্থীর নয়। রাষ্ট্র এবং তার আওতায় বিচার বিভাগ সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতার সাথে বিচারকার্য সমাধা করবে, কারণ বিলম্বিত বিচার না করারই নামান্তর মাত্র। ইংরেজি প্রবাদে সে কথাটিই এভাবে বলা হয়েছে–"Justice elayed justice denied।" ফরিয়াদি যদি আদালতের আনুষঙ্গিক ফি উকিল খরচ নির্বাহ করতে না পারে তবে রাষ্ট্র তা বহন করবে অথবা প্রশাসন মনে করলে পুরো বিচার ব্যবস্থাকেই যেকোনো ধরনের ফিস মুক্ত করে রাখবে, এ ইখতিয়ার রাষ্ট্রের আছে।

প্রচলিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আমরা দেখেছি আমাদের দেশেই শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে দীর্ঘ ২১ বছর কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। দীর্ঘ ২১ বছর পর নির্দোষ-নিরপরাধ ঘোষণা দিয়ে তাকে আদালত হতে মুক্তি দেয়া হয়েছে, মুক্তি মিলেছে কারগার হতেও। এটি অমানবিক জঘন্য অন্যায় ও বিরাট এক জুলুম। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা এ ধরনের জুলুম ও অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি ঘটার সকল পথ রুদ্ধ করেছে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কায়েম করার মাধ্যমে। এখানে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কাউকে গ্রেফতার করা বা আটকে রাখার কোনো সুযোগ নেই। একজন ব্যক্তি যখন পর্যন্ত বাস্তবে কোনো অপরাধ বা দুষ্কর্ম সংঘটিত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে শুধু এই সন্দেহে তাকে অভিযুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই যে, সে হয়ত কোনো অপরাধ সংঘটিত করতে পারে। এ ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা.) নির্দেশ হলো–

'যতদূর সম্ভব মুসলমান (নাগরিক) কে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দাও, সুযোগ থাকলে তাকে ছেড়ে দাও। অপরাধীকে ভুলবশত ক্ষমা করে দেওয়া ভুলবশত শাস্তি দেওয়ার চেয়ে উত্তম।' (তিরমিযী)

শুধু অনুমান ও আশংকার ওপরে ভিত্তি করে বিচার করা তো দূরের কথা ইসলামে এ ধরনের অনুমান-ধারণা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাঁর কালামে মাজীদে এ ব্যাপারে মানুষকে সাবধান করে দিয়ে ইরশাদ করেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ـ (الحجرات ـ ١٢)

অর্থাৎ, মোমিনগণ "তোমরা বেশি বেশি অনুমান করা হতে বেঁচে থাক, কেননা কোনো কোনো অনুমান পাপ।" (হুজুরাত-১২)

www.pathagar.com

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন এই একই বিষয়ে–

অর্থাৎ, ধারণা-অনুমান প্রকৃত সত্যের বিপরীতে কোনো ফল-ই দিতে পারে না। (সূরা ইউনুস-৩৬) কাজেই এটা বোধগম্য যে শুধুমাত্র আন্দাজ-অনুমান, ধ্যান- ধারণার ওপর ভিত্তি করে বিচার সমাধা করা বা বিচারকার্য শুরু করা ন্যায়-বিচারের পরিপন্থী। এ কথাটা এখানে খুব ভালো করে বোধগম্য করে নেয়া উচিত যে, ইসলামে বিচার ব্যবস্থা মানুষকে ক্ষমা করা বা মুক্তি দেবার সুযোগ খোঁজে, প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাধী বিচার ব্যবস্থার ন্যায় শাস্তি দেবার সুযোগ খোঁজে না। এ কারণে সন্দেহাতীতভাবে অকাট্য দলিল, সাক্ষী ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরাধীর নিজ স্বীকৃতিদ্বারা অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলাম শাস্তি কার্যকর করে না।

কিন্তু অভিযোগ উত্থাপনের পর ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় অযথা কালক্ষেপণের সুযোগ নেই। বরং দ্রুত সে ক্ষেত্রে ন্যায়-বিচারের জন্য বিচারক তৎপর হন। দ্রুত ন্যায়-বিচারসম্পন্ন ও তার রায় কার্যকর করার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সম্মুখে এ উদাহরণই উপস্থাপন করতে চায় যে, অপরাধী যতই ক্ষমতাশালী ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিই হোক না কেন রাষ্ট্র তার জুলুমের প্রতিকার অবশ্যই করবে। রাষ্ট্র কখনোই কোনো জুলুম সহ্য বা কোনো জালিমের সাথে আপস করবে না বা তার প্রতি উদাসীন অথবা বিন্দু পরিমাণ শৈথিল্য ভাবও প্রদর্শন করবে না বরং এ ক্ষেত্রে সে হবে নির্মম, কঠোর ও নিরাপদ ভূমিকাপোষণকারী, কাজেই জুলুম করে কেউ নিস্তার পাবে না অপর দিকে সমাজে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, দুস্থ, গরিব ও অসহায় জনগোষ্ঠীর মনে এ আশ্বাসবাণীও বদ্ধমূল করে তুলতে চায় যে, তোমরা গরিব-দুস্থ-দুর্বল যাই হও না কেন অন্ততপক্ষে তোমরা অসহায় নও, ইসলামী রাষ্ট্র ও তার অধীনে সকল প্রশাসন যন্ত্র তোমাদের খেদমতে নিয়োজিত, স্বয়ং ইসলামী রাষ্ট্রশক্তি তোমার নিরাপত্তা ও অধিকার বজায় রাখতে বা আদায় করতে দিনরাত সার্বক্ষণিকভাবে তোমাদের পাশে রয়েছে।

আইন পেশা ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় একটি লাভজনক ব্যবসা নয়, যেমনটি প্রচলিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার আওতায় বিচার ও তদসংক্রান্ত কার্যক্রমে একটি ব্যবসা আইন ব্যবসা হিসেবে বিবেচিত ও স্বীকৃত। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারকার্যে সহযোগিতার জন্য নিয়োজিত আইনজীবী উকিলগণ তাদের পারিশ্রমিক নেবেন বটে তবে তা হবে বিচার কার্যে সহযোগিতা করার মাধ্যমে। সত্য উদ্ঘাটন, সত্য প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করাতে বিনিয়োগকৃত তাঁর সময়-মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার মত যেকোনো মূল্যে কথার ও যুক্তির মারপ্যাঁচে সত্যকে নির্জলা মিথ্যায় এবং একটি নির্জলা মিথ্যাকে জাজ্বল্যমান সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মত দারুণ সফলতার পুরস্কার বা

www.pathagar.com

পারিশ্রমিক হিসেবে নয়। ইসলামের যে বিচার ব্যবস্থা তার দর্শন ও যে পদ্ধতির ওপরে এর অবকাঠামো গড়ে ওঠে বা প্রতিষ্ঠা পায় তাতে সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য, প্রকৃত অপরাধীকে বেকসুর, নির্দোষ বা একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে জঘন্য অপরাধী জালিম বানিয়ে দেবার মত ডাকসাইটে আইনজ্ঞ উকিল হবার কোনো সুযোগ নেই। এখানে আইন পেশা একটি সম্মানিত ও পবিত্র পেশা যার কাজ হলো সত্য উদ ঘাটন ও প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা, এটি ন্যায়-বিচার ও সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার একটি মাধ্যম। এর পেছনে কাজ করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বন্দিগীর চেতনা। তাঁর ইবাদাতের ধারণা। কারণ ন্যায়-বিচার এবং ইনসাফপূর্ণ বিচার প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র বিবেকের দাবি-ই নয় বরং এটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার নির্দেশ। প্রত্যেকের জন্য সর্বকালের জন্য সকল স্থানের জন্য। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

অর্থাৎ, তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে তা করবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে। (নিসা-৫৮) এ নির্দেশটি মেনে চলা প্রতিটি মুসলমানের জন্য যেমনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে বাধ্যতামূলক তেমনি তা পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও একইভাবে বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রীয় কর্ণধার যিনি তাঁর বা তাদের এটি অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব যে, তিনি বা তাঁরা সামাজিক সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিটি পর্যায়ে এই ন্যায়-বিচার ও তার যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে প্রতিষ্ঠা করবেন-অক্ষুণ্ন রাখবেন এবং যেকোনো ধরনের বিচ্যুতি হতে তাকে রক্ষা করবেন। ইনসাফপূর্ণ ন্যায়-বিচার ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম একটি মৌলিক শর্ত।

ইসলামী শাসনে বিচারক-এর পদটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি পদ। এ পদটিতে তুলনামূলক দৃষ্টিতে সবচেয়ে সৎ, জ্ঞানী, আল্লাহভীরু, সূক্ষ্মদর্শী, প্রজ্ঞাবান, ইসলামী বিধি-বিধান, দর্শন ও শিক্ষা বিষয়ে পারদর্শী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ, দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয়। যিনি এক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা ব্যতিরেকে আর কারো পরওয়া করবেন না তাঁর বিচারকার্য সম্পাদনের বেলায়। ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁরা একই রকম গুণাবলির অধিকারী হয়ে থাকেন। কারো ভয়-ভীতি, লোভ-প্রলোভন, ব্যক্তিগত, পছন্দ-অপছন্দ, ক্ষোভ-ক্রোধ বা প্ররোচনায় যাঁরা ন্যায়-বিচার তথা ইনসাফ হতে বিচ্যুত হবেন না বরং এ ধরনের সকল কিছুর উর্ধ্বে উঠে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেই ভয় করে, প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে সত্য ও ন্যায়কেই তুলে ধরবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি দায়িত্বশীল বা রাষ্ট্রপ্রধান বা আমীর, তিনি তাঁর পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে যোগ্য ব্যক্তিকে এ পদে নিয়োগ দান করবেন। তবে তাঁর বা তাঁর প্রশাসনের কোনো প্রভাব থাকে না বিচারক বা বিচার বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের ওপর। বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপমুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে শাসক, আমীর, রাষ্ট্রপ্রধান, সাধারণ

www.pathagar.com

প্রজাসাধারণ সকলেই সমান। বিচার ব্যবস্থা হয় মজলুমের প্রতি সদয়, তার রক্ষক। আর অপর দিকে প্রকৃত অপরাধী, তা সে যেই হোক না কেন, তার বেলায় হয় ব্যতিক্রমহীনভাবে কঠোর, তার প্রাপ্ত শরীয়তের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে, কিন্তু তার মানবিক দিক, তার মানবিক অধিকারকে উপেক্ষা করে না কোনোক্রমেই।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামী দণ্ডবিধি

ইসলামী রাষ্ট্র তথা ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় যে বিচার ব্যবস্থা বা বিচার প্রক্রিয়াটির অনুসরণ করা হয় অর্থাৎ যে বিচার ব্যবস্থাটি কার্যকর করা হয় তা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে এবং তা এ নামেই বিশ্বে পরিচিতি পেয়ে এসেছে। যেহেতু বিশ্বে ইসলামী শরীয়তভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা ছাড়াও বিভিন্ন দর্শন ও মতবাদভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন বিচার ব্যবস্থা চালু রয়েছে এবং অতীতেও ছিল সে কারণে ইসলামী দর্শনভিত্তিক বিশেষ বিচার ব্যবস্থাটিকে উক্ত নামে অভিহিত করে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করাই যুক্তিযুক্ত। এ বিচার ব্যবস্থাটি অনন্য একটি বিচার ব্যবস্থা। আইন ও অপরাধ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী মনোভাব নিয়ে এ বিচার ব্যবস্থাটির প্রতিটি বিধি-বিধান, অপরাধের শাস্তি তা কার্যকর করার প্রক্রিয়া, শাস্তিসমূহের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াসহ ফলাফল বিচার করে দেখেন, তবে তাঁরা এটিকে প্রকৃত অর্থেই পূর্ণাঙ্গ ও তুলনাহীন বলে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবেন। অনেকে এমন ধারণা ও বিশ্বাস প্রকাশ করে থাকেন (এমনকি অনেক মুসলমান ব্যক্তিবর্গও রয়েছেন এদের মধ্যে) যে, ইসলামী বিচার ব্যবস্থাটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিরূপ লাভ করেছে সপ্তম শতাব্দীর শেষে ও অষ্টম শতাব্দীর পুরো সময়কাল ধরে মূলত মুসলিম ফকীহগণের হাতে তাদের জ্ঞান-গবেষণা ও ইজমা-কিয়াস এর ওপর ভিত্তি করে। আসলে এমনটি বলা প্রকৃত সত্যের পুরোপুরি খিলাফ ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামী শরীয়তভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত। ইসলামী আইনে ফৌজদারি দণ্ডবিধিগুলো সরাসরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কুরআনুল কারীমে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন এবং তাঁর প্রিয় রাসূল (সা.) মারফত তা বাস্তবায়নও করেছেন বা করিয়েছেন। কুরআনুল কারীম হতে উদ্ধৃত এ সংক্রান্ত দু একটি নমুনা দেখুন–

অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হলে হত্যাকারীর জন্য কী শাস্তি হবে সে ব্যাপারে বলা হয়েছে–

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ

www.pathagar.com

شَيْئٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ (البقره ـ ١٧٨)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ। তোমাদের জন্য নর-হত্যার ব্যাপারে কিসাস এর আইন লিখে দেয়া হয়েছে। মুক্ত-স্বাধীন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করেই কিসাস নেয়া হবে, ক্রীতদাস হত্যাকারী হলে এই হত্যার বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে। কোনো নারী এই অপরাধ করলে তাকে হত্যা করে কিসাস নেয়া হবে, অবশ্য কোনো হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছু নরম ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয় তবে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতি বিধান হওয়া আবশ্যক এবং নিষ্ঠা ও সততার সাথে রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য। এটা তোমাদের রব এর পক্ষ হতে দণ্ডহ্রাস ও অনুগ্রহমাত্র। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য রয়েছে ভয়ানক পীড়াদায়ক শাস্তি। (বাকারা-১৭৮)

অন্যত্র তিনি বলেন–

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ط فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ (المائده ـ ٤٥)

অর্থাৎ, ' আমি এ গ্রন্থে তাদের জন্য লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম, অতঃপর যে ক্ষমা করে সে গুনাহ হতে পাক হয়ে যায়। আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী যারা বিচার করে না তারাই জালিম।' (সূরা মায়িদা-৪৫)

এই কিসাস যে সমগ্রভাবে মানব সমাজের প্রতিটি সদস্য-সদস্যার জীবন ও সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চিত গ্যারান্টি রয়েছে সে কথা আল্লাহপাক স্মরণ করে দিয়েছেন এভাবে–

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ (البقره ـ ١٧٩)

অর্থাৎ, হে বুদ্ধিমানগণ, তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে কিসাস এর মধ্যে, যেন তোমরা সাবধান হতে পারো। (সূরা বাকারা-১৭৯)

www.pathagar.com

কিসাস এর সংজ্ঞা হলো "অন্যায়ভাবে অপরের প্রতি যতটা জুলুম করা হয়েছে শরয়ী আদালতে বিচারের মাধ্যমে ঠিক ততটা (জখম/ ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী) প্রতিশোধ গ্রহণ করা"।

অপরের ধন-সম্পদ চুরি করলে চোরের শাস্তি কী হবে সে ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফৌজদারি দণ্ড দিচ্ছেন এ ভাষায় এভাবে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ (المائده ـ ٣٨)

অর্থাৎ, চোর স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক উভয়েরই হাত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মফল ও আল্লাহর নিকট হতে শিক্ষামূলক শাস্তিবিশেষ। তিনি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান (মায়িদা-৩৮)।" কারো প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ করা হলে অপবাদ আরোপকারীর শাস্তিও কুরআনুল কারীমে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ (النور-٤)

অর্থাৎ, আর যারা সতী-সাধ্বী স্ত্রী লোকগণের ওপরে মিথ্যা দোষারোপ করবে তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হবে, তাদেরকে আশিটি কোড়া মারো। আর তাদের সাক্ষ্য কখনও কবুল করো না, আর তারা ফাসিক। (সূরা নূর-৪)

বলাবাহুল্য অভিযোগ উত্থাপনকারী পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন তার জন্যই এ শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নির্দেশনা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সাথে যারা যুদ্ধ করবে এর ভেতরে সন্ত্রাস-রাহাজানি, হাঙ্গামা-ফেসাদ সৃষ্টি করে যারা রাষ্ট্রের ভিতকে নাড়িয়ে দিতে চায় বা আদর্শবাদী এ রাষ্ট্রটিকে তার আদর্শ হতে সমতলে বিচ্যুত করার কাজে তৎপর তাদেরকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতায় শাস্তির মুখোমুখি করা হয়েছে। আল্লাহর ভাষায়–

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ (المائدة ـ ٣٣)

www.pathagar.com

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং জমিনে সন্ত্রাস বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে। অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে, অথবা দেশ হতে তাদের বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য এর চেয়েও কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে"। (সূরা মায়িদা-৩৩)

ইসলামী দণ্ডবিধির মৌলিক তিনটি ভাগ রয়েছে–অর্থাৎ ইসলামী দণ্ডবিধিকে মোট তিনটিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সংক্ষেপে এই তিনটি বিভক্তি তার মৌলিক কারণসহ নিম্নরূপ–

এক. হদ (বহুবচন হুদুদ) যেসব অপরাধের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হক বা অধিকার বিনষ্টের প্রাবাল্য বিদ্যমান থাকে সেসব অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তিকে হদ বলা হয় বহুবচনে হুদুদ।

দুই. কিসাস যেসব অপরাধের কারণে মানুষের হক বা অধিকার বিনষ্টের প্রাবাল্য বিদ্যমান এমনসব অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তির বিধানকে কিসাস বলে।

তিন. তা'যীর যেসব অপরাধের শাস্তি আল্লাহপাক নির্ধারণ না করে আল্লাহর রাসূল (সা.) ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকবর্গ ও ইসলামী আদালতের বিচারকের ইখতিয়ারে ছেড়ে দিয়েছেন এমনসব দণ্ডকে ইসলামী পরিভাষায় তা'যীর বলে।

প্রথম প্রকার দণ্ডবিধি হদ বা হুদুদ ইসলামে মাত্র পাঁচটি এর মধ্যে চারটি স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের আয়াত নাযিল করে ও তাঁর প্রিয় মোস্তফা (সা.)কে অহী দ্বারা অবগত করে কার্যকর করেছেন। এ চারটি হলো- ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, ফেসাদ, চুরি, সম্পদ আত্মসাৎ, জিনা-ব্যভিচার।

ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ এবং পঞ্চমটি যা সম্মানিত সাহাবীগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্থির হয়েছে তা হলো মদ্যপানের শাস্তি। এসব শাস্তি হদ এর কিয়দংশ মাফ করা বা লাঘব করা বা রহিত করার কোনো রকম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষমতা না বিচারকের রয়েছে আর না রয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের। শাসকবর্গের এমনকি সমগ্র দেশের সম্মিলিত নাগরিকবৃন্দের বা সংসদ সদস্যদের বা মজলিসে শুরার সদস্যদের সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের বলে তথা কোনোক্রমেই কারোরই ক্ষমতা নেই এসব হদ বা শাস্তির বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটানোর অপরাধী আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যদি অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনাও করে তথাপি বিচারকের বা রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণের ক্ষমতা ইখতিয়ার নেই তাকে ক্ষমা করে। এ পাঁচটি হলো কঠোর শাস্তি। তাই এখানে এ বিধান রাখা হয়েছে যে অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে। অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহও যদি রয়ে যায় তবে আসামির ওপরে হদ নয় বরং সেক্ষেত্রে তা'যীর এর শাস্তি প্রয়োগ হবে অর্থাৎ হদ এর মত কঠোর শাস্তির পরিবর্তে

www.pathagar.com

অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর বিচারক তার বিবেচনা ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রচলিত দণ্ডবিধি অনুযায়ী যেকোনো শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন কিন্তু তাকে শাস্তি হতে পূর্ণমাত্রায় মুক্তি দেয়া হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার দণ্ডবিধি কিসাস কেউ কোনো মানুষের ক্ষতিসাধন করলে (যেমন হত্যা-জখম-আঘাত ইত্যাদি) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার প্রতি কৃত জুলুমের ঠিক সম পরিমাণ বদলা নিতে পারবে। এ বদলা নেয়ার ব্যবস্থাটি হতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রণাধীন বিচার ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনায় এবং অভিযোগ প্রমাণিত হবার পরই আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার বাইরে যত্রতত্র নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায়-উদ্যোগে এ ধরনের বিচার সম্পাদনের ও প্রতিশোধ গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। এ ধরনের যেকোনো প্রচেষ্টা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিরই নামান্তর এবং তা অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা নিহত ব্যক্তির বৈধ ওয়ারিশগণ ইচ্ছে করলে প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টি স্বেচ্ছায় ক্ষমা করে দিতে পারবে বা রক্তপণও নিতে পারবে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়টি হলো হত্যা বা খুনের কারণে দণ্ডিত ব্যক্তি তার অপরাধের কারণে মৃত্যুদণ্ড পেতে বাধ্য। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় তাকে এই মৃত্যুদণ্ড হতে ক্ষমা করার মালিক হলো রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী যিনি সাংবিধানিকভাবে প্রধান। কিন্তু ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় এ অধিকারটুকু অর্পণ করা হয়েছে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের হাতে। একমাত্র বৈধ ওয়ারিশগণই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়ে তার জীবন বাঁচাতে পারে।

উল্লিখিত মাত্র কয়েকটি বিশেষ ও বড় অপরাধ ছাড়া ইসলামী শরীয়ত অবশিষ্ট যেকোনো অপরাধের শাস্তি ও দণ্ড নির্ধারণের ক্ষমতা ইসলামী সরকার ও ইসলামী আদালত এর বিচারকের ইখতিয়ারে ছেড়ে দিয়েছে। দেশ-সমাজ পরিবেশ পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার সংসদে বা মজলিসে শুরায় এসব দণ্ড নির্ধারণ করতে পারবেন এটিই হলো তা'যীর। ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত উক্ত তা'যীর এর আওতায় বর্ণিত দণ্ড মানতে ও সে অনুযায়ী বিচারকার্য সমাধা করতে বাধ্য। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রে এ সকল দণ্ডবিধি অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করেছেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁরই হাতে প্রশিক্ষিত চারজন সম্মানিত খোলাফায়ে রাশেদা ও তারও পরে বেশ কয়টি যুগে এসব বিধি-বিধান এবং দণ্ডবিধি কার্যকর ছিল। এমনকি ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পতন ও চরমতম বিপর্যয়ের সময়েও বিশ্বের কোথাও কোথাও এসব দণ্ডবিধি চালু ছিল : এমনকি আজও বিশ্বের দু একটি দেশে তা কার্যকর রয়েছে। এখানে এ কথা বলার কোনোই অবকাশ নেই যে, অষ্টম শতকে এসে ফকীহগণ তাঁদের নিজ নিজ জ্ঞান-গবেষণা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইসলামী দণ্ডবিধি ও সেই সাথে ইসলামী বিচার ব্যবস্থাকে দাঁড় করিয়েছেন। বরং প্রকৃত বাস্তবতা এই যে, মুসলিম বিশ্বের এসব সম্মানিত ফকীহ ও ইমামগণ যা-ই করেছেন তা করেছেন একটি অতি দীর্ঘ

www.pathagar.com

ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি বা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে। আর এ দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বা কর্মসূচিটির সূত্রপাত হয়েছিল স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের (সা.) হাতে তাঁর জীবদ্দশাতেই এবং তাঁর সম্মানিত সাহাবীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের দ্বারা। এ কর্মসূচিটির খুঁটি-নাটি সবটুকুই সম্পাদিত হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নাযিলকৃত আল-কুরআন ও তাঁর প্রিয় রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহকে ভিত্তি করে। এ দুটোকে পাশ কাটিয়ে নয়। এ কার্যক্রমটি ছিল কুরআনে বর্ণিত দণ্ডবিধি ও মৌলিক নীতি-নির্দেশনার আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিচার ব্যবস্থার কাঠামো প্রণয়ন। এ কাঠামো প্রণয়নে কুরআন-সুন্নাতে রাসূল (সা.) এবং তার সম্মানিত সাহাবীদের বিশ্লেষণ ও ঐকমত্যভিত্তিক সিদ্ধান্তসমূহও কার্যকর ছিল এবং এ ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমোদন ছিল। এ অনুমোদনের প্রমাণ আমরা পাই নিম্নোক্ত হাদীস হতে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুমোদন এবং সেই সাথে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের কারণে অচিরেই সামাজিক ও ফৌজদারি আইন-কানুন (অবশ্যই কুরআন ও হাদীসের মৌলিক শিক্ষাকে ভিত্তি করে) প্রণয়নের কাজ শুরু হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মোট সাতাশ (২৭)জন সম্মানিত সাহাবী বিভিন্ন সময়ে তাঁদের জীবদ্দশায় এ ব্যাপারে কঠোর ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা এ দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আঞ্জাম দেন। তাঁরাই মূলত এ কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান শুরু করেন এবং তা সমাপ্ত হয়, অষ্টমশতাব্দীতে এসে ফকীহ ও ইমামগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও জ্ঞান-গবেষণা দ্বারা। (তবে এর দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়নি, প্রয়োজনের নিরিখে এখনও চলতে পারে) সম্মানিত সেই সাহাবীদের নামের তালিকার প্রতি একবার আসুন নজর বুলিয়ে নেই। এরা হলেন– (১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), (২) হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.), (৩) হযরত ওসমান বিন আফফান (রা.), (৪) হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রা.), (৫) হযরত আয়েশা (রা.), (৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), (৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), (৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), (৯) হযরত উম্মে সালামাহ (রা.), (১০) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) (১১) হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.), (১২) হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.), (১৩) হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.), (১৪) হযরত আবু হুরায়রা (রা.), (১৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.), (১৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.), (১৭) হযরত সালমান ফারসী (রা.), (১৮) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.), (১৯) হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.), (২০) হযরত তালহা (রা.), (২১) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.), (২২) হযরত ওবাদা ইবনে সাবিত (রা.), (২৩) হযরত জুবায়ের (রা.), (২৪) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.), (২৫) হযরত আবু বাকরাহ (রা.), (২৬) হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) এবং (২৭) হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রা.)। এসব সম্মানিত সাহাবীবৃন্দ তাঁদের জীবদ্দশায় বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে বিচারকার্য সমাধা ও একটি পূর্ণাঙ্গ বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো তৈরি করেছেন অথবা তা তৈরি হবার প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর

www.pathagar.com

নাযিলকৃত আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ তাঁর শিক্ষা তাঁর অনুমোদন ও কর্মকাণ্ড কর্মনীতির ওপর ভিত্তি করে। এদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.)-এর ভূমিকা ও কর্মতৎপরতা সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। তাঁর খেলাফতকালে হযরত শুরাইহ (রা.)কে কাজী বা বিচারক হিসেবে নিয়োগ দানের পর তাঁর উদ্দেশে তিনি অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.) যে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন তা ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে একটি অদ্বিতীয় ও নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে আজও স্বীকৃত হয়ে আসছে। তাঁর দেয়া নির্দেশটির প্রতি লক্ষ্য করুন। এর মূল বক্তব্য ছিল নয়টি – নয় দফা।

(এক) বিচারপ্রার্থীর প্রতি ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করা যুগপৎভাবে একটি শরয়ী দায়িত্ব এবং (শাসক) বিচারক এর জন্য একটি অপরিহার্য কর্তব্য।

(দুই) আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান।

(তিন) অভিযোগের সপক্ষে তথ্য প্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব বিচার প্রার্থীর।

(চার) সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য যেকোনো পক্ষের সঙ্গত কারণে সময় প্রার্থনা গ্রহণযোগ্য। প্রমাণাদী উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে অভিযোগ মিথ্যা বলে বিবেচিত হবে।

(পাঁচ) ঘোষিত কোনো রায় তথ্য-প্রমাণ দ্বারা ভুল প্রমাণ হলে উক্ত রায় বাতিলযোগ্য।

(ছয়) প্রতিটি মুসলমানের সাক্ষ্য বৈধ, একমাত্র তারা ছাড়া যারা কোন অপরাধের কারণে আদালতে দণ্ডিত হয়েছে অথবা যাদের ওপরে শরীয়ত এর হদ জারি করা হয়েছে।

(সাত) মনের নিয়ত বা ইচ্ছার কারণে কাউকে অভিযুক্ত দণ্ডিত করা যাবে না। শুধুমাত্র ব্যক্তির কর্মকাণ্ডকে বিচারের জন্য আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে।

(আট) কোনো বিচার্য বিষয়ে আল্লাহর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহকে নীরব পেলে ইসলামের ইতিহাস হতে অনুরূপ সমস্যার ঘটনা খুঁজে বের করো এবং উক্ত সমস্যা সমাধানে পূর্ববর্তী শাসক বিচারকগণ কী পন্থা অনুসরণ করেছেন তার আলোকে করণীয় ঠিক করো অথবা সে আলোকে আইনী ফায়সালা বের করো।

(নয়) সামষ্টিকভাবে মুসলমান সম্প্রদায় যে বিষয়টি কল্যাণকর ভেবেছে ও যে বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে তার ওপরে আল্লাহরও সম্মতি রয়েছে জানবে।

(বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন –The cultural atlas of Islam, Faruqi-Faruqi, Macmillan Publishing Company. Newyork-1980, Page-275)

উল্লিখিত নয়টি নীতির প্রতিটিকে সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে বিচার করলে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এসব বিধানগুলোর পূর্ণাঙ্গ ও সফল বাস্তবায়নের অনিবার্য ফল হলো ন্যায় ও নিরপেক্ষ এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মানের ত্রুটিমুক্ত বিচার।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থনৈতিক বিধান ও সম্পদের সুষমবণ্টন

ইসলামী সমাজে অনুসৃত অর্থ ব্যবস্থার একটি মৌলিক নীতি হল এই যে, অর্থ-সম্পদ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত হতে পারবে না। সম্পদ-অর্থ ও বিত্তের সহজাত ও সাবলীল আবর্তন চলবে সমাজের প্রতিটি সদস্যদের মধ্যে। ইসলাম অর্থনীতির যে বিধি-বিধান দিয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেসব একটি বিধি-বিধানের পেছনে এই উদ্দেশ্যটিই কাজ করছে। আল-কুরআন কারীমে আমরা এ সত্যের ইঙ্গিত পাই। যেমন দেখুন–

কুরআনের ঘোষণা–যেন তোমাদের ধনীদের মধ্যেই ধন-সম্পদ আবর্তিত না হয়। যোগ্যতাই অর্থ-সম্পদ হস্তান্তর করার বা সম্পদপ্রাপ্তির একমাত্র মাপকাঠি নয়, তাই যদি হতো তাহলে এ বিশ্বে কোটি কোটি লোক এমন আছে যাদের এমন কোনো যোগ্যতা নেই যে তারা বড় বড় পুঁজিপতিদের সাথে পাল্লা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে টিকে থাকবে বা আধুনিক যন্ত্রপাতি, তথ্য-প্রযুক্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংবলিত কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তির সাথে পাল্লা দিয়ে চাষাবাদ করবে, জমি ফসলের মালিক হবে, ধন-সম্পদ আহরণ করবে, ফলে এরা রয়ে যাবে এতটাই সম্পদহীন যে তারা নিজেদের দৈনন্দিন ও মৌলিক চাহিদাটুকু পূরণ করার মত ক্ষমতাও অর্জন করবে না। বিশ্বের উন্নত-অনুন্নত সব দেশেই তথা সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বিশেষ করে দুএকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সমগ্র এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং প্রাক্তন সোভিয়েত বলয়ভুক্ত দেশসমূহের প্রায় কোটি কোটি বনি আদম আজ একেবারে কপর্দকহীন ও নিঃস্ব। সম্পদের অসম বণ্টন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে এ বিশ্বের যাবতীয় সম্পদের ৮০ ভাগ মাত্র ২০০জনের দখলে রয়েছে আর মাত্র ২০ভাগ সম্পদ রয়েছে বাকি ৬০০ কোটি লোকের জন্য।

যদি এ বিশ্বজুড়ে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু থাকত তাহলে মানবতার এ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতো না কারণ, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সম্পদের পুঞ্জীভূত হবার মত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেয় না। ইসলামী শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই শাসনের আওতায় ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে জনগণ আগে সম্পদশালী হয়, এর পর হয় শাসকবর্গ। তবে শাসকবর্গের সম্পদশালী হবার সুযোগ একেবারেই সীমিত, নেই বললেই চলে। শাসন ক্ষমতার গুরুদায়িত্ব পাবার কারণে এ দায়িত্বে তার সময়, মেধা, শ্রম নিয়োজিত করার ফলে শাসকবর্গের (প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ইত্যাদি) পক্ষে তাদের

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত আয়, সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় সময় ও শ্রম দেবার সুযোগ নেই। বায়তুল মাল হতে তিনি ততটুকুই নেবেন একজন সাধারণ নাগরিকের প্রয়োজন মেটাতে যতটুকু অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

অপরদিকে জনগণের অবস্থা এর বিপরীত। তারা নিশ্চিন্ত মনে আয় রোজগারের পথে তাদের শ্রম-মেধা ও সময়কে কাজে লাগাতে পারে, ফলে তারাই সম্পদশালী হয় আগে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত অনৈসলামিক অর্থ -ব্যবস্থায় আমরা এর বিপরীত চিত্র দেখতে পাচ্ছি। গুটি কতক লোকের হাতে সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠেছে আর কোটি কোটি আদমসন্তান অভুক্ত অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে। ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থা চালু থাকলে এ রকম করুণ চিত্রের উপস্থিতি কল্পনাও করা যেত না। আমাদের এ মন্তব্যের বিপরীতে স্বভাবতই এ প্রশ্নটি উঠতে পারে যে, ইসলামী দর্শন কীভাবে মানুষের ভেতরে সম্পদের সুষমবণ্টন নিশ্চিত করে থাকে? এ প্রশ্নের জবাবই আমরা এখানে সংক্ষেপে উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। তবে আমরা এখানে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তার প্রায়োগিক ক্ষেত্র ও বিধান নিয়ে আলোচনা করব না।

ইসলাম তার শিক্ষা আদর্শ ও বিধানের মাধ্যমে এ বৈপ্লবিক কর্মটি সম্পাদন করে অতি সহজে বলপ্রয়োগ ও ভয়ভীতি বা জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে নয়। ইসলামী অনুশাসন ও দর্শন মোট চারটি পদ্ধতিতে অর্থ-সম্পদের সুষম আবর্তন নিশ্চিত করে এবং সম্পদের পুঞ্জীভূত অবস্থা সৃষ্টির সকল পথকে রুদ্ধ করে রাখে। এ চারটি পদ্ধতি হল –

এক : উপার্জনের প্রচেষ্টা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক।

দুই : বাধ্যতামূলকভাবে অনুসৃতব্য বিধান প্রণয়ন।

তিন : স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অনুসৃতব্য বিধান প্রণয়ন।

চার : স্পষ্টভাবে অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ।

www.pathagar.com

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ উপার্জনের চেষ্টা বাধ্যতামূলক

এ পর্যায়ে ইসলামের শিক্ষা হলো প্রতিটি সবল-সক্ষম পুরুষ-নারী নির্বিশেষে অলস জীবনযাপন না করে বরং নিজ জীবিকা নির্বাহের জন্য তার সকল শ্রম-মেধা নিয়োগ করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে স্পষ্টভাষায় মানুষকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন–

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ ـ الخ

অর্থাৎ, "নামায শেষ হলে তোমরা ছড়িয়ে পড়ো পৃথিবীতে এবং আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহ (রিজিক) অন্বেষণ করো" (আয়াতাংশ, সূরা জুমা) এ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহপাকই মুসলমানদের ফরয ইবাদত (নামায) সমাপনশেষে অলস পরমুখাপেক্ষী হয়ে বসে না থেকে বরং আয়-রোজগারের জন্য মসজিদের বাইরে সমাজে রিজিক অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়ার কথা বলেছেন। বলেছেন সে যেন তার সময়, সুযোগ, মেধা-যোগ্যতা ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে ধন-সম্পদ তথা তার জীবিকা উপার্জনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হতে। সে তার সকল প্রচেষ্টা দ্বারা যে সম্পদটুকু, যে রিজিকটুকু পায় তা হলো তার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার পক্ষ হতে অনুগ্রহ। একে যেন সে অবহেলা না করে। সে এ অনুগ্রহ পাবার ব্যাপারে যতটুকু চেষ্টা-প্রচেষ্টা করবে ততটুকুই অর্থাৎ তার চেষ্টা সাধনার অনুপাতে তার ফলাফল (অর্থ-সম্পদ, রিজিক) সে পাবে। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহপাক নিজেই তাঁর কালামুল মজিদে ইরশাদ করেছেন–

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى ـ (النجم ـ ٣٩)

অর্থাৎ, মানুষ সেটুকুই পায় যার জন্য সে চেষ্টা-সাধনা করে (সূরা নজম-৩৯) নিজ হাতে উপার্জন করার জন্য চেষ্টা সাধনার জন্য, নিজের প্রয়োজন পূরণের মত যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আহরণ করার জন্য আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজেই উদাহরণ রেখে গেছেন। তিনি তাঁর জীবনে ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। অপরের ব্যবসায়িক কর্মচারী হিসেবে মজুরির ভিত্তিতে কাজ করেছেন। এমনকি পারিশ্রমিক হিসেবে খেজুরের বিনিময়ে তিনি ইহুদির পানি উত্তোলন করে দিয়েছেন। তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণ প্রায় প্রত্যেকেই ব্যবসা বা মজুরি কোনো না কোনো বৈধ পেশা অবলম্বনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। ভারতীয় ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম শাসক সম্রাট আওরঙ্গজেব বিশাল ভারতের সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে টুপি সেলাই করে নিজ উপার্জন লব্ধ আয় দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সম্রাট নাসিরউদ্দীন নিজ হাতে টুপি সেলাই ও কুরআন

www.pathagar.com

নকল করে তার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দিয়ে অন্নসংস্থান করেছেন অথচ তিনি বিশাল ও ঐশ্বর্যশালী ভারত সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক ছিলেন। ইসলামী ইতিহাসে বিখ্যাত চার ইমাম, ফকীহবৃন্দ অলস জীবনযাপন না করে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করেছেন নিজ নিজ ব্যবসালব্ধ আয় উপার্জন হতে। নিজের ও নিজেদের পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহ করেছেন। বিখ্যাত দার্শনিক ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি চমৎকার হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত কিমিয়ায়ে সায়াদাত গ্রন্থে দেখুন। "যে ব্যক্তি নিজেকে পরমুখাপেক্ষী না করার উদ্দেশ্যে কিংবা প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য ও উপকার করার মানসে হালাল জীবিকা অর্জন করে, কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার দীপ্তিমান চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হবে।" (কিমিয়ায়ে সায়াদাত দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭)

হালাল উপার্জন, নিজের ও পরিবার-পরিজন এমনকি গরিব আত্মীয়-স্বজনের জন্য কেউ যদি ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত-খামার বা অন্যবিধ হালাল বৈধ উপার্জনে নিয়োজিত থাকে তবে সে মূলত আল্লাহর দেখানো পথেই রয়েছে। এ ব্যাপারেই স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন আল্লাহর রাসূল তাঁর নিম্নোক্ত হাদীসে-

একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীদের সমভিব্যহারে মদীনার মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় দেখলেন, অতি প্রত্যুষে মসজিদের সামনে দিয়ে একটি বলিষ্ঠ যুবক একটি দোকানের দিকে চলে গেল। সাহাবীবৃন্দ বললেন, হায় আফসোস! কতই না উত্তম হতো, যদি এই যুবকটি এমন ভোর সময়ে উঠে আল্লাহর পথে ধাবিত হতো। এটা শ্রবণ করে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরূপ বল না। যদি এই ব্যক্তি নিজকে, নিজের পিতা-মাতাকে এবং পরিবারস্থ স্ত্রী-পুত্রদের পরমুখাপেক্ষী না করার উদ্দেশ্যে গমন করে থাকে, তাতেও সে আল্লাহ তা'আলারই পথের মধ্যে রয়েছে। আর যদি সে ধন, ফখর ও বাহাদুরি দেখাবার উদ্দেশ্যে উপার্জন করতে গিয়ে থাকে, তবে সে শয়তানের পথে গমন করেছে। (দ্রঃ কিমিয়ায়ে সায়াদাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬, ইমাম গাজ্জালী (রহ.)।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বাধ্যতামূলক অনুসৃতব্য বিধান

ব্যক্তি-সমষ্টি ও রাষ্ট্রের জন্য ইসলাম কিছু বিধি-বিধান বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। সেসব বিধি-বিধানের মূল উদ্দেশ্য হলো সম্পদের পুঞ্জীভূত অবস্থা সৃষ্টি রোধ করা, এর সহজ-সরল ও সাবলীল আবর্তন নিশ্চিত করা এবং সুষম বন্টনের পাশাপাশি সমাজে বা রাষ্ট্রে অপচয় রোধ করা। এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই দু ধরনের বিধান প্রথম ধরনের বিধানে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত বা শর্তহীন অবস্থায় সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে আর অপর দিকে সম্পদের মালিকদের যথেচ্ছভাবে সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। এ বিধি-নিষেধ ব্যক্তি-গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র প্রত্যেকের জন্যই প্রযোজ্য। ব্যক্তি স্বাধীনতার নাম বা সম্পদের একচ্ছত্র মালিকানার দাবিতেও এসব নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করার সুযোগ নেই। আমরা প্রথমেই উদাহরণস্বরূপ দু একটি নিষেধাজ্ঞা আলোচনা করে দেখব।

কৃপণতা : ইসলামী সমাজে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সকলের জন্যই এটি একটি নিষিদ্ধ বিষয়। ইসলামী দর্শনের অনুসারী একজন মুসলমান ব্যক্তি যেমন কৃপণ হতে পারে না, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্র ও সামষ্টিকভাবে কৃপণতার মত ঘৃণ্য এ পন্থাটি অবলম্বন করতে পারে না কারণ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উভয়ের জন্যই কৃপণতা মারাত্মক একটি ত্রুটি আর এ ত্রুটির জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভয়ংকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহপাক স্বয়ং এ ব্যাপারে বলেন–

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۔ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۔ العمران-١٨٠

অর্থাৎ, যেসব লোককে আল্লাহ অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন এবং তা সত্ত্বেও তারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে এই কৃপণতা তাদের জন্য ভালো। না, এটা তাদের জন্য খুবই খারাপ জিনিস। তারা কৃপণতা করে যা কিছু সঞ্চয় করছে, কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলার ঝুলি হয়ে দাঁড়াবে। আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর যা কিছুই তোমরা করছ আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। (আলে-ইমরান-১৮০)

বস্তুত মানুষ তার স্থূল বুদ্ধি ও বিচারে মনে করে তার অর্থ-সম্পদ তার নিজ আয়ত্ত হতে চলে গেলে, খরচ হয়ে গেলে, তার নিজের দুর্দিনে সে রিক্ত হয়ে

www.pathagar.com

পড়বে, বিপদে পড়ে বিপন্ন অসহায় হয়ে যাবে। এ ধরনের চিন্তা-চেতনা ও আশংকা হতেই সে মূলত কৃপণতা করতে শুরু করে। কারণ এ সম্পদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সে নিজের শ্রম, মেধা ও যোগ্যতা বলে অর্জন করেছে। এ সম্পদ তার নিজ অধিকার বলেই তার হাতে এসেছে। আসলে এটি বড় ধরনের একটি মানসিক ভ্রান্তি ও আকিদাগত ত্রুটি। এ ধরনের ত্রুটি চিন্তা-চেতনা ও আকিদা বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে কুরআনুল কারীমে পরিষ্কারভাষায় বলা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতের বক্তব্যটিতে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সম্পদশালী হয়েছে সে মূলত আল্লাহর অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছে-আল্লাহ তাকে অনুগ্রহ করে এ অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তার মালিকানায় এগুলো হস্তান্তর করেছেন। এ বিশ্বে মানুষসহ অন্য যেসব সৃষ্টি নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে না পেরে অভাবে-অনটনে বিপন্ন তারা এসব সম্পদশালীদের এসব অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আত্মীয় বা অনাত্মীয়, চেনা বা অচেনা যা-ই হোক না কেন তারা তাদের প্রয়োজন মেটাতে এ অর্থ খরচ করবে। কুরআনুল কারীমে স্পষ্টভাবে সে কথা বর্ণিত হয়েছে, যেমন দেখুন-

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ـ(البقرة-٢١٥)

অর্থাৎ, তারা জিজ্ঞাসা করে, আমরা কী খরচ করব? (হে রাসূল) বলে দিন যে সম্পদই তোমরা খরচ করবে নিজের পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, এতিম-মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য (অবশ্যই) খরচ করবে আর যে ভালো কাজই তোমরা করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। (বাকারা-২১৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ـ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ـ(البقرة ـ٣٠)

অর্থাৎ, (আর এতেও পুণ্য রয়েছে যে) আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন, পথিকের জন্য সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্য ব্যয় করবে, এ ছাড়াও নামায কায়িম করবে এবং যাকাত দেবে...। (আয়াতাংশ, সূরা বাকারা, আয়াত-১৭৭)

www.pathagar.com

এরকম শত শত নির্দেশ, রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ এসব উপেক্ষা করে যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কৃপণতাকেই বেছে নেয় কর্মপন্থা হিসেবে সে বা তারা মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর-ই বিরুদ্ধাচরণ করে। এটি যেমন একজন ব্যক্তির জন্য অপরাধ তেমনি তা একটি গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের জন্যও অপরাধ আর এ অপরাধের ব্যাপারে মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছেন–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ـ التوبة ـ ٣٤-٣٥

অর্থাৎ, অতি পীড়াদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও সেসব লোকদের যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না। অবশ্যই একদিন এমন হবে, যখন এসব (জমাকৃত) স্বর্ণ ও রৌপ্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং পরে তা দ্বারাই তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠে চিহ্ন দেওয়া হবে (বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। নাও, এখন তোমাদের সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ গ্রহণ করো (সূরা তাওবা-৩৪-৩৫)।

অপচয়

অর্থাৎ, খাও এবং পান করো (কিন্তু) অপচয় করো না। (নিশ্চিত জেনো) তিনি (আল্লাহ) অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ-৩১, আয়াতাংশ)

কুরআনুল কারীম হতে উদ্ধৃতি দেয়া উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় ব্যক্তি ও সমাজ, সবার জন্য একটি মৌলিক নীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার, একটি প্রতিষ্ঠান বা সমাজ বা রাষ্ট্র একক বা সামষ্টিকভাবে প্রত্যেকেই উক্ত মৌলনীতি মেনে চলতে বাধ্য। অর্থ-সম্পদ আছে বলেই, বিশাল সম্পত্তির মালিকানা আছে বলেই একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার, অথবা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র বা সমাজ যাচ্ছেতাইভাবে অর্থ-সম্পদের অপচয় করবে, সে রকম কোনো সুযোগ ইসলাম না ব্যক্তিকে দিয়েছে না সমাজকে আর না রাষ্ট্রকে। অধুনা বিশ্বব্যাপী (এমনকি আমাদের দেশের মতো গরিব ও অনুন্নত দেশেও) অর্থ-সম্পদের অপচয় বা অপব্যবহারের যে লক্ষণীয় মাত্রা দেখা যায়, তা একটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতাধীন সমাজ বা রাষ্ট্রে আদৌ কল্পনা করা

www.pathagar.com

যায় না। বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত অভাবে-অনটনে বিপন্ন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি যুবক-যুবতী যেখানে বিয়ে পর্যন্ত করতে পারছে না, বয়স পার হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে, সেখানে অর্থ আছে বলেই শখ করে শখের পোষা কুকুরের বা বাড়িতে পোষা মোরগের বিয়ে'র নামে মহাধুমধামের সাথে অর্থ-সম্পদ খরচ করে অনুষ্ঠানের আয়োজন। বরযাত্রী প্রেরণ ও আপ্যায়নের মত জঘন্য অপচয় (যা সম্প্রতি আমাদের বাংলাদেশেই কোনো এক এলাকায় সংঘটিত হয়েছে এবং যথারীতি জাতীয় পত্রিকাসমূহে খবর হিসেবে প্রচারও পেয়েছে)। একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং ইসলামী দর্শন ও শিক্ষায় যার পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস আছে, তারা কখনও এ ধরনের হঠকারিতার কথা চিন্তাও করতে পারে না। এ ধরনের কোনোরকম কর্মকাণ্ড যদি ইসলামী রাষ্ট্রে করার উদ্যোগী হয়ও তবে সেখানে রাষ্ট্র তার অধিকার বলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক শক্তি দিয়ে সেখানে ত্বরিত হস্তক্ষেপ করবে, এ ধরনের যেকোনো প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই নির্মূল করবে। এখানে এক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার বা 'গণতান্ত্রিক অধিকার' ইত্যাদি কোনো ধরনের অধিকারের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রকে নিবৃত করা যাবে না। ইসলামী দর্শনে বিশ্বাসী একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠী, একটি রাষ্ট্র বা একটি সমাজ কেউই এ ধরনের অপচয়, অনর্থক, অপ্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে বা নিজেদের সংশ্লিষ্ট করবে না। তাদের পরিচিতি স্বয়ং আল্লাহপাক-ই তুলে ধরছেন এভাবে, রহমানের বান্দাহ তো তারাই?

وَالَّذِيْنَ لَايَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَامَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا۔ (الفرقان-۷۲)

অর্থাৎ, (আর রহমানের বান্দাহ তো তারা) যারা মিথ্যার সাক্ষী হয় না, আর কোনো অর্থহীন বিষয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে হলে তারা শরীফ মানুষের মতই অতিক্রম করে। (সূরা ফুরকান-৭২)

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র এ ধরনের অপচয়ে অংশ নেবে না, নিজেদের সংশ্লিষ্ট করবে না শুধু তা-ই নয় বরং তারা তাদের একক বা সম্মিলিত, বিচ্ছিন্ন বা সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ ধরনের সকল কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব নির্মূল করবে। ধর্ম বা গোষ্ঠী যে পরিচয়ই হোক না কেন, অপচয়কারী হলো মানবতার দুশমন। কুরআনুল কারীমে আল্লাহপাক বলেছেন-

অর্থাৎ, নিশ্চয় অপচয়কারীগণ শয়তানের ভাই (সূরা - ১৭/২৬-২৭)

আর এ কথাতো সকল ধর্ম-ই স্বীকার করে যে, শয়তান ও তার অনুসারীগণ কখনই কোনো কল্যাণের উৎস নয়, হতেও পারে না। বরং তারা একক বা সামষ্টিকভাবে এ বিশ্বে যাবতীয় অকল্যাণ, যাবতীয় অন্যায়ের উৎস, ধারক ও বাহক।

www.pathagar.com

কৃপণতা, অপচয় বা অপব্যয়কারীর কিছু মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কৃপণ ও অপচয়কারী এ দুজনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আমরা কয়েকটি ত্রুটি দেখতে পাই।

প্রথমত তারা নিজের মনের খায়েশ (বৈধ/ অবৈধ) কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অসমর্থ। সে প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তির তাড়নায় সে এতটাই প্রভাবিত যে, ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধ, ন্যায়-অন্যায় এসবের কোনো সীমারেখা মেনে চলতে সে প্রস্তুত নয়। ফলে তার মনের চাহিদা পূর্ণ হবে এমন যেকোনো কর্মকাণ্ডের পেছনে। সে অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত, যদিও সে কর্মকাণ্ডটি দেশ-সমাজ বা ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর। এটা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে এক ধরনের অন্যায় ও অবিচারের সূত্রপাত করে, রাস্তা খুলে দেয় নৈরাজ্য সৃষ্টির। একটি স্থিতিশীল ও সুস্থ সমাজে যাদের দ্বারা নৈরাজ্যকর অবস্থা ও সামাজিক অশান্তি, ভাঙনের ধারা শুরু হয়, এরা তাদের প্রথম কাতারে থাকে সব সময়। এরা ঐ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, এ ধরনের ব্যক্তিরা অন্যান্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতি বা তাদের প্রাপ্য হক অর্থাৎ অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় অথচ এরাও বৃহত্তর মানব সমাজেরই একটি অংশ। এসব লোকের দৃষ্টিতে দয়া-মায়া-মমতা, প্রেম-ভালোবাসা, দান-দক্ষিণা, সহমর্মিতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ইত্যাদি সকল কিছুই শোষণের বা অনর্থক সুবিধা আদায়ের একপ্রকার হাতিয়ার, মহৎ মানবীয় গুণাবলি নয়। ফলে অপব্যয়কারী ব্যক্তি ভোগবাদী বিলাসী, আত্মকেন্দ্রিক, অসামাজিক স্বার্থপর ও সংকীর্ণমনা হয়ে থাকে। আর এ ত্রুটিগুলোর প্রত্যেকটিই বৃহত্তর সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলার পথে বড় ধরনের অন্তরায়।

তৃতীয়ত এ ধরনের লোক, যারা নিজেদের মনের যেকোনো খায়েশ পূরণে অভ্যস্ত, তারা সময়ের বিবর্তনে অর্থ-সম্পদ ও সুযোগের ঘাটতি হলেও তাদের গড়ে ওঠা অভ্যাসগুলো ত্যাগ করতে পারে না, ফলে তাদের খায়েশ মেটানোর রসদ জোগাড় ও বিলাসিতা করতে তারা সমাজ বা রাষ্ট্রের যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, সেখানেই দুর্নীতি অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। অপব্যয়কারী ও কৃপণ লোকের মন-মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই নীতি-নৈতিকতার পরিবর্তে অনৈতিক কার্যক্রমের অনুকূল হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যক্তিদের সংখ্যাধিক্য সুস্থ সমাজ গঠনের ও পরিচালনার পথে বড় অন্তরায়।

চতুর্থত এ ধরনের লোক নিয়ে ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর কোনো পরিসরেই কোনো কার্যকর ঐক্য গড়ে ওঠে না, উঠতে পারে না। ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে ধরনের

www.pathagar.com

আত্মিক বল ও মানসিক দৃঢ়তা দরকার, তা এদের থাকে না, এরা হয় দুর্বল প্রকৃতির, দৃঢ়চেতা নয়।

পঞ্চমত এরা কোনো উন্নত দর্শন ও শিক্ষার নিকট নিজেকে সমর্পণ করতে জানে না, অথচ ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে প্রথমেই এ দাবি করে যে একজন ব্যক্তি তার নিজের সকল ধরনের পছন্দ-অপছন্দ, ভালো লাগা, না লাগা, তার সকল ব্যক্তিগত চিন্তা ও চেতনা, ধ্যান ও ধারণা এ সকল কিছু বিসর্জন দিয়ে নিঃশর্তভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর পছন্দ-অপছন্দের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু একজন অপব্যয়ী ও একজন কৃপণের মানসিকতা এ ধরনের ঔদার্য প্রদর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে অবস্থিত। এরা ইসলামী সমাজের সদস্য হতে পারে কিনা প্রশ্ন সেটি নয়, বরং এ প্রশ্ন তোলা দরকার যে এ ধরনের কোনো লোক কী এ বিশ্বের অনৈসলামিক কোনো সমাজের সদস্য হিসেবে কাঙ্ক্ষিত হতে পারে?

এ ধরনের লোকদের হাতে যখন একটি সমাজ বা দেশের দায়িত্বভার অর্থাৎ শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত হয় তখন তারা তাদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও আকিদা বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটায়, পুরো সমাজবাসী বা দেশবাসীর ওপরে। তাদের ভালো-মন্দ, তাদের কল্যাণ-অকল্যাণের কথা চিন্তা না করেই। অধুনা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি দেশেই এ অবস্থা বিদ্যমান। আমাদের নিজেদের দেশে যেখানে মানুষ অভাবে-অনটনে অতিষ্ঠ হয়ে প্রাণ বাঁচাতে নিজ সন্তানকে পর্যন্ত প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি করে দেয় সেখানে এ দেশেই শাসকবর্গ শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে মৃত মানুষের কবরের উপরে বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণে ব্যস্ত, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভাস্কর্যের নামে মূর্তি নির্মাণে ব্যস্ত -অথচ এসব অট্টালিকা, এসব ভাস্কর্যের পাশেই ফুটপাতে বা স্টেশনের প্লাটফরমে বেঁচে থাকা মানব শিশুদের মাথার উপরে অট্টালিকা তো দূরের কথা খড়ের ছাউনির আশ্রয় পর্যন্ত নেই। ভারতে যেখানে প্রায় চল্লিশ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, সত্তর (৭০) কোটি লোক বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের আওতার বাইরে বাস করে, কোটি কোটি বনি আদম অভুক্ত রাত কাটায়, সেখানে সরকার ও প্রশাসন হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে সামরিক যান, রকেট ও পারমণবিক বোমা তৈরি করছে। পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানের অবস্থা ঐ একই রকম।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতায় একটি ইসলামী সরকারের নিকট সবচেয়ে মূল্যবান ও সর্বপ্রথম মনোযোগ নিবন্ধের ক্ষেত্র হলো ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকগণ। যারা মরে গেছে এবং মাটির নিচে আশ্রয় নিয়েছে তাদের মাথার উপরে আশ্রয় নির্মাণের পরিবর্তে এ সরকার আচ্ছাদন নির্মাণ করবে তাদের মাথার উপরে যারা

www.pathagar.com

এখনও বেঁচে আছে। জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যেসব নাগরিকগণ যারা নিজেদের অন্ন-বস্ত্র ও ভরণ-পোষণ ব্যবস্থা করতে পারে না তাদের খুঁজে খুঁজে বের করে এ রাষ্ট্রটি তার সরকারি ভাণ্ডার হতে সন্তুষ্টচিত্তে উদার হস্তে ও ত্বরিত গতিতে অর্থ খরচ করবে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্মৃতিসৌধ ভাস্কর্য ও মূর্তি নির্মাণের পরিবর্তে, বস্তুত এটাই মানবতার জন্য বেশি সম্মানজনক, বেশি কল্যাণকর ও ইনসাফেরও দাবি এটিই।

এতো গেল প্রথম ধরনের বিধান। এ বিধান দ্বারা ইসলাম তার অনুসারীদের তা ব্যক্তি বা রাষ্ট্র যাই হোক না কেন অপ্রয়োজনীয় খাতে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা হতে যেমন বিরত রেখেছে তেমনি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মানবতার উপকারার্থে, কল্যাণার্থে ব্যয় না করে অর্থ-সম্পদকে কুক্ষিগত করে রাখার মানবীয় প্রবৃত্তিকে রোধ করেছে।

এর পাশাপাশি আরও কিছু বিধান আছে যা ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে ইবাদত হিসেবে কিন্তু এ বিধানগুলোর যথাযথ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন প্রকৃত অর্থেই যুগান্তকারী অর্থনৈতিক বিধান হিসেবে সর্বোত্তম কল্যাণকর সামাজিক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক বিধান হিসেবেও গণ্য করা যায়। ইসলামী বিধি-বিধানের এ হলো একটি চমৎকার দিক, বহুমাত্রিক দর্শনের একত্রে সমন্বয় একমাত্র ইসলামই করেছে। পৃথিবীর আর একটি দর্শনও এমন পাওয়া যাবে না, পাওয়া যায়নি, যে দর্শনের এ রকম বৈশিষ্ট্য রয়েছে!!

যাকাত

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় গুরত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর এ বিধানটি কুরআনুল কারীমে সরাসরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্দেশ দানের মাধ্যমে ধনবান মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। যাকাত প্রদানের এ অর্থনৈতিক বিধানটি শুধুমাত্র আমাদের প্রিয়নবী মোস্তাফা (সা.)-এর শরীয়তেই নয় বরং তারও পূর্বে অন্য নবী-রাসূলগণের শরীয়তের ওপরেও প্রযোজ্য ও চালু ছিল। কুরআনুল কারীমের বহুস্থানে সালাত প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যাকাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে। যেমন উদাহরণ হিসেবে দেখুন–

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ (المزمل ٢٠)

অর্থাৎ, তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। (সূরা মুযযাম্মিল-২০, আয়াতাংশ)

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মৌলিক যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা আমরা এ নিবন্ধের

www.pathagar.com

শুরুতে কুরআনুল কারীমের আয়াত উদ্ধৃত করে উল্লেখ করেছি (সূরা -৫৯, আয়াত-৭)। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যটি অর্জিত হতে পারে যেকটি কর্মপদ্ধতি দ্বারা, যাকাত হলো সেগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। ইসলামী রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক শৃংখলা বজায় ও সমন্বয় বিধানের জন্য রাষ্ট্রের শাসক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অর্থাৎ সরকারিভাবে যাকাত আদায় ও বন্টন করা হয়ে থাকে। কোনো রাষ্ট্রে যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা তার যথাযথ চেতনা, পূর্ণ অবয়ব ও অবকাঠামোতে চালু থাকে তবে এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সেই সমাজ হতে শোষণ ও পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার বিলোপ সাধন আপনা আপনি হয়ে যেতে বাধ্য। যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা হলো ইসলামী শাসনভিত্তিক একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার অস্তিত্বের রক্ষাকবচ ও মৌলিক বুনিয়াদ। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর পরই হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসলমানদের একটি গোষ্ঠী ইসলামী রাষ্ট্রকে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃত জানালে হযরত আবু বকর (রা.) খলীফাতুর রাসূল, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের নিকট হতে নির্ধারিত হারে যাকাত আদায় করেই ছাড়েন।

ইসলামী রাষ্ট্র শুধু যাকাত আদায়ই করে না বরং এ অর্থ আদায়, যথাযথভাবে সংরক্ষণ, এর যথাযথ হকদার খুঁজে বের করা এবং তাদের হাতে সে অর্থ তাদের মালিকানায় পৌছে দেয়া, এসবই হলো ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তারা সমাজের ধনী মুসলমানদের (সাহেবে নেসাব) নিকট হতে নির্ধারিত হারে অর্থ আদায় করে তা তার প্রাপকদের হাতে পৌছে দেয়ার কাজে তৎপর থাকে এ কথাটির দিকেই ইঙ্গিত করেন।

এখানে এ কথাটিও প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, দান-দক্ষিণা, সদকা ও যাকাত এর মধ্যে মৌলিক ও ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। "যাকাত হলো একটি নির্দিষ্ট সময়কাল যাবৎ ধরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ-সম্পদের অধিকারী মুসলমান নর-নারীর ওপর তার সম্পদের সুনির্দিষ্ট একটি অংশ সমাজে সুনির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর মালিকানায় হস্তান্তর করা।" একটি রাষ্ট্রের কর ব্যবস্থার ন্যায় এটি একটি কর নয় বরং এটি হলো ধনবান প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর জন্য বাধ্যতামূলক ইবাদত। এ বিধানটি পালনের মধ্যে মুসলমানের মনে একটি ইবাদত এর চেতনা থাকে। যাকাতের বিধান অস্বীকার করে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষে মুসলমান থাকা সম্ভব নয়। যাকাত এর অংশ তার সম্পদ হতে স্বেচ্ছায় প্রদান করা তার জন্য বাধ্যতামূলক। তার ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয়। অপরদিকে দান-খয়রাত এসবের জন্য কোন পূর্বশর্ত নির্ধারিত নেই। এটি একজন ব্যক্তির

www.pathagar.com

জন্য বাধ্যতামূলক নয় বরং এর বিপরীতে এটি হল তার ঐচ্ছিক একটি বিষয়। এর জন্য সম্পদের পরিমাণ বা সময় বা তেমন কোনো অংশও নির্ধারিত থাকে না, এর জন্য কোনো বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীকে প্রাপক হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি।

যাকাত এর অর্থ যদি যথাযথভাবে আদায় হয় সে অর্থ সমাজের বিত্তহীন সহায়-সম্বলহীন জনগোষ্ঠীর মালিকানায় হস্তান্তর করে ও সেই সাথে রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পরামর্শ নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণসহ সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান (Consultancy. Training, Follow-up and institutional Support) প্রদান করা হয় তবে একথা দিবালোকের মত সত্য যে অচিরেই দেখা যাবে যে, যারা একদিন অভাবের তাড়নায় যাকাত এর অর্থ হাত পেতে নিয়েছিল খুব শিঘ্রই তারাই আবার তাদের নিজ অর্থ-সম্পদ হতে যাকাত এর অর্থ প্রদানের জন্য তৈরি হয়ে যাবে, অথবা নিদেন পক্ষে তাদের আর্থিক অবস্থা এতটা সচ্ছল হয়ে উঠবে যে তাদের হাত পেতে আর যাকাত বা দান-সদকা নেবার কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

ধনীরা অর্থবিত্ত সম্পদের মালিক হবার সুবাদে সাধারণত তারা সমাজে প্রভাবশালী হয়ে থাকে আর অর্থবিত্ত সম্পদ এর অভাবে অপরদিকে একটি গোষ্ঠী সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তিহীন অক্ষম ও দুর্বল হয়ে পড়ে থাকে। শেষোক্ত এ গোষ্ঠী নিজ উদ্যোগে সমাজের ধনাঢ্য শ্রেণীর নিকট হতে তাদের নিজেদের অধিকার (যাকাত এর অর্থ) আদায় করে নিতে পারে না, যদি না ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাদের নিজেদের উদ্যোগ ও ইচ্ছায় যাকাত এর অর্থ হিসাব করে তা প্রদান না করে। অপর দিকে ধনীরা যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তাদের নিজ নিজ অর্থ-সম্পদের হিসাব করে নিয়ে শরীয়তের বিধানুযায়ী যাকাত এর অর্থ পরিশোধ করেও দেয় এবং সমাজের গরিব, দুস্থসহ শরীয়তের নির্ধারিত গোষ্ঠীকে যথাসময়ে সে অর্থ নিজেদের মালিকানায় পেয়েও যায় তাহলেও দেখা যাবে যে শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান প্রযুক্তি ও উন্নত সুবিধাদি বঞ্চিত এ জনগোষ্ঠী সে অর্থ শুধুমাত্র নিজেদের চাল-ডাল রুটি, পরনের এক টুকরো কাপড় ইত্যাদি ক্রয় এবং তা আয়োজনে ব্যয় করে ফেলেছে অথবা কোনো অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে খুব শিঘ্রই পুনরায় সেই পূর্বের মত অভাবী ও দুস্থতার পর্যায়ে নেমে এসেছে আবার তাদের নিজেদের ও তাদের পোষ্যদের দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য অচিরেই তাদেরকে যাকাত দান-সদকা ইত্যাদি খাত হতে আর্থিক ও বৈষয়িকসহ অন্যান্য সার্বিক সাহায্য প্রদানের জরুরি প্রয়োজন পড়ছে। কিন্তু এর বিপরীতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় যাকাতের

www.pathagar.com

অর্থ সংগ্রহ ও তা হকদারদের মধ্যে বণ্টনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, যা ইতোমধ্যেই আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, যদি প্রদান করা হয় তাহলে অনতিবিলম্বে এ গোষ্ঠীটি সমাজে ইজ্জত-সম্মান ও সচ্ছলতার সাথে পুনর্বাসিত (Rehabilitated) হয়ে যাবে। এ প্রক্রিয়াটি যে সমাজে চালু থাকবে সে সমাজে খ্রিষ্টান মিশনারীদের সেবা ব্যবসার কোনোই প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

ওশোর

ওশোর ইসলামী পরিভাষায় বহুল ব্যবহৃত ও বহুল পরিচিত একটি বিষয় হলেও এবং ইসলামের অনুসারী প্রতিটি মুসলমানের জন্য একটি অবশ্য পালনীয় ইবাদত হলেও অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, আমাদের মুসলিম প্রধান দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজনই এই শব্দটি বা এ বিষয়টির সাথে পরিচিত নয়। অথচ একটি সমাজ বা একটি দেশে অভাবী দুস্থ-নিঃস্ব ও আর্থিক দিক হতে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ওশোর হলো যুগান্তকারী ও বিপ্লবী একটি পদক্ষেপ। এ বিশ্বে যতগুলো ধর্মীয় মতবাদ রয়েছে তার মধ্যে একমাত্র ইসলাম-ই এ বিষয়টিকে অর্থাৎ ওশোরকে একটি ধর্মীয় ও সামাজিক এবং একই সাথে একটি অর্থনৈতিক বিধান হিসেবে গ্রহণ করেছে, প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তার বাস্তবায়ন রাষ্ট্র ও নাগরিক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এমন একটি বিধান যাকাত এর পাশাপাশি যদি চালু থাকে ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়, তবে ঐ সমাজে অভাবী ও নিঃস্ব-দুস্থ জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না।

ইসলামী পরিভাষায় ওশোর হলো ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট একটি অংশ, দশভাগের একভাগ অথবা বিশভাগের একভাগ। উৎপাদিত ফসলের এই নির্ধারিত অংশটি যাকাত এর মতই একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী যেমন দুঃখী অনাথ, গরিব-দুস্থ অভাবী (যে আটটি খাতে যাকাত এর অর্থ প্রদান করাটা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সেই একই খাতসমূহে ওশোরের ফসল এর নির্ধারিত শস্যাদি বণ্টন করতে হয়) বঞ্চিতদের মধ্যে তাদের একক মালিকানায় হস্তান্তর করতে হয়। এটি হলো ফসলের যাকাত। জমিতে উৎপাদিত শস্য ফসলে বঞ্চিত অভাবীদের প্রাপ্য অধিকার। এটিও যাকাত এর মত একটি আর্থিক ইবাদত। প্রতিটি মুসলমান নর-নারী যার জমি আছে বা মিনি জমিতে বা বাগানে ফল-ফসল উৎপাদন করেন বা করান এবং যাঁর মালিকানায় এ ফল ফসলাদি প্রাপ্য হয় এটি সে রকম প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য একটি ফরয ইবাদত। পবিত্র কুরআনুল-কারীমের আয়াতে আমরা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেখতে পাই–

www.pathagar.com

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ তোমাদের নিজেদের উপার্জন হতে এবং আমি তোমাদের জন্য জমিন হতে যা উৎপন্ন করেছি তা হতে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো এবং তা হতে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করো না কেননা তোমরা (নিজেরা) তা কখনও গ্রহণ করবে না।

অন্যত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ ব্যাপারে আরও বলেন–

অর্থাৎ, এগুলোর ফল খাও যখন ফলন্ত হয় এবং প্রাপ্য দান করো ফসল কাটার সময় আর অপব্যয় করো না। (সূরা আল-আনআম-১৪১)

আমাদের দেশে ধান, গম, যব, মসুর, ছোলা, ভুট্টা, তিল-পাট, আখ, তুলা তামাকসহ শতপ্রকার শস্য আবাদ হচ্ছে। দুএক বিঘা জমির মালিকের পাশাপাশি শতশত বিঘা জমির মালিকানা রয়েছে, এমন ব্যক্তিও রয়েছে। এমন চাষী বা গোষ্ঠীও রয়েছে যারা হাজার হাজার মণ শস্য প্রতি মৌসুমেই ঘরে তোলেন। ইসলাম তার এসব অনুসারীগণের জন্য এটা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে যে, জমিতে ফসল-শস্য যদি বিনা সেচে প্রাকৃতিক বৃষ্টির পানি সঞ্চারণের ফলে উৎপন্ন হয় তবে উৎপাদিত ফসলের দশভাগের একভাগ আর যদি চাষী তার নিজ অর্থ ব্যয়ে সেচ এর ব্যবস্থা করে থাকে সে ক্ষেত্রে উৎপাদিত মোট ফসলের কুড়িভাগের একভাগ আল্লাহর নির্দেশ পালনের চেতনা নিয়ে, তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সমাজের দুস্থ ও অভাবী লোকদের দান করে দেবে। ফসলের যে অংশটি এ বিধানের আওতায় দিয়ে দিতে বলা হয়েছে তা হচ্ছে চাষীর জমিতে উৎপাদিত ফসলের ওপর ঐ বঞ্চিত ও নিঃস্ব জনগোষ্ঠীর অধিকার তাদের পাওনা। এটি প্রদান করা মানে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হচ্ছে এমন নয় বরং এটি প্রদানের মাধ্যমে পাওনাদারের পাওনাটুকু পরিশোধ করা হচ্ছে মাত্র। এ বিধানটি যদি আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশে চালু করা যেত তাহলে প্রতিটি ফলের মৌসুমে লক্ষ লক্ষ মেট্রিকটন বিভিন্ন প্রকারের ফসল-ফলমূল চাষীরা বিনা বাক্যব্যয়ে সন্তুষ্টচিত্তে সমাজের অভাবী-দুস্থ লোকজনের জন্য প্রদান করে দিত আর যারা জমিজমা অথবা আয়-রোজগারের পথ না থাকায় পেটের ভাতও জোগাড় করতে পারে না, সেই জনগোষ্ঠী বিনা চাষে, বিনা জমিতে কিছুটা হলেও ফসল-শস্য ও ফলমূলের অধিকারী হয়ে যেত। এ ধারাটি বছরে একবার দুবার নয় বরং যখনই বা যতবারই মাঠ হতে ফসল কর্তন করা হবে তখনই এবং প্রতিবারই তা প্রদান করতে হবে। যাকাতের ক্ষেত্রে যেমন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে একজনের মালিকানায় থাকা শর্ত, ওশোর এর বেলায় কিন্তু নয়। ফসল যে পরিমাণেই উৎপাদিত হোক না কেন, উৎপাদিত ফসলের দশ বা কুড়িভাগের

www.pathagar.com

একভাগ প্রদান করতে হবে ওশোর হিসেবে। বাগানে, বাড়িতে, আশপাশে যেসব ফলের গাছ আছে সেসব গাছে উৎপাদিত ফলেরও একই হিসাবে ওশোর আদায় করতে হবে। যাকাতের টাকা যাদের প্রাপ্য, ওশোরের ফসলও তাদেরই প্রাপ্য। একজন ব্যক্তি তার নিজ উদ্যোগে তার উৎপাদিত ফসলের হিসাব করে ওশোর আদায় করে দিতে পারেন, অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ সু-সমন্বিত ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্মসূচির আওতায় তা আদায়, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপণন, বণ্টনের ব্যবস্থা করতে পারেন। এ ব্যাপারে যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোও তৈরি করতে পারেন। আমার ক্ষুদ্র মতে বাংলাদেশের মত দরিদ্র ও কৃষিপ্রধান একটি দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতায় যদি নিজেদের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে শস্য ব্যাংক জাতীয় রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার চালু করেন এবং ওশোর আদায় সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন তাহলে রাষ্ট্রের নিকট একটি বিরাট শস্যভাণ্ডার গড়ে ওঠে। ২০০১ সালে এক হিসাবে দেখা যায় যে বাংলাদেশে প্রায় দু কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে। যথাযথভাবে তার ওশোর আদায় বা সংগৃহীত হলে প্রায় চব্বিশ লক্ষ নব্বই হাজার (২৪, ৯০,০০০) মেট্রিকটন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়। বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতিজনিত কারণে অনাহার এর ঝুঁকির মুখে রয়েছেন প্রায় আড়াই কোটি নাগরিক। এরা মানবেতর জীবন-যাপন করছে আমাদেরই চোখের সামনে।

কী নিদারুণ লজ্জাজনক এক পরিণতি! কী নির্মম অবমাননা মানবতার জন্য। অথচ সমাজে যদি নাগরিকদের মনে সঠিক ইসলামী চেতনা প্রতিষ্ঠিত থাকত অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যদি ইসলাম টিকে থাকত, সমাজে বা রাষ্ট্রে যদি ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকত, তবে কক্ষনোই এরকম করুণ ও লজ্জাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারত না, কারণ উল্লিখিত তথ্য দ্বারা দেখানো প্রায় চব্বিশলক্ষ মেট্রিকটনেরও বেশি খাদ্যশস্য দ্বারা এরকম অবস্থায় নিপতিত প্রায় আড়াই কোটি জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকেরই মৌলিক ও ন্যূনতম সারা বছরের খাদ্য চাহিদা মেটানো সম্ভব। বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে ভিখারির মত ধন্না দিয়ে প্রতি বছর অপমানজনক শর্তে চড়া সুদে খাদ্য সাহায্য আমদানি করতে হতো না। ওশোরের এসব শষ্য গরিব-দুঃখী অর্থাৎ তাদের মালিকানায় হস্তান্তর করতে হবে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য বা কাজের বিনিময়ে খাদ্য এরকম কোন কর্মসূচিতে মজুরি হিসেবে প্রদান করা যাবে না।

একটি ইসলামী দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতায় বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকদের জন্য ওশোর প্রদান প্রযোজ্য নয়। এটি ফসলের যাকাত

www.pathagar.com

যেহেতু ইবাদত, সেহেতু অমুসলিম নাগরিকদের নিকট হতে এই ওশোর আদায় করা হবে না। এখন যে প্রশ্নটি আমাদের কাছে রয়ে গেল তা হলো এতক্ষণ আমরা যে যাকাত ও ওশোর এর কথা আলোচনা করলাম। (বস্তুত- ওশোরও একটি যাকাত, তা ফসলের যাকাত), এ যাকাত আদায় ও বণ্টন অর্থাৎ যাকাত প্রদান করা, ওশোর প্রদান করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সাহেবে নিসাব ও চাষী, যদি তারা মুসলমান হন, তবে তাদের জন্য ফরয বা বাধ্যতামূলক। এখানে ইসলামী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কী হবে? তারা যদি এ কাজে সহযোগিতা করে তবে সেটি কী ঐচ্ছিক? না এটা তাদের জন্যও একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব?

বস্তুত ইতোপূর্বে আমাদের আলোচনায় সম্ভবত এ কথাটিও পরিষ্কার হয়েছে যে, যাকাত আদায় ও বণ্টনের ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্র নিস্পৃহ থাকতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের চারটি মৌলিক দায়িত্বের কথা নির্দেশ করেছেন, এই চারটির একটি দায়িত্ব হলো যাকাত লেনদেন করা, যেমন দেখুন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ـ (الحج-٤١)

অর্থাৎ, আমি এদেরকে (মুসলমানদের) পৃথিবীতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসালে তারা নামায কায়িম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকাজ হতে (মানুষকে) ফিরিয়ে রাখবে। (সূরা হজ্জ-৪১)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর আমলে মদীনার বাইরে মুসলিম কিছু গোত্র ইসলামের অন্যসকল আচরণাদি পালন করার পরেও শুধু যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, ফলে খলীফা আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিষয়টি নিয়ে বড় সাহাবীরাও দ্বিধায় পড়ে গেলেন, তাঁদের বক্তব্য ছিল যেহেতু ঐসব গোত্র আল্লাহ ও রাসূলের ওপরে ঈমান পোষণকারী মুসলমান, সেহেতু তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে ইসলামী রাষ্ট্র অস্ত্র ধারণ করতে পারে, এ ব্যাপারে খলীফা ওমর (রা.)-এর সাথে খলীফা আবু বকর (রা.)-এর বাদানুবাদ পর্যন্ত শুরু হয়ে গেল, উত্তরে আবু বকর (রা.) তখন ইসলামের দর্শন হতে সুন্দর ব্যাখ্যা তুলে ধরে ছিলেন। তার এ ব্যাখ্যায় সকল সাহাবী একমত হন এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে তাদের নিকট হতে যাকাত আদায় করা হয়। তার জবাবটি ছিল এরকম, "আল্লাহর কসম! আমি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্যকারীদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব। কারণ হচ্ছে সম্পদের প্রাপ্য এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)

www.pathagar.com

বলেছেন– ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের দায়িত্বে যেসব অধিকার বর্তাবে তা সর্বাবস্থায় তাদের কাছ হতে আদায় করে নেওয়া হবে।"

অতএব আজও যদি ইসলামী রাষ্ট্র কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সর্বাবস্থায় রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের নিকট হতে যাকাত আদায় করে তা তার প্রাপকদের হাতে পৌছে দেবে। এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, এ দায়িত্ব পালন করতে রাষ্ট্র বাধ্য।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ
সুস্পষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ

সম্পদের সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে আমরা বেশকিছু বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি কিছু বিধান আছে যা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। কিছু বিধান আছে যা ব্যক্তির জন্য নিঃশর্ত বাধ্যতামূলক। কিছু বিধান এমন যার ফলে ব্যক্তি তার নিজের আয়-রোজগারের প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার সাথে তার সমগ্র শক্তি, মেধা-শ্রম ও যোগ্যতা নিয়োজিত করতে বাধ্য।

উল্লিখিত বিধানাবলি ব্যতিরেকেও ইসলাম এমন একটি বিস্ময়কর প্রথা বা বিধান এর প্রবর্তন করেছে। আজকের পুঁজিবাদি বিশ্ব যার চিন্তাও করতে পারে না এবং তারা তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তা মেনেও নিতে পারে না। মানবিতিহাসের ক্রমধারায় এ বিষয়ে অনেক বঞ্চনার ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু ইসলাম একটি দর্শন হিসেবে যা মানুষকে সকল রকম বঞ্চনা হতে মুক্তি দিয়েছে। সেই ইসলাম এ ক্ষেত্রে একটি অনন্য ও ইনসাফপূর্ণ বিধান প্রতিষ্ঠা করেছে। তার নাম হলো মিরাস। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার কারণে একজন অপরজনের সম্পদের হকদার হয়, তাদের কারো মৃত্যু হলে। যেমন পিতার মৃত্যু হলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র যদি বেঁচে থাকে তবে সে হকদার হয়ে যায়। স্বামীর মৃত্যু হলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রী হকদার হয়ে যায়।

পৃথিবীর অনেক দর্শন এমন রয়েছে যেসব দর্শনে এরকম পরিস্থিতিকে সামনে রেখে এরকম বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্য ও ত্রুটিপূর্ণ অবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে। কোনো কোনো ধর্মে তো পিতার মৃত্যুতে তার ঔরষজাত কন্যার কোন ধরনের কোনো হক বা অধিকার স্বীকৃত নয়। কোনো কোনো সমাজে আবার স্ত্রীজাতিকে কোনো ধরনের সম্পত্তির মালিকানা স্বীকৃত হয়নি। এমনকি এই উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তথাকথিত উন্নত বিশ্ব, নারী অধিকারের স্বর্গরাজ্য ব্রিটেন ফ্রান্সসহ সমগ্র ইউরোপে নারীর কোন রকম সম্পদের মালিকানা স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু ইসলাম এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে

www.pathagar.com

মানব জীবনের এই মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে কীভাবে উপেক্ষা করে? মানুষের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহপাকই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে ভালো জানেন। তাই এ সংক্রান্ত একটি ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধান তিনি দেবেন এটাই ছিল বিবেক এর দাবি আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা সে দায়িত্ব যথাযথই পালন করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনদের পারস্পরিক সম্পত্তিতে কারো মৃত্যুতে তাদের হক বা অধিকার অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করে দিয়েছেন। ইসলামী পরিভাষায় এই অধিকারকে মিরাস ও প্রাপ্য অংশকে ফরায়েয বলা হয়। নিচে উদ্ধৃত কুরআনুল কারীমের এই আয়াত দুটির দিকে দয়া করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন।

অর্থাৎ, তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহতাআলা তোমাদের এই বিধান দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দুজন মেয়েলোকের সমান হবে। (মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী) যদি দুজনের অধিক কন্যা হয়, তবে তাদের ত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ দেওয়া হবে আর একজন কন্যা হলে সে ত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতামাতা প্রত্যেকেই সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে। আর মৃত ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় এবং বাপ -মা-ই তার উত্তরাধিকারী হয় তবে মাকে দেওয়া হবে তিনভাগের একভাগ। আর যদি মৃতের ভাই-বোন থাকে তবে মা এক ষষ্ঠাংশের অধিকারী হবে। এসব অংশ বণ্টন করা হবে তখন, যখন মৃতের অসিয়ত যা সে মরার পূর্বে করেছে, পূর্ণ করা হবে, তার যে সমস্ত ঋণ রয়েছে তা আদায় করা হবে। তোমরা জান না তোমাদের মা-বাপ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে অধিক নিকটবর্তী। এসব অংশ আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ নিশ্চিতরূপেই সমস্ত তত্ত্ব ও নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং সমস্ত কল্যাণ ও মঙ্গলময় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত। (সূরা- নিসা-১১)

"আর তোমাদের স্ত্রীগণ যা কিছু রেখে গেছে তার অর্ধেক পাবে তোমরা যদি তারা নিঃসন্তান হয়। আর সন্তানশীলা হলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তোমরা পাবে তখন যখন তাদের কৃত অসিয়ত পূরণ করা হবে এবং যে ঋণ অনাদায় রেখে গেছে তা আদায় করা হবে। আর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে যদি তোমরা নিঃসন্তান হও। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে আটভাগের একভাগ। এটাও তখনই কার্যকর হবে যখন তোমাদের অসিয়ত পূরণ করা হবে আর যে ঋণ রেখে গেছো তা আদায় করা হবে। সেই পুরুষ কিংবা স্ত্রী (যার মিরাস বণ্টন করা হবে) যদি নিঃসন্তান হয় এবং তার মা-বাপও যদি জীবিত না থাকে, কিন্তু তার একভাই

www.pathagar.com

কিংবা একবোন যদি জীবিত থাকে তবে ভাই-বোনদের প্রত্যেকে ছয়ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি ভাই-বোন দুজনের অধিক হয় তবে সমস্ত ত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশে তারা সকলেই শরীক হবে, যখন অসিয়ত পূরণ করা হবে এবং ঋণ যা মৃত ব্যক্তি অনাদায় রেখে গেছে, আদায় করা হবে, অবশ্য শর্ত এই যে তা যেন অপরের ক্ষতি না হয়। বস্তুত এটা আল্লাহতাআলারই নির্দেশ এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও পরম ধৈর্যশীল।" (সূরা নিসা-১২)

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে যেসব বিধান ও অংশের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তার প্রতিটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন পড়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস, তাঁর ও তার হাতে গড়া সাহাবী এবং সেই সাথে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সর্বমান্য ইমাম ও ফক্বীহগণের নিকট হতে। এ বিষয়ে ইসলামের ইতিহাসে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে এবং বিশাল একটি জ্ঞানের ভাণ্ডারই গড়ে ওঠেছে। মনুষ্য সমাজে মিরাস এ বিষয়টি এতই স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে, এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ও লোভ-লালসা, হিংসা দ্বেষ, কামক্রোধ দ্বারা সহজে প্রভাবিত মানুষের ওপরে বিষয়টি নির্ধারণের দায়িত্ব ছেড়ে দেননি বরং সম্ভাব্য প্রতিটি খুঁটি-নাটি বিষয়ও তিনি স্পষ্ট করে সরাসরি কুরআনুল কারীমে আয়াত নাযিল করেছেন, উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয় ছাড়াও আমরা কুরআনুল কারীমের অন্যত্রও এই একই বিষয়ে আরও আলোচনা দেখতে পাই। যেমন নিচের আয়াতটি দেখুন।

অর্থাৎ, লোকজন আপনার কাছে কালালা সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে, বলুন! আল্লাহ তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন। কোনো ব্যক্তি যদি সন্তানহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং তার একজন বোন থাকে তবে সে (বোন) তার সম্পত্তি হতে অর্ধেক অংশ পাবে। আর বোন যদি সন্তানহীন অবস্থায় মরে, তবে ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দু বোন হয় তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিনভাগের দুভাগ পাবে। আর যদি কয়েকজন ভাই-বোন হয় তবে মেয়েদের অংশ একভাগ ও পুরুষদের অংশ দুভাগ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য আইন-কানুন স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিচ্ছেন এই উদ্দেশ্যে যে, যেন তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে না থাকো। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত ও অবহিত (সূরা নিসা-১৭৬) এসব আয়াতে বর্ণিত বিধি-বিধান দ্বারা একথা সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়েছে যে, ইসলাম মানুষের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু আবর্তন নিশ্চিত করার জন্য আত্মীয়-স্বজনদের সম্পত্তিতে একে-অপরের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রায় অংশ নির্ধারণ করেছে সে অংশটি প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্র কায়িম হলে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু থাকলে ঐ রাষ্ট্রের আওতায় কোনো মুসলিম নাগরিককে তার প্রাপ্য এসব অংশ মিরাস হতে ছলে-বলে-কৌশলে বঞ্চিত করার কোন সুযোগ নেই। যেমনটি আজ আমাদের মুসলিম সমাজে মুসলিম শাসনে দেখা যায়। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতায় রাষ্ট্র এমন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে যেখানে কারো ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রাপ্য অংশকে না দেয়া বা বঞ্চিত করার কোনোরূপ সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সে ক্ষেত্রে নিজ কর্তৃত্ব দ্বারা কুরআনুল কারীমে উল্লিখিত আয়াত দ্বারা মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয়া মিরাসকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। এতসব বিধি-বিধান, এতসব আয়োজন, এতসব রক্ষাকবচ, সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, এতসবের পরেও যদি বাস্তবিকই এমন হয় যে, সমাজে কোনো অভাবী-দুস্থ লোক অভাবীই রয়ে গেল। নিজের অন্ন, নিজের খাদ্যও জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়ে রইল তাকে কী তবে অভুক্ত মরতে হবে? বস্তুত তা নয়, ইসলামী রাষ্ট্রে কেউ না খেয়ে মরে না। এ রাষ্ট্র তার মৌলিক দর্শন দ্বারা এরকম অভাবী ও দুস্থ ব্যক্তির সামনে তাকে অধিকার প্রদানের নামে এক বিশাল ও বিস্তৃত দ্বার খুলে দিয়েছে, বলেছে এখান থেকে সেখান থেকে তুমি খাও এর জন্য তুমি তিরস্কৃত হবে না বরং এটা তোমার অধিকার। যেমন দেখুন–

অর্থাৎ, অন্ধের জন্য কোনো দোষ নেই, খঞ্জের জন্যও কোনো দোষ নেই, দোষ নেই রুগ্নের জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও আহার করা নিজেদের ঘরে অথবা তোমাদের পিতৃগণের ঘরে, অথবা তোমাদের মায়েদের ঘরে, ভাইদের ঘরে, বোনদের ঘরে, চাচাদের ঘরে, ফুফুদের ঘরে, মামাদের ঘরে, খালাদের ঘরে অথবা সেসব ঘরেও যার চাবির মালিক তোমরা, কিংবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। (সূরা আন্-নূর-৬১)

একজন বিবেকবান ব্যক্তি যদি তার খোলা অন্তর ও সংকীর্ণতামুক্ত দৃষ্টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেন তবে তিনি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃতি, যা কুরআন হতে চয়ন করা হয়েছে তবে স্পষ্টতই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ইসলাম-সর্বোচ্চ সফলতার সাথে সম্পদের পুঞ্জীভূত অবস্থা রোধের পাশাপাশি সকল শ্রেণীর নাগরিকদের আয়ত্তের মধ্যে ন্যূনতম নাগরিক ও মানবিক প্রয়োজন মেটানোর মত সম্পদ ও অর্থের স্বাভাবিক ও সহজাত আবর্তনকে নিশ্চিত করেছে। এ কারণেই প্রকৃত ইসলামী শাসনের আওতায় কেউ গরিব হতে পারে না, কেউ গরিব রইতেও পারে না।

www.pathagar.com

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অনুসৃতব্য বিধান

কুরআনুল কারীমে বারবার যাকাত আদায় করার পরেও আবার বলা হয়েছে যে, ধনী ও সম্পদশালীদের ধন-সম্পদে গরিব ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে– যেমন কুরআনেরই একটি আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন–

অর্থাৎ, তাদের (ধনীদের) সম্পদে গরিব ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। (সূরা যারিয়াত-১৯) এই যে অধিকার এর কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা কী যাকাতের কথা-ই বোঝানো হয়েছে? না যাকাতের অর্থ প্রদানের পরেও যে সম্পদ, সেই সম্পদে গরিব ও বঞ্চিতদের অধিকারের কথা বলা হয়েছে? এ বিষয়টির দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে যায় যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস এবং তাঁর ও তাঁর সম্মানিত সাহাবীদের কর্মনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করি। এক হাদীসে দেখা যায় সেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– "যাকাত ছাড়াও তোমাদের সম্পদে আরও অধিকার রয়েছে।" (তিরমিযী ও মুসলিম)। কুরআনুল কারীমে অন্যত্র এক আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন–

অর্থাৎ, আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে তারা কী ব্যয় করবে? বলে দিন নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত যা আছে তাই ব্যয় করবে। (সূরা বাকারা-১১৯ আয়াতাংশ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ ধন-সম্পদ আটকে না রেখে, নিজের বা নিজেদের মালিকানায় কুক্ষিগত করে না রেখে আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট হতে ব্যয়কৃত এ সম্পদের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান পাবার আশায় আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দুস্থ বান্দাহদের মধ্যে ব্যয় করে দেয় তাদের প্রত্যাশা কী? সে ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই সাক্ষী, তিনি তাদের মানসিকতাকে তুলে ধরেন এ ভাষায়–

অর্থাৎ, আর (মুমিনগণ) তারা আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অভাবী-এতিম ও বন্দিদের খাদ্য দান করে, ও বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে তোমাদের খাবার খাওয়াচ্ছি, আমরা তোমাদের কাছ হতে কোনো প্রতিদান চাই না, কোনো কৃতজ্ঞতাও নয়। (সূরা আদ্-দহর-৮)

এ আশা পোষণ করা অসঙ্গত নয়, কারণ আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মানুষ যা ব্যয় করে থাকে বা যা ব্যয় করবে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান আল্লাহর জিম্মায় থাকে-আল্লাহ সে প্রতিদান দেবেনই। এ প্রতিদান প্রদান করার ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য করবেন না। যেমন আল্লাহ স্বয়ং এরশাদ করছেন–

www.pathagar.com

অর্থাৎ, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করো তা তোমাদেরই কল্যাণের জন্য এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তা করে থাক। যে সম্পদ তোমরা ব্যয় করো তার প্রতিদান তোমাদের পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে এবং (এ ব্যাপারে) তোমরা সামান্য পরিমাণেও বঞ্চনার শিকার হবে না। (সূরা বাকারা-২৭২)

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন-এই একই বিষয়ে, এভাবে-

অর্থাৎ, যারা দিনরাত গোপনে বা প্রকাশ্যে নিজেদের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট তার পুরস্কার পাবে, তাদের জন্য না আছে কোনো ভয় আর না কোনো দুশ্চিন্তা। (সূরা বাকারা-২৭৪)

আল্লাহপাক শুধু পরকালীন জীবনেই এর প্রতিফল দেবেন বিষয়টি তেমন নয় বরং তিনি তো ইহজীবন ও পরকালীন জীবন, উভয় জীবনেরই মালিক। তিনি ইচ্ছা করলে ও কল্যাণকর মনে করলে ইহকালীন জীবনেই তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে বান্দাহর নিকট ফেরত দিতে পারেন। যেমন আল্লাহ নিজেই এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দান করে বলেছেন–

অর্থাৎ, কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম কর্জ প্রদান করবে? তিনি তার (কর্জ দানকারী) জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। আর আল্লাহ (জীবিকা) সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তোমরা তো তার দিকেই ফিরে যাবে। (বাকারা-২৪৫)

অন্যত্র তিনি চমৎকার উপমা সহকারে ব্যয়কৃত সম্পদ যিনি ব্যয় করছেন, সেই বান্দাহকে ফেরত দানের, তথা বহুগুণে বৃদ্ধি করে ফেরত দানের ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় অঙ্গীকার করছেন। যেমন নিচের আয়াতটি দেখুন–

অর্থাৎ, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তা একটি শস্যবীজ এর মত, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় সবকিছু জানেন। (সূরা বাকারা-২৬১)

এ আয়াতগুলোর শিক্ষা ও চেতনা অনিবার্যভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি পিয়াসী মুসলিম উম্মাহকে তাদের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার পরিবর্তে সেসব ধন-সম্পদ অভাবী ও দুস্থ জনগণের অভাব কষ্ট দূর করার কাজে ব্যয় করার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে ধাবিত করে। রাসূল (সা.) ও তাঁর প্রিয় সাথী সাহাবীগণের জীবনে আমরা এ সত্যের প্রকাশ দেখি।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁর বিভিন্ন বাণীতে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন নফল দান-খয়রাত করার জন্য। এক হাদীসে তিনি বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহরও নিকটে, বেহেশতেরও নিকটে, মানুষেরও নিকটে, আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ হতে দূরে, বেহেশত হতেও দূরে, মানুষ হতেও দূরে অথচ দোযখের নিকটে। একজন মূর্খ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকট একজন ইবাদতকারী কৃপণ দরবেশ হতে নিশ্চয় অধিকপ্রিয়।" (তিরমিযী)

অন্যত্র তিনি আর এক বাণীতে বলেছেন, "যে ভিক্ষুককে নিজ দুয়ার হতে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেয়, সাতদিন পর্যন্ত তার গৃহে ফেরেশতারা আসে না।"

আবার অন্যত্র বলেছেন, "যে মুসলমান অন্য অভাবী মুসলমানকে বস্ত্র দান করে, যে পর্যন্ত এর এক অংশও তার শরীরে থাকে সে পর্যন্ত সে আল্লাহর হিফাযতে থাকে"।

এভাবে সমগ্র কুরআন ও হাদীস এবং মুসলমানদের স্বর্ণযুগের সোনালি ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যে, এসব বিধি-বিধান (যাকাত ওশোর ছাড়াও) স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যয় করার এক নিরন্তর প্রতিযোগিতা চলেছে মুসলিম ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে। ফলে দেখা গেছে যে, ইসলামী সমাজে সম্পদ একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত হবার পরিবর্তে সদা-সর্বদা তা আবর্তিত হতে থেকেছে সমাজের লোকদের মাঝে।

সপ্তম অধ্যায় ঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কল্যাণ এর প্রকৃত ধারণা

বর্তমান বিশ্বে বস্তুবাদী ধারণা প্রকট। এর আওতায় মানুষের কল্যাণ এর ধারণা হলো (স্বল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে) অঢেল সম্পত্তি, সামাজিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা, দামি চাকরি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রাসাদোপম আলিশান বাড়ি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, সুন্দরী স্ত্রী, সবল-সচ্ছল, পুত্র-কন্যা ইত্যাদি। এগুলোর উপস্থিতি হলো সফলতা ও কল্যাণের পরিচায়ক আর এ সবের অনুপস্থিতি হলো অকল্যাণের নিয়ামক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন রকমের। ইসলাম উল্লিখিত উপায়-উপকরণ ও উপাদানগুলোকে স্বল্পস্থায়ী এ পৃথিবীর পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী উপকরণমাত্র। এগুলো একজন ব্যক্তির জন্য যেমন কল্যাণকর হতে পারে তেমনি তা আবার কারো জন্য সমূহ-অকল্যাণের মূল উৎসও হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর কল্যাণ এবং অকল্যাণ এর এই যে পার্থক্য একই উপকরণকে ঘিরে, তা নির্ভর করে এসব উপকরণের প্রতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির

www.pathagar.com

পোষণকৃত দৃষ্টিভঙ্গি তা অর্জন, সংরক্ষণ ও উপভোগসহ ব্যবহারের পথ-পদ্ধতি কী ছিল? তাসহ আরও বহুবিধ কারণ ও কার্যাবলির ওপর।

ইসলামের দৃষ্টিতে কল্যাণ-অকল্যাণ এর ধারণা ও মানদণ্ড প্রচলিত বস্তুবাদী তথা জড়বাদী দৃষ্টিকোণে পোষণকৃত কল্যাণ-অকল্যাণ এর ধারণা হতে সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তুবাদী জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে এবং আবর্তিত হয় শুধুমাত্র এই পার্থিব জীবনকে ঘিরে। তাই সে এই পার্থিব জীবনের কয়েক দশক সময়কালে একজন ব্যক্তির একটু ভালো থাকা, ভালো খাওয়া, একটুখানি সচ্ছলতা, সুখ ও ভোগ ছাড়া আর বেশি কিছু ভাবতেও পারে না। কিন্তু এর বিপরীতে ইসলাম শুধু এ জীবনই নয় বরং এ জীবনের পরে অন্য এক পৃথিবীর সন্ধান দেয় এবং সেই পৃথিবীতে অনন্ত অসীম এক জীবনের অস্তিত্বের কথা তুলে ধরে। সঙ্গত ও বোধগম্য কারণেই ইসলামের দৃষ্টিতে এই স্বল্পকালীন পার্থিব জীবনে কল্যাণের চাইতে বরং সেই অনন্ত অসীম জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণের গুরুত্ব বেশি। আর যুক্তি ও বিবেকের দাবিও তাই। ইসলাম পার্থিব এই জীবনকে ততখানি গুরুত্ব দেয় যতখানি গুরুত্ব দিলে ও যেভাবে গুরুত্ব দিলে পরকালীন সেই অসীম জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত হবে। ইসলামী দর্শনে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিটি ব্যবস্থা এর অনুসারীদের মূলত পরকালমুখী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আবর্তিত হয়ে থাকে। ইসলাম মানুষকে দুনিয়াবিমুখ সন্ন্যাসী বানায় না বরং দুনিয়ার প্রতিটি হালাল ও বৈধ সম্পদ ও সুযোগকে নিজের বা নিজেদের জন্য ইসলামী বৈধ পন্থায় কাজে লাগিয়ে, তা থেকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চমানের ফায়দা উঠিয়ে পরকালীন জীবনের পুঁজি সংগ্রহের পথ নির্দেশ করে। মহানবী (সা.) তাঁর অনুসারী অর্থাৎ বিশ্বের তাবৎ মুসলমানদের উদ্দেশে এ কথাটি এভাবে বলেছেন- "দুনিয়াতে যে ব্যক্তি নিজেকে জান্নাতের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবে, সেই পরকালে জান্নাত লাভ করবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর আজাবকে ভয় করবে তাকে দোজখ থেকে মুক্ত রাখা হবে এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়াশীল হবে, আল্লাহ আখিরাতে তার প্রতি দয়াবান হবেন"। (বায়হাকী)

অন্যত্র তিনি বলেছেন-

অর্থাৎ, এ পৃথিবীটা হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকাকালীন যে যেমন বীজবপন করবে ঠিক তদনুযায়ী শস্য বা ফলাফল সে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে গিয়ে পাবে। অর্থাৎ এ কথাটিই পরিষ্কার বোঝানো হয়েছে যে, এ পৃথিবীতে ভালো-মন্দ যে যেমন কাজ করবে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে সে ঠিক

www.pathagar.com

তেমনি ভালো কাজের জন্য ভালো ফল পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য মন্দ ফল বা শাস্তি পাবে।

দুনিয়ার জীবন যে ক্ষণস্থায়ী তাতো আমরা সকলেই জানি। আমাদের তা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর প্রয়োজন পড়ে না আমাদের সম্মুখে। প্রতিদিন মৃত্যুর পথে পাড়ি জমানো মনুষ্যবর্গ সে অমোঘ সত্যের কথাই জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন বরং আখিরাত এর জীবন যে সীমাহীন, তার যে শুরু আছে শেষ নেই চিরস্থায়ী এই অমোঘ সত্যটিই বিশ্বে মনুষ্য সমাজের একটি বৃহৎ অংশ মেনে নিতে চায় না বা মেনে নিতে পারে না অথবা সংশয়ে-সন্দেহে নিপতিত হয়ে থাকে। মানুষের এই মনস্তাত্ত্বিক দিককে চিন্তায় রেখেই আমাদের পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং এর বিপরীতে পরকালীন জীবনের চিরস্থায়িত্ব গুরুত্ব সহকারে ও অকাট্যভাবে উপলব্ধি করানোর জন্য পুনঃপুন কুরআনুল-কারীমে এ ব্যাপারে অত্যন্ত অকাট্য যুক্তি নির্ভর বক্তব্য সংবলিত আয়াত নাযিল করেছেন। সমগ্র কুরআনুল কারীমে বিশেষ করে রাসূল (সা.)-এর মক্কী জীবনে নাযিলকৃত সূরাগুলোতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা গুটিকতক আয়াতকে এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করব। যেমন দেখুন কুরআনুল কারীমের সূরা কাসাস্ এর এই আয়াতটি-

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ج وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (القصص ـ ٦٠)

অর্থাৎ, তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা শুধু দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী ও তার চাকচিক্যমাত্র, আর যা কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে তা সেসব অপেক্ষা উত্তম ও স্থায়ী, তোমরা কী বিবেচনা করে দেখবে না। (সূরা কাসাস্ -৬০)

এই একই কথা অন্যত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় বলেছেন–

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ـ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (العنكبوت ـ ٦٤)

অর্থাৎ, আর এ দুনিয়ার জীবন কিছুই নয়, শুধু একটি খেলা ও মন ভোলানোর ব্যাপার মাত্র। আসলে জীবনের ঘর তো পরকাল মাত্র। হায় তারা যদি একথা জানত! (সূরা আনকাবুত-৬৪)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এসব আবেগঘন ভাষায় মহা সত্যকে কুরআনুল

www.pathagar.com

কারীমের পাতায় পাতায় উপস্থাপন করেছেন যেন মানুষ এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, বিবেক খাটায়। তার চারপাশে সমাজ-সংসার এবং জীবন এসবের যে বিবর্তন ঘটে চলেছে সে বিষয় যেন সে চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা করে এবং একই সাথে সে যেন তার নিজের ব্যক্তিসত্তার প্রতিও লক্ষ্য করে। এতে করে যে বিষয়টি তার নিকট পরিষ্কার হয়ে যাবে তা হলো এই যে, সে একথা খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে এ বিশ্ব তার আসল ঠিকানা নয় বরং আসল ঠিকানা হলো আখিরাত, একমাত্র ও অনিবার্য গন্তব্যস্থল হলো আখিরাত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাদের বিবেক, বুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার না করার কারণে এ ধ্রুব সত্য ব্যাপারটি তার উপলব্ধিতে ধরা পড়ছে না এ কথারই প্রতিফলন ঘটেছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার নিম্নোক্ত বাণীতে।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (انعام ـ ٣٢)

অর্থাৎ, দুনিয়ার এ জীবন খেল-তামাশার একটি ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয় আর প্রকৃতই আখিরাতের জীবন তাদের জন্য কল্যাণকর। যারা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে চায়। তোমরা কী একটুও বুদ্ধির পরিচয় দেবে না। (আনআম-৩২) বুদ্ধির এ পরিচয়টুকু মানুষ যদি দিত তাহলে এটা তার স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধিতে আসার কথা যে, এই পৃথিবী যেহেতু স্থায়ী নয় তাই এই অস্থায়ী জীবনের কল্যাণই কারো জীবনে অর্জনযোগ্য চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত নয় বরং এর বিপরীতে যে জীবন স্থায়ী ও চিরন্তন সেই জীবনের কল্যাণই হলো চূড়ান্ত কল্যাণ চূড়ান্ত সফলতা এবং জীবনে অর্জনযোগ্য চূড়ান্ত লক্ষ্য।

প্রশ্ন হলো সেই চিরন্তন জীবনের কল্যাণটুকু কী? সেই জীবন অর্থাৎ সেই আখিরাতের জীবনের কল্যাণটুকু হলো সেখানে অবিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত ও আয়োজিত জাহান্নামের কঠিন পীড়াদায়ক ও অপমানজনক আজাব, আগুন ও লাঞ্ছনা হতে নিষ্কৃতি। এ কথা মহা সত্যেরই প্রতিধ্বনি বিম্বিত হয়েছে আল কুরআনের এই আয়াতটিতে–

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ـ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ الدخان ـ ٥٦-٥٧

অর্থাৎ, দুনিয়ার মৃত্যুর পর সেখানে (পরকালে) আর তারা মৃত্যুর স্বাদ

www.pathagar.com

কখনোই আস্বাদন করবে না। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে জাহান্নামের কঠিন আজাব হতে রক্ষা করবেন আর এটাই বড় সাফল্য। (সূরা আদ্- দুখান-৫৬-৫৭)

এ মহাসত্যটি যখন একজনের উপলব্ধিতে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে এবং হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায় তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই উপলব্ধির পাশাপাশি এ কথাটিও অকাট্যভাবে বুঝে ফেলেন যে প্রকৃতই আখিরাতের বিপরীতে এ দুনিয়ার জীবন একটি খেল-তামাশা, একটি প্রতারণামাত্র। এটি তার বোধ ও বিশ্বাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। তাই আল্লাহ বলেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ـ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ـ(ال عمران- ١٨٥)

অর্থাৎ, প্রতিটি জীবকেই মরতে হবে এবং কিয়ামত দিবসে তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজের প্রতিফল পাবে। যাকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে ব্যক্তিই মূলত সফল আর এ দুনিয়াতো একটি প্রতারণাময় জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়। (সূরা আলে-ইমরান-১৮৫)

পৃথিবীর এই যে ক্ষণস্থায়ী জীবন একে ইসলাম গুরুত্বহীন করেনি অবজ্ঞা করেনি বরং এ জীবনের যথাযথ গুরুত্ব বারবার ফুটিয়ে তুলেছে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সফলতা যে ইহকালীন এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের কৃতকর্মের ওপরেই নির্ভর করছে। সে কথাটি অকাট্য ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলার আয়াত–

فَمَآ أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْئٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ـ (الشورى ـ ٣٦)

অর্থাৎ, যা কিছু তোমাদের দেওয়া হয়েছে তা শুধু দুনিয়ার কয়েকদিনের সামগ্রীমাত্র। আর যা কিছু আল্লাহর নিকট আছে তা উত্তম ও উৎকৃষ্ট তা সেই সবলোকদের জন্য যারা (এ ইহকালীন জীবনে) ঈমান এনেছে ও আল্লাহর উপরেই সর্বাবস্থায় নির্ভরশীল। (সূরা আশ-শুরা-৩৬)

উপরোল্লিখিত আয়াতে এ কথা খুব পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, এ বিশ্বের ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে যারা বা যেসব লোক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বিধি-বিধান ও তাঁর প্রিয় রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রদর্শিত পথ-পদ্ধতি তথা জীবনযাপন প্রণালি অর্থাৎ দীনকে স্বীকার করেছে এবং সেই পদ্ধতি বা দীন এর

www.pathagar.com

মধ্যেই দিনাতিপাত করেছে জীবন কাটিয়েছে, দুঃখ-কষ্ট, সুখ ও সমৃদ্ধিতে সকলাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপরেই নির্ভর করেছে তারাই মূলত সফল। সফল এই কারণে তারা আখিরাতের জীবনে যে মূল সফলতা ও কৃতকার্যতা আগুন বা জাহান্নাম হতে মুক্তি, তা তারা পাবে। অতএব সে চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী সফলতা যে পেল সে-প্রকৃতই সফলতা পেল।

প্রকৃত ও চূড়ান্ত এই সফলতা প্রাপ্তিই হলো একজন মুসলমানের জীবনে একমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্য। শুধু মুসলমানেরই বা বলি কেন বরং সকল মানুষেরই সে লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইসলাম তার অনুসারীদের প্রাথমিক অর্থে ও আরও ব্যাপক অর্থে বিশ্বের সকল মানুষের এই চরমতম কল্যাণ লাভের ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে চায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বা ইসলামী শাসন এর মূল লক্ষ্যও এটিই, মানুষকে কল্যাণের পথ দেখানো, কল্যাণের পথে চলাটা তার জন্য সহজ করে দেয়া সেরকম অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা আর এর পাশাপাশি অকল্যাণের সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস সকল পথকে বন্ধ করে দেয়া অথবা সে পথ হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা বা সে পথে চলাটা বন্ধ করে দেয়ার মাধ্যমে। এর মাধ্যমেই ইসলামী শাসন ব্যবস্থা একজন মানুষের চূড়ান্ত কল্যাণ লাভের তা অর্জনের পথকে নিশ্চিত করে। ইসলামী দর্শনের মৌলিক উদ্দেশ্যও হলো এই যে, সে সকল মানুষকে সকল ধরনের অকল্যাণ থেকে মুক্তি দিয়ে কল্যাণের সোনালি রাজপথে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে। এ কথাটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে রূপকের সাহায্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন–

অর্থাৎ, উক্ত উপমা দ্বারা বর্ণিত অবস্থাটি ঘটে উভয় জীবনে-জাগতিক ও পরকালীন উভয় জীবনের জন্যই এটি প্রযোজ্য। ইহকালীন জীবনে আঁধাররূপী সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতা জাহিলিয়াত ও তদসম্পর্কিত সকল ধরনের সংকীর্ণতা দুঃখ-কষ্ট, অপমান-গ্লানি ইত্যাদি হতে মুক্তি হয়ে হিদায়াতের স্বচ্ছ-স্পষ্ট ও প্রস্ফুটিত আলোকিত পথে পরিচালিত হবার সৌভাগ্য এবং পরকালীন জীবনে তার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সীমাহীন পুরস্কার! এ দু অবস্থা মিলিয়ে ঘটে উপরোল্লিখিত উপমাটির বাস্তব প্রতিফলন। এটি মহান রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার করুণা মানুষের প্রতি।

ইসলাম পরকালীন জীবনের কথা বলে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথেই বলে। তবে ইহকালীন এ জীবনকে উপেক্ষা করে না মোটেও। বরং যে কাজটি সে করে তাহালো জাগতিক এ জীবনের ক্ষণস্থায়ী সময়টুকুর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে শেখায়। এ জীবনের এ সময়টুকু হাসি-খেলায় অবহেলায় অপচয় না করে বরং

www.pathagar.com

যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে পরকালীন জীবনের জন্য পুঁজি সংগ্রহ করতে শেখায়। আমাদের প্রিয়নবী মোস্তফা (সা.) আমাদের যে দোয়া শিখিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নিকট চাইবার জন্য তার দিকে লক্ষ্য করুন–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا ـ الخ

অর্থাৎ, "হে আমাদের রব, আমাদেরকে এ পৃথিবীতে কল্যাণ দান করুন, আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের মুক্তি দিন (জাহান্নামের) ভয়াবহ আজাব হতে।" উল্লিখিত দোয়াটিতে ইহকালীন ও পারলৌকিক উভয় জীবনের কল্যাণ চাওয়ার সাথে সাথে কাঙ্ক্ষিত চূড়ান্ত কল্যাণ, যেটি পরকালীন জীবনে দোজখের আগুন হতে মুক্তি তাও চাওয়া হয়েছে। আর আমরা এ আলোচনার এক পর্যায়ে এ কথা বলেছি এই চূড়ান্ত কল্যাণটিই মানুষের জন্য প্রকৃত ও স্থায়ী কল্যাণ প্রকৃতমুক্তি। এখন প্রশ্ন হলো ইসলাম তথা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা মানুষের জন্য এ কল্যাণকে কীভাবে বাস্তবায়ন, রূপায়ণ করে? সে বিষয়টিই আমরা অতি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে দেখব ইনশাআল্লাহ!

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বা ইসলামী রাষ্ট্র মোট তিনটি পদ্ধতি বা পর্যায়ের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির কল্যাণকে নিশ্চিত করে। এ তিনটি পর্যায়ের প্রত্যেকটিরই মূল লক্ষ্য থাকে পরকালীন জীবনে মুক্তি পাওয়ার উপযোগী করে একজন ব্যক্তিকে গড়ে তোলা, তাকে পরিচালিত করা। কিন্তু এ পর্যায়সমূহের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে তার জাগতিক ও পার্থিব জীবনেও নেমে আসে এক অশ্রুপ্লুত পূর্ব কল্যাণ, সামাজিক, বৈষয়িক, আত্মিক ও বাহ্যিক তথা সার্বিক কল্যাণ। এই উভয়াবস্থা চলতে থাকে পাশাপাশি একে অপরের জুটি হিসেবে। পার্থিব ও জাগতিক কল্যাণের অবস্থাতো চোখে দেখা যায়, উপলব্ধিও করা যায়, কিন্তু পরকালীন কল্যাণের কথা, যথার্থতা নিশ্চিত করে কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। কারণ ব্যক্তির সকল কার্যক্রমের পেছনে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি (নিয়ত) কী ছিল, সেটিসহ অনেক বিষয় এমন আছে যার বিচার এক আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারে না। এমনকি জানতেও পারে না। ফলে পরকালীন জীবনে কোন ব্যক্তি চূড়ান্ত সফলতার মুখ দেখবে কিনা তা পরকালের বিচার সমাপন না হওয়া অব্দি কারো পক্ষে না বলা সম্ভব, আর না জানা সম্ভব। ইসলামী রাষ্ট্র শুধু একজনকে সে পথে পরিচালিত করতে বা সে পথে পরিচালিত হবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে এবং সত্য সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হওয়া হতে বিরত রাখতে পারে।

www.pathagar.com

যে তিনটি ক্রমপর্যায় দ্বারা ইসলামী দর্শন, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তির কল্যাণ (ইহকালীন ও পারলৌকিক)কে নিশ্চিত করে বা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালায় সেগুলো হল যথাক্রমে (১) চিন্তার পরিশুদ্ধি অথবা অন্য কথায় যথাযথ শিক্ষা, (২) নৈতিক সংশোধন ও প্রশিক্ষণ, (৩) সঠিক ব্যবস্থাপনা। এর প্রতিটিই পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ ও যুক্তিসহ বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে এ গ্রন্থের আকার হবে বিশাল। সঙ্গত কারণেই আমরা সংক্ষেপে উক্ত তিনটি অবস্থা পর্যালোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ চিন্তার পরিশুদ্ধি

বস্তুত এ কথাটি সকল মুসলমান নর-নারীই স্বীকার করবেন যে, সকল জ্ঞানের উৎস হলেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনিই হলেন জ্ঞানের একমাত্র মৌলিক উৎস। তাঁর নিকট হতেই মনুষ্য সমাজ জ্ঞান পেয়েছে তাঁরই মনোনীত ও নির্বাচিত নবী-রাসূলগণ এর মাধ্যমে। যাঁদের তিনি যুগে যুগে মানুষের মাঝে পাঠিয়েছেন যারা অজ্ঞানতা, অজ্ঞতার গহিন অন্ধকারে পথহারা হয়ে দিন কাটাত, যেন তাদের নিকট সে মহামানব নবী ও রাসূলগণ প্রকৃত সত্য জ্ঞানের পরিচয় তুলে ধরতে পারেন এবং তাঁরা সকলেই তাদের ওপরে অর্পিত এ দায়িত্ব পূর্ণসততা ও সচেতনতার সাথে পালন করেছেন। আর প্রকৃতপক্ষে তাঁদের দ্বারা মানব সমাজের কাছে যে জ্ঞান ও সত্য উপস্থাপিত হয়েছে তাই হলো প্রকৃত জ্ঞান, যথাযথ জ্ঞান।

ইসলাম শুধু তার শাসন ব্যবস্থাতেই নয় বরং প্রতিটি কর্মকাণ্ড প্রতিটি ক্ষেত্রে তা ব্যক্তি পর্যায়ে বা সামাজিক পর্যায়ে একক পর্যায়ে বা সামষ্টিক পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্র সংশোধনের জন্য একমাত্র সেই শিক্ষাকেই সংশোধন বা পরিশুদ্ধি বা গঠন পুনর্গঠনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। আর তাই ইসলাম মানুষের জন্য তথা প্রতিটি মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জন করাটাকে ঐচ্ছিক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ না রেখে তা প্রতিটি মুসলমান নারী-পুরুষ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। বিশ্বে বর্তমানে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও চিন্তা-চেতনায় জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্য হলো মান-সম্মান, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও অর্থ-বিত্ত লাভ। কিন্তু ইসলামী দর্শনে জ্ঞানার্জন এর উদ্দেশ্য এরকম বস্তুবাদী ও এতটা সংকীর্ণ নয় বরং ইসলামে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য হলো বাধ্যতামূলক এ নির্দেশটি পালন করে আহরিত জ্ঞানের দ্বারা উত্তম পদ্ধতিতে যথাসম্ভব সর্বোত্তম মানে এক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব করা। তাঁর আদেশ-নিষেধগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা, তিনি কিসে সন্তুষ্ট হন তা উপলব্ধি করে একমাত্র

www.pathagar.com

তাঁর সন্তুষ্টি আদায়ে তৎপর ও সচেষ্ট হওয়া। আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করা যেন তিনি সন্তুষ্ট হন। আমরা এক কথায় এটিকে এভাবে বলতে পারি যে, অন্য সকল কর্মকাণ্ডের ন্যায় সকল ইবাদাতের ন্যায় একজন মুসলমানের পক্ষে জ্ঞানার্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, সমাজে মান-সম্মান, অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা লাভ তার মূল উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য এ কথা বাস্তব সত্য যে জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর জ্ঞান ও জ্ঞানলব্ধ কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণের জন্য সমাজে মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ-বিত্ত সবই এক সময় পেয়ে যান। কিন্তু তাই বলে একজন মুসলমানের দৃষ্টির সম্মুখে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য হিসেবে সেসব নয় বরং একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যই থাকে।

জ্ঞানী ব্যক্তিকে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই সম্মান দিয়েছেন। তার জন্য বিরাট মর্যাদা নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহপাক স্বয়ং কালামে পাকে এরশাদ করেন–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা উভয়ে কী কখনো সমান হতে পারে?

অন্যত্র তিনি বলেন– اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ـ

অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানীরাই একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে চলেন। অপরদিকে রাসূলে মোস্তফা (সা.) তাঁর এক বাণীতে এরশাদ করেছেন–

"জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ।"

অন্যত্র তিনি বলেন– اُطْلُبُوا الْعِلْمَ لَوْكَانَ فِىْ الصِّيْنِ ـ

"জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন হলে সুদূর চীনে যাও।"

এরকম অসংখ্য নির্দেশনা রয়েছে কুরআন ও হাদীসে, এখানে যার উল্লেখ শুধুমাত্র এ গ্রন্থের কলেবরই বৃদ্ধি করবে। ইসলাম এই জ্ঞানকে (অহীর জ্ঞান) কল্যাণের উৎস বলে বিবেচনা করেছে। তাই কল্যাণকামী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য এই জ্ঞানছাড়া কল্যাণপ্রাপ্তি একেবারেই অসম্ভব। তাই ইসলামী রাষ্ট্র তথা ইসলামী শাসন ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় এই অহীর শিক্ষাসহ মানবতার জন্য প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। অন্তত ততটুকু তো বটেই যতটুকু অহীর শিক্ষা ব্যতিরেকে একজন মুসলমানের পক্ষে ইসলামী

www.pathagar.com

বিধি-বিধান পালন করা ও মেনে চলা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। ইসলামী রাষ্ট্রে সকল নাগরিককেই কুরআন-হাদীস ও অন্য আধুনিক বিষয়সহ কারিগরি বিষয়সমূহে এক একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলা হবে, ব্যাপারটি এমন নয় (এমনটি বলাও আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়, বরং আমি যে কথা বলতে চাই তাহলো ইসলামী রাষ্ট্র অবশ্যই সকল মুসলিম নাগরিকের জন্য ইসলামের মৌলিক জ্ঞান যথা প্রাত্যহিক জীবনে অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ইসলামী বিধি-বিধান শিক্ষা দেবার আয়োজন করবে, এটা বাধ্যতামূলক সবার জন্যই সর্বদা) ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্য হতে মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন উপযুক্ত লোকদের তাদের পছন্দনীয় ও রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় (অবশ্যই বৈধ)সমূহে উচ্চশিক্ষার ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরির ব্যাপারটি নিশ্চিত করবে। দীন (জীবন ব্যবস্থা) সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম রাষ্ট্র সকলপ্রকার নৈতিক ও বৈষয়িক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করবে এবং এসব জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধ লোকদের রাষ্ট্র যথাযথভাবে মূল্যায়ন করবে এবং তাদের নিকট থেকে মানবতার কল্যাণের জন্য সম্ভাব্য সকলপ্রকার খেদমত নেবে। দীন এর প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে বিশেষজ্ঞ তৈরির ব্যাপারে আমরা কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কর্তৃক সুস্পষ্ট ইশারা পাই। যেমন নিচের আয়াতটি দেখুন–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْآ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ـ (التوبه ـ ١٢٢)

অতঃপর তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্যে যারা স্বজাতিকে ভীতি প্রদর্শন করবে, যখন তারা প্রত্যাবর্তন করবে যেন তাদেরকে বাঁচাতে পারে। (সূরা আত্-তাওবা-১২২) কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দিকে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মমর্যাদাশীল একটি জাতি হিসেবে নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাকেও সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে সকলের জন্য অবারিত রাখবে, প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনায় এ সুযোগকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। জনকল্যাণমূলক একটি ইসলামী রাষ্ট্র একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার এই সুযোগকে অবৈতনিক ব্যয়মুক্ত করে রাখবে। ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো একজন ব্যক্তির চেতনায় আল্লাহকে জীবনের সকলক্ষেত্রে ভয় করে চলার অনুভূতি ও

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয়তাকে জাগ্রত করা। তাঁর অস্তিত্ব ও পরিচয় তাঁর ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করার পাশাপাশি ব্যক্তির নিজের দায়িত্ব- কর্তব্য ও অধিকার এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সাথে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। মোটকথা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক লক্ষ্য হলো একজন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনায় তাকওয়া ও আল্লাহভীতি জাগিয়ে তোলা। এ ব্যাপারে সুন্দর একটি ঘটনা মশহুর হয়ে আছে ইতিহাসে। কোনো এক বিখ্যাত বুযুর্গ শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের শিক্ষাদানে রত ছিলেন। দূর-দূরান্ত হতে তাঁর কাছে বহু ছাত্র আসত লেখাপড়া শেখার জন্য। আর তিনিও অত্যন্ত আগ্রহ ও যত্নের সাথে এসব ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। তাদের মনের মধ্যে শৈশব থেকেই আল্লাহভীতি ও তাকওয়া জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তিনি তাঁর ছাত্রদের মনের মধ্যে কতটুকু আল্লাহভীতি পয়দা হলো তাও পরীক্ষা করে দেখতেন। একবার তিনি এক ছাত্রের হাতে একটি পাখি অথবা মুরগি ধরিয়ে দিলেন। সাথে একটি অতি ধারালো ছুরিও এবং ছাত্রকে নির্দেশ দিলেন এটাকে এমন এক স্থানে নিয়ে যাবে যেখানে তুমি আর এই মুরগি ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই-এরপরে এটিকে জবাই করে পুনরায় আমার কাছে নিয়ে আসবে। ছাত্রটি নির্দেশমত ওস্তাদের হুকুম পালনে বেরিয়ে পড়ল। নির্জন মাঠে, নদীর কিনারে-ঝোঁপে, ঝাড়ে, লোকালয়ের বাইরে পাহাড়ের পাদদেশে বা গুহায় একে একে প্রতিটি স্থানেই সে উদ্যত হলো মুরগির গলায় ছুরি চালাতে কিন্তু প্রতিবারেই সে উপলব্ধি করছে যেকোনো মানুষপ্রাণী তাদের না দেখলেও এক আল্লাহ কিন্তু তাকে বা তাদের দেখছেন। কোনোভাবেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সে এড়িয়ে যেতে পারছেন না। সে কখনও একা হতে পারছে না অথচ ওস্তাদজী তাকে বলেছেন– এমন এক জায়গায় মুরগি বা পাখিটির গলায় ছুরি চালাতে- যেখানে তারা দু'জন ছাড়া আর তৃতীয়জন কেউ নেই। সারাটা দিন পরে শেষে ব্যর্থ হয়ে কচি-কিশোর ছাত্রটি মুরগিটিসহ ছুরিখানা নিয়ে ওস্তাদের সম্মুখে এসে হাজির। ওস্তাদজী মুরগি জবাই না করার কারণ জানতে চাইলে শিশু ছাত্রটি সব কথা অকপটে খুলে বলল, তার উপলব্ধির কথা যে, সে বহু চেষ্টা করেছে সারাটা দিন ধরে কিন্তু কোথায়ও সে আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে যেতে পারেনি। যেখানেই সে গেছে সেখানেই সে দেখেছে যে, মুরগি ও সে নিজে এই দুই প্রাণীর পাশাপাশি আরও একজন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তৃতীয়জন হিসেবে উপস্থিত আছেন। তাই সে ওস্তাদের হুকুম পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ছাত্রের মুখে এ অনুভূতির কথা শুনে ওস্তাদজী যারপর নাই খুশি হলেন ও

www.pathagar.com

ছাত্রকে প্রাণভরে দোয়া করলেন। বস্তুত চমৎকার এ ঘটনাটির মধ্যেই রয়েছে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক দর্শন।

ইসলামী রাষ্ট্র বা সমাজের আওতায় প্রতিটি নাগরিকের মনে মৌলিক এ অনুভূতিটুকু (তাকওয়া) থাকুক তা সে চায় এবং এ চাওয়াটুকু অর্জনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সবরকম প্রচেষ্টা সে চালায় এবং আয়োজন-আঞ্জাম দিয়ে থাকে। কারণ একজন মানুষ এর মনে যখন আল্লাহভীতি বা তাকওয়া জন্ম নেয় তখন তার সামনে কল্যাণের সকলদ্বার অবারিতভাবে উন্মুক্ত হয়ে যায়। শুধু পরকালীন বা আখিরাতের জীবনের কল্যাণই নয় বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তখন পার্থিব সকল ধরনের সুখ-শান্তি-প্রগতি ও কল্যাণের পথে ধাবিত হতে শুরু করে। তাকওয়াসম্পন্ন এসব নাগরিকদের মন হতে, তাদের ব্যক্তিচরিত্র হতে দোষ-ত্রুটিসমূহ অপসারিত হতে শুরু করে এবং এর পাশাপাশি তাদের ভেতরে যোগ্যতা ও সৎ গুণাবলির প্রস্ফুটন ঘটতে শুরু করে। আমরা কুরআনুল কারীমে এর সপক্ষে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সুস্পষ্ট ঘোষণা দেখতে পাই, সেখানে বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ـ (الانفال ـ ٢٩)

অর্থ: তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলো তবে তোমাদের ফুরকান (সত্য-মিথ্যা বোঝার মত জ্ঞান, ন্যায়-অন্যায় এর মধ্যে পার্থক্য করার মত ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ ও শানিত বিচারশক্তি) দেয়া হবে, তোমাদের দুর্বলতা ত্রুটিসমূহকে যোগ্যতায় রূপান্তরিত করে দেয়া হবে আর তোমাদের (অপরাধসমূহ) ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সূরা আনফাল-২৯)

নৈতিক শিক্ষা চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান এগুলো সরবরাহের পাশাপাশি এ শিক্ষা কীভাবে আত্মস্থ করতে হবে। কীভাবে তা নিজ ব্যক্তি চরিত্রে অঙ্গীভূত করতে বিকশিত করতে হবে, সে প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দুটোই চলেছে যুগপৎভাবে, একই সাথে-পাশাপাশি, বস্তুত একজন মুসলমানের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হচ্ছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য উন্মুক্ত ও নিবিষ্ট। যথাযথ শিক্ষা অর্জন তার আলোকে চরিত্র গঠন এবং এর পাশাপাশি নিজ ব্যক্তি চরিত্র ও বিশ্বাস হতে নেতিবাচক বিশ্বাস-শিক্ষা ও কর্মকাণ্ড দূরীভূত করতে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা নিরন্তর ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালু থাকে। এ প্রচেষ্টাকে একজন ব্যক্তির জন্য জিহাদ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে, এটা সবচেয়ে বড় জিহাদ।

www.pathagar.com

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা নির্দেশ শুধু বলে দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং সে শিক্ষাকে কীভাবে বাস্তবে পালন করে চলতে হবে সে বিষয়টিও হাতে-কলমে দেখিয়েছেন। তাঁর সম্মুখে কেউ কোন ভুল করলে বা করতে উদ্যত হলে তিনি তাকে অতি যত্নের সাথে শুধরে দিয়েছেন। নিচের ঘটনাটি একথারই সাক্ষ্য বহন করে।

অন্যত্র আর একটি ঘটনায় আমরা দেখতে পাই বিদায় হজ্জের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন তাঁরই চাচাত ভাই উঠতি বয়সের এক তরুণ হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রা.)। মাশয়ারে হারাম থেকে ফেরার পথে তিনি একই উটের পিঠে নবী (সা.)-এর পিছে ছিলেন। পথে মেয়েরা যাচ্ছিল। ফজল বিন আব্বাস (রা.) তাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন, নবী (সা.) তার মুখের উপরে হাত রাখলেন (মেয়েদের দেখার পথে বাধা সৃষ্টির জন্য– এবং তাঁর (হযরত ফজল (রা.)) এর মুখ অন্য দিকে সরিয়ে দিলেন।

ঐ একই দিনের অন্য একটি ঘটনায় আমরা দেখতে পাই খাস্‌আম গোত্রের এক মহিলা পথে রাসূল (সা.)কে থামিয়ে হজ্জ সম্পর্কে একটি বিধান জিজ্ঞেস করছিলেন, ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন, এ ক্ষেত্রেও নবী (সা.) তাঁর মুখ নিজ পবিত্র হাত দিয়ে ধরে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন।

ঐ দুটি ঘটনাই হলো আল-কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক মুমিন নর-নারীদের নিজ নিজ দৃষ্টিকে সংযত রাখতে বা হিফাযত রাখতে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা বাস্তবে মেনে চলার হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ।

ইসলামে কারো অগোচরে তার দুর্নাম করা বা দোষত্রুটি উল্লেখ করা সমালোচনা করা হারাম করা হয়েছে। গিবত নামক এ ত্রুটি সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ পাকই তাঁর কালাম মজিদে উল্লেখ করে নির্দেশ দিচ্ছেন এ ভাষায়–

অর্থাৎ, তোমরা একে অপরের গিবত করো না। তোমাদের কেউ কী তার মৃত ভাই-এর গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তা তোমরা ঘৃণাই করবে। (সূরা হুজুরাত-১২)

এই গিবত নামক ত্রুটিটি এতই সূক্ষ্মতার সাথে মানুষের চরিত্রে অনুপ্রবেশ ঘটায় যে, অতিমাত্রায় সচেতন না হলে, সদা-সর্বদা সাবধান না হলে এ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। মুসলমানদের সাবধান করা হয়েছে সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ দ্বারা আল-কুরআনে। (উল্লিখিত আয়াত দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাই যথেষ্ট বিবেচনা হয়নি। আল্লাহর রাসূল (সা.) সাহাবীগণকে এ ব্যাপারে তাঁর

www.pathagar.com

জীবদ্দশাতেই এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন যে, সম্মানিত সাহাবীগণ সুস্পষ্ট হারাম এ জঘন্য ত্রুটি হতে অতিসতর্কতার সাথে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বেঁচে থাকতে শিখেছিলেন। নিচের ঘটনাটি একবার দেখুন কী চমৎকারভাবে তিনি (সা.) এ প্রশিক্ষণ কর্মটি সমাপন করেছিলেন।

আরবদের মধ্যে পরস্পরের খিদমত করার একটি উত্তম রীতি প্রচলিত ছিল। এক সফরে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)-এর সাথে এক দরিদ্র খাদেম ছিল, সে সবসময় তাদের খিদমত করতো। গন্তব্যে পৌঁছে তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর সেও ঘুমিয়ে পড়লো, তাদের উভয়ের জন্য খাবার তৈরি না করে। তাঁরা উভয়ে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, এই ব্যাটা খুব ঘুমায়। তাঁরা তাকে ঘুম থেকে তুলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। সে তাঁর নিকট আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর ও ওমর (রা.) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং কিছু খাবার চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তারা উভয়ে আহার করেছে এবং তৃপ্ত হয়েছে। তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আজ কী খেয়েছি? তিনি বলেন : তোমরা আজ ঐ খাদেমের গোশত খেয়েছ এবং আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা উভয়ে এ কথা শুনে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ত্রুটি মাফ করুন এবং আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহর ক্ষমাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না, খাদেম যেন তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। (দ্রষ্টব্য গিবত সম্পাদনা ও প্রকাশনা আহসান পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা-১৮)

এভাবে ঐ একই বিষয়ে তিনি মদীনার জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেন : আমি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত কেউ যেন ইফতার না করে। লোকজন রোযা রাখলো। সন্ধ্যা হলে তারা একে একে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে থাকে এবং ইফতার করার অনুমতি চাইতে থাকে, তিনিও অনুমতি দিতে থাকেন। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুজন স্ত্রীলোকও রোযা রেখেছে, অনুমতি হলে তারাও ইফতার করবে। তিনি নিজের মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বলেন : তারা রোযা রাখেনি। যারা দিনভর মানুষের গোশত খায়, তাদের রোযা হয় কীভাবে! তুমি গিয়ে তাদের বলো, তোমরা রোযা থেকে থাকলে বমি করো।

www.pathagar.com

লোকটি তাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম শোনালে তারা বমি করলো এবং তাদের মুখ থেকে জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ড বের হলো। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে তাকে ঘটনা অবহিত করে। তিনি বলেন : সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! এই রক্তপিণ্ড তাদের পেটের মধ্য থেকে গেলে দোযখ তাদের গ্রাস করতো। অপর বর্ণনায় আছে যে, তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলে লোকটি পুনরায় এসে বললো, তারা দুজন মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌঁছে গেছে। তিনি বলেন : তাদের এখানে ডেকে নিয়ে এসো। তারা উপস্থিত হলে তিনি একটি বড়পাত্র আনিয়ে তাদের একজনকে পাত্রের মধ্যে বমি করতে বলেন। সে রক্তপুঁজ বমি করলো এবং তাতে পাত্র ভরে গেল। তিনি অপর নারীকেও বমি করতে বলেন। সেও একইরূপ বমি করলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তাআলা যে জিনিস হালাল করেছেন, এরা তা পানাহার করে রোযা রেখেছিল। কিন্তু তিনি যে জিনিস হারাম করেছেন তা দিয়ে তারা ইফতার করেছে। এরা দু'জন একত্রে বসে মানুষের গোশত খেয়েছে (গিবত করেছে)। (সূত্র : পূর্বোক্ত -পৃষ্ঠা-৭৯)

এভাবে আরও একটি ঘটনাতেও আমরা নবী (সা.) কর্তৃক মুসলমানদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের এক অতিউত্তম নমুনা দেখতে পাই আর এ ঘটনাটি আমাদের নিকট অতি পরিচিত, যা প্রায় প্রতিটি মুসলমানেরই জানা। একবার মদীনার বাইরের এক দরিদ্র মুসলমান পুরুষ এলেন মদীনায় মানবতার মুক্তির দূত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ভিক্ষার জন্য। অথচ মুসলমানদের ভিক্ষাবৃত্তি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। মানুষ যেন অলস জীবনযাপন না করে, আয় রোজগারের সযত্ন প্রয়াস চালু রাখে। সে জন্য স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল-কারীমে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়ে বলছেন–

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ (الجمعة ـ ١٠)

অর্থ : নামায শেষে তোমরা ছড়িয়ে পড়ো জমিনে এবং তাতে অন্বেষণ করো আল্লাহর অনুগ্রহ,ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল কাম হও। (সূরা জু'মআ-১০)

আল্লাহর রাসূল (সা.) ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছেন, বলেছেন– "নিচের হাত অপেক্ষা উপরের হাত উত্তম" সেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট যখন কেউ একজন ভিক্ষাবৃত্তির জন্য এলো, আল্লাহর রাসূল তাকে ভিক্ষার কারণ

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন জীবিকা-নির্বাহের মত তার না আছে কোন উপার্জনের পথ, আর না আছে কোন সম্পদ-সম্বল। নিরুপায় হয়েই সে ভিক্ষাবৃত্তিতে নেমেছে। প্রশ্নের উত্তরে লোকটি এ কথাও বলল যে, তার একমাত্র সম্পদ হলো পুরনো একটি কম্বল, যা সে নিজ ব্যবহারের কাজে লাগায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) সেই কম্বলটি আনতে বললেন, বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে একটি কুঠার কিনে তার হাতে দিয়ে বললেন, এ দিয়ে কাজ করে খাও, ভিক্ষা করো না। লোকটি জঙ্গল হতে উক্ত কুড়াল দিয়ে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রি করতে লাগল। নিজের প্রয়োজন সচ্ছলভাবেই মিটতে লাগল তার, এই নতুন পেশার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দ্বারা। ফলে ভিক্ষাবৃত্তির অভিশাপ হতে সে চিরতরে মুক্তি পেল। এভাবেই তাঁর সারা জীবনে হাজারো ঘটনা এমন আছে যার দ্বারা এ তথ্য প্রমাণিত হয় যে, তিনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যুগপৎভাবে চালিয়েছেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের একটি কেন্দ্রীয় সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত কাঠামোর আওতায় ঐক্যবদ্ধ করা হয়। তাদের জন্য ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন করাটা হলো বাধ্যতামূলক, আর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা নিষিদ্ধ অর্থাৎ ইসলামী শরীয়ত এর পরিভাষায় প্রথমটি হলো ফরয আর দ্বিতীয়টি হলো হারাম। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিচ্ছেন।

অর্থাৎ, তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করো এবং পরস্পর পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে-ইমরান-১০২)

উক্ত আয়াতটিতে ঐক্যবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ হবার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার কেন্দ্রীয় সূত্র হলো আল-কুরআন, যাকে প্রতীকী অর্থে আল্লাহর রজ্জু বা রশি অর্থে অভিহিত করা হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই আল-কুরআনকেই সংবিধান হিসেবে মেনে নিয়ে তার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ও পূর্ণ আনুগত্যের ঘোষণা এবং যথাযথ অনুসরণের চেতনা নিয়েই জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। ইসলামী রাষ্ট্র এ ধরনের ঐক্য গড়ে তোলার জন্য সকল ধরনের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি, সংহত ও তা পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে রক্ষা করে। এর পাশাপাশি জীবনের সকল ক্ষেত্রকে ইসলাম কী ধরনের কাজে এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে পারস্পরিক যোগসূত্রে জড়িত করে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে রূপ দেয়। এটিকেই আমরা সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বলে চিহ্নিত করেছি।

www.pathagar.com

সর্বকালের সর্বযুগের জন্য আদর্শ মডেল ও অনুসরণীয় ইসলামী রাষ্ট্র ছিল মদীনার সেই রাষ্ট্রটি যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.)। তিনি মদীনায় এ রাষ্ট্রটির প্রশাসনিক অবকাঠামো মোট তিনটি স্তরে গড়ে তোলেন। এগুলো ছিল কেন্দ্রীয় প্রশাসন, প্রাদেশিক প্রশাসন ও আঞ্চলিক প্রশাসন। তিনি প্রদেশসমূহে গভর্নর নিয়োগ করতেন-যেমন তিনি ইয়েমেন প্রদেশে হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)কে নাযরান এ হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন।

তিনি (সা.) তাঁর প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল নিয়োগ করতেন, যেমন তিনি রাষ্ট্রীয় হিসাব সংরক্ষণ বিভাগে (বর্তমানকালের অর্থ মন্ত্রণালয়) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মুয়ানকীব বিন আবি ফাতিমা (রা.)কে স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিভাগের দায়িত্বে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.), বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীসমূহের সাথে যোগসূত্র রক্ষা (বর্তমানকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) বিভাগে হযরত মুগীরা বিন শোবা (রা.) ও হুসায়েন বিন নুমীর (রা.) নিযুক্ত করেন। একইভাবে তিনি ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারকও নিয়োগ করতেন।

www.pathagar.com

এ দৃষ্টান্তকে সম্মুখে রেখে জাতি ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ইসলামী রাষ্ট্রও একইভাবে প্রশাসনকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যায়। দেশের প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলেও প্রশাসনের সকল দায়িত্ব ও সুবিধাদি উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়ে থাকে যেন জনগণ যতটা সম্ভব নিজ নিজ অবস্থানে অবস্থান করেই সকল রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক সুবিধাদি পাবার পাশাপাশি রাষ্ট্র-প্রশাসন ও সমাজ পরিচালনায় তাদের যে নাগরিক ও সামাজিক কর্তব্য রয়েছে তাও তারা যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারেন। এ প্রশাসন শুধুমাত্র জনগণের ওপর রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্বকেই প্রতিষ্ঠিত ও প্রয়োগ করে না বরং এর সাথে সাথে জনগণকে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে যখন যেখানে প্রয়োজন সম্পৃক্ত করে নেয়, তাদের অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত, সহজ সাধ্য ও নিশ্চিত করে। কারণ ইসলামী সমাজ কায়িম করা ও তা কায়িম রাখা প্রতিটি মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব যেমনি, তেমনি ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি মুসলমানের এর সাথে আদর্শিক সম্পৃক্ততা জরুরি। এটি এক দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় ব্যক্তির জন্মলগ্ন হতেই, তার পারিবারিক পরিবেশ হতে তথা পরিবার হতে।

পরিবার : ইসলামী দর্শনে যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবার কাঠামোর চেতনা একটি মুসলিম পরিবার তা হতে কোনোমতেই বিচ্ছিন্ন তো নয়ই বরং ইসলামে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটির সূচনাই হয় পরিবার হতে। ইসলামে পরিবারও একটি প্রতিষ্ঠান এ মৌলিক বিষয়টিকে দৃষ্টিতে রেখে আপনি যদি ইসলামী দর্শনে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন ও তাকে সংহতকরণ বা সংরক্ষণের যে সূক্ষ্ম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি তা ধৈর্যের সাথে পর্যবেক্ষণ করেন তা হলে এ কথা আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মানতে বাধ্য যে, ইসলামী দর্শনে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটি বড়ই চমৎকার, একজন মানুষ জন্ম হতেই ছোটবড় কোনো না কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে অঙ্গীভূত হতে বাধ্য। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আওতায় পারিবারিক জীবন রীতি, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনযাপন পদ্ধতি এমন যে একজন মানুষ তার জীবনের প্রতিটি স্তর, শৈশব হতে মৃত্যু পর্যন্ত একটি অতি সুশৃঙ্খল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়। উন্নত শিক্ষা ও দর্শনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটি মৌলিকভাবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করে থাকে। প্রথমটি হলো এ উন্নত দর্শনের ছাঁচে শৈশব হতেই ব্যক্তিকে গড়ে তোলে আদর্শবাহী হিসেবে আর দ্বিতীয় কাজটি হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যেকোনো দিক থেকে শিক্ষা-দর্শন ও সাংস্কৃতিক যেকোনো দিক হতে আগ্রাসনের হাত হতে রক্ষা করে। মুক্তচিন্তা, স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারী অধিকার ও নারী স্বাধীনতা প্রগতিশীলতা

www.pathagar.com

ইত্যাদি চটকদার সব আধুনিক মতবাদ ও কার্যক্রমের বিধ্বংসী পরিণতিতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যসহ প্রায় সমগ্র বিশ্বেই এক সর্বগ্রাসী সয়লাবে মানবসমাজের এই মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ধস নেমেছে। বিশেষ করে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশে সমাজে পরিবার প্রথা ভেঙে যাওয়াতে তারা আজ দিশেহারা জৈবিক চাহিদা মেটাতে ব্যভিচারের আশ্রয় নিচ্ছে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে সমাজে জারজ সন্তানের সংখ্যাধিক্য এবং এসব সন্তান ও তাদের 'মা' উভয়ের কারোরই অভিভাবকত্ব না থাকা, কোনো মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অস্তিত্ব না থাকা, পারিবারিক ছত্রছায়া না থাকা এবং নীতি ও অনুশাসনের অনুপস্থিতিতে সেসব সমাজে মর্মান্তিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। 'রক' আর 'পপ' এর উদ্দামতার আড়ালে আর কিছু নয় বরং রয়েছে হতাশা-গ্লানি আর ক্ষোভ মিশ্রিত চাপা কান্না। কিন্তু অপরদিকে এত কিছুর মধ্যেও আজও মুসলিম বিশ্বে এই পারিবারিক কাঠামো, মানবসমাজের এই মৌলিক ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বে স্থান- কাল-পাত্র নির্বিশেষে প্রতিটি বিবেকবান নর-নারীই নিজেদের এই সর্বগ্রাসী দুরবস্থার পাশাপাশি ইসলামী সমাজে বা মুসলমানদের মধ্যে এ প্রতিষ্ঠানটির অক্ষুণ্নতা উপলব্ধি করে, উপস্থিতি দেখতে পায় তারা তখন অবাক বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। এ রকম একটি ঘটনার সাক্ষী স্বয়ং আমি নিজেই। মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে কর্মরত এক ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার যার দু কন্যাসহ স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে অর্থাৎ সে নিজেই এরকম একটি পরিস্থিতির শিকার। তার সাথে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল কুয়েতস্থ ইসলাম প্রেজেন্টেশন কমিটির অফিস কক্ষে। ভদ্রলোক সেদিনই আলোচনা পর্বের সামান্যপূর্বে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। ইসলামের কোন বিষয়টি তাকে এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছে? আমার এ প্রশ্নের জবাবে ভদ্রলোক তার হাহাকার ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে সমস্ত আবেগ মাখানো ও বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে আমাকে উত্তর দিয়েছিলেন– ইসলামে এই অটুট পারিবারিক বন্ধন (Strong Family Bond) তাকে আকৃষ্ট করেছিল এবং তিনি তা ব্যাখ্যাও করেছিলেন সবিস্তারে। বস্তুত এটা প্রমাণিত সত্য যে, মানুষ তার শৈশব হতেই যে পরিবেশে বসবাস করে সেই পরিবেশই তাকে একজন ভালো বা মন্দ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। পরিবেশ যদি হয় দয়া-মায়া, ত্যাগ-তিতিক্ষা, স্নেহ-ভালোবাসা, শাসন-অনুশাসন বর্জিত তবে, সে রকম পরিবেশে লালিত সন্তানও ছোটবেলা হতেই উচ্ছৃঙ্খল দুশ্চরিত্রসম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠে। পরিণত বয়সে সেই সন্তানই তো সমাজে চোর, ডাকাত, ধর্ষক, কুখ্যাত সন্ত্রাসী আর প্রবঞ্চক হয়ে আবির্ভূত হয়। সমাজ তথা রাষ্ট্রের শান্তি নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে। মানবতার জন্য হয়ে দাঁড়ায় অভিশাপ এবং সকলপ্রকার অকল্যাণের উৎস, সমাজ বা রাষ্ট্রের যেখানেই তাকে স্থাপন করুন না কেন সেখান হতেই সে ধ্বংস

www.pathagar.com

আর বিপর্যয়ের সূত্রপাত করবে। পক্ষান্তরে কোনো মানব সন্তান যদি শৈশব হতেই সঠিক শিক্ষা নির্দেশনা, দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালোবাসা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, শাসন-অনুশাসনে ভরপুর পরিবেশে বেড়ে ওঠে তবে নিশ্চিতভাবেই সে সন্তান একজন সৎ-চরিত্রসম্পন্ন আদর্শবান ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠবে। সমাজ দেশ তথা রাষ্ট্রের যেকোনো স্থানেই তাকে স্থাপন করা হোক না কেন, সে হবে সমগ্রভাবে মানবতার জন্য কল্যাণকর এক উৎস একটি মহত্তম উপাদান। সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতার একটি স্তম্ভ। প্রতিটি সুস্থ মানব সন্তানই এ ধরনের দুর্লভ কিন্তু মৌলিক মানবীয় গুণাবলি লাভ করতে পারে একেবারে জন্মলগ্ন হতেই, যদি সে অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ পায়। আর কোনো সন্তান যদি তার শৈশব ও কৈশোর এর নাজুক সময়টিতে পারিবারিক পরিবেশই না পায়। তা হলে তার জীবনে আর সে পেল কী? তার সকল অকল্যাণের সূত্রপাত তো হলো তার জন্মলগ্ন হতেই। এ শিশু সমাজ থেকে কী নেবে কী দেবে পরিণত বয়সে। দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালোবাসা বঞ্চিত এ শিশু মানবতাকে কী উপহার দেবে? মানবতা তার নিকট হতে কোন কল্যাণটুকু আশা করতে পারে? যে নিজে কোনো কল্যাণের স্বাদ আস্বাদন করেনি তার কাছ হতে কেউ কী কল্যাণ আশা করতে পারে? এ কথাতো একেবারে সাধারণ বিচারেই বোধগম্য যে, একজন মানব সন্তানের চরিত্রে মন ও মননে মানবীয় সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকাশ, লালন, প্রস্ফুটন এবং প্রাথমিক কিন্তু মৌলিক প্রশিক্ষণ এর সূত্রপাত হয়ে থাকে। তার দোলনা হতে, তার পারিবারিক অঙ্গন হতে, মানব জীবনের অস্তিত্বের সুস্থতা ও অক্ষুণ্নতা নির্ভর করে সুষ্ঠু পরিবার ব্যবস্থার ওপর। পৃথিবীর অনেক দর্শন ও মতবাদ আধুনিকতার নামে পরিবার ব্যবস্থাকে ভেঙেছে অথবা একেবারে ভাঙনের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে কিন্তু ইসলাম ঠিক তার বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিয়েছে তার শুরু হতেই। বিগত দেড়হাজার বছর ধরে মুসলিম সমাজে অনেক ধস নেমেছে, মূল্যবোধে শিথিলতা এসেছে, সামাজিক বিবর্তন হয়েছে, অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা ঠাঁই করে নিয়েছে। সমাজের গভীরে। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচারেও ব্যাপক নেতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে কিন্তু এত কিছুর পরেও এই মুসলিম সমাজে আর যা-ই হোক তা পারিবারিক ব্যবস্থাটি বহাল তবিয়তে টিকে আছে। মুসলিম সমাজে পারিবারিক ব্যবস্থাটি আজো সামাজিক একটি মৌলিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে টিকে থাকার কারণেই বিশ্ব আজ নতুন করে ইসলামী পুনর্জাগরণের ভয়ে ভীত। এ যেন সেই গাছটির মত যার সকল ডাল-পালা শুকিয়ে গেলেও মূল শেকড়টি তাজা থাকার কারণে পুনরায় তা ফুলে-ফলে শোভিত হয়ে ওঠছে। এ কথা আজ অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, এই পরিবার ব্যবস্থার অক্ষুণ্নতা-ই আজো ইসলামকে এ বিশ্বে টিকেয়ে রেখেছে।

www.pathagar.com

ইসলামী দর্শনে পরিবার ও পারিবারিক জীবনের যে গুরুত্ব যে মর্যাদা এবং পারিবারিক বন্ধন ও সম্পর্ককে অটুট রাখার যে মৌলিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে সেটিই মূলত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর মহাকুশলী সত্তার পরিচয় ও সাক্ষ্য বহন করে।

পরিবার হলো ইসলামী জীবনব্যবস্থার আওতায় সবচেয়ে মৌলিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। এখান হতেই একজন মানব সন্তানের সংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জীবনধারার সূত্রপাত হয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় এর বিধানাবলির প্রতি গভীর পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টি দিলে দেখতে পাবেন পরিবার ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রাখতে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

একজন নর ও একজন নারীর স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি ও বৈধ শরয়ী পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পাদনের মাধ্যমে জোটবদ্ধতা শুরু হয়। সেই জোটবদ্ধ জুটি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে জীবনের স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়ায় একে একে মুক্ত হতে থাকে সন্তান, পুত্র-কন্যা। জোটবদ্ধ প্রথম যে দুটি নর-নারী নিয়ে পরিবার নামক ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়েছিল, ক্রমে তার সদস্য-সদস্যা সংখ্যা বেড়ে চলে, সেই নর-নারী, তারা হয়ে গেল বাবা-মা, একদিন এই তারাই হল শ্বশুর-শাশুড়ি এবং সময়ের বিবর্তনে আরও পরে এসে সেই নর-নারী দুটি পরিণত হলো দাদা-দাদি, নানা-নানীতে। পরিবারের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ প্রাচীন দুজন সদস্য-সদস্যার। এভাবে স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি এদের নিয়েই গড়ে ওঠে পরিবার, ছোট বা বড় পরিবার। এই পরিবারই হলো একটি সমাজের মৌলিক একক। একে ঘিরেই গড়ে ওঠে সমাজ। কিছু ইসলামী পরিবারকে ঘিরে গড়ে ওঠে ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্র। মৌলিক এই ভিত্তিটি প্রতিষ্ঠিত না হলে- না ইসলামী সমাজ কায়িম করা যায় আর না প্রতিষ্ঠা করা যায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা। তাই পরিবারের গঠন অক্ষুণ্ন রাখতে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

একজোড়া নর ও নারীর মধ্যে বিবাহবন্ধন ছাড়া পরিবার গঠনের প্রক্রিয়াটাই শুরু হয় না। তাই ইসলামে বিবাহ করাটাকে ইবাদাত এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– "তোমরা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও যেন তোমরা সংখ্যায় অধিক হতে পারো। নিশ্চয় আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য হেতু অন্যান্য নবীর উম্মতের ওপর গর্ব করব। এমনকি সেই শিশুর কারণেও গর্ব করব যে শিশু মাতৃউদর হতে গর্ভভ্রষ্ট হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়।"

কুরআনুল-কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের আচ্ছাদন হিসেবে তুলনা করেছেন। যা সর্বদা নিজ শরীরের সাথে লেগে থাকে

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্ন হয় না। যা ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করে শীত-গ্রীষ্ম হতে রক্ষা করে কুরআনের ভাষায়–

অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের লেবাস এবং তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণের লেবাস। (সূরা আল-বাকারা-১৮৭)

বিবাহ করাটা নবী মোস্তফা (সা.)-এর একটি সুন্নাত। বিবাহকে অস্বীকার করা মানেই হলো নবীজির সুন্নাতকে অস্বীকার করা। প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাযযালী (রহ.) বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেছেন– "বিবাহ দীন ঈমান রক্ষার প্রাচীরস্বরূপ, কাম আসক্তি শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র, বিবাহের মাধ্যমে সে অনিষ্টকর অস্ত্রের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার পথ হয়"। অন্যত্র তিনি বলেন "পুণ্যশীলা স্ত্রীলোক দুনিয়ার মাপকাঠিতে খাটো হলেও আখিরাতের সর্বোত্তম সম্পদ।"

একবার হযরত ওমর (রা.)-এর এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলে পাক (সা.) বলেছেন– তোমাদের গ্রহণ করা উচিত (১) জিকরকারী রসনা, (২) কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হৃদয় এবং (৩) ঈমানদার স্ত্রী। অন্যত্র তিনি বলেছেন, "পৃথিবীতে বহু অমূল্য সম্পদ রয়েছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো ধর্মপরায়ণ স্ত্রী।"

লক্ষ করুন, ঘর নয়, বাড়ি-প্রাসাদ নয়, হীরা-জহরত ও কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স নয়, দামি-চাকরি নয় বরং পৃথিবীতে একজন পুরুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো ঈমানদার স্ত্রী। বাস্তবিকই একটি চমকপ্রদ ঘোষণা, একটা ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা। এক ইসলাম ছাড়া এ বিশ্বে অন্য কোনো দর্শনে এ ধরনের শিক্ষা দেয়া হয়নি। ইসলাম এভাবেই স্ত্রী গ্রহণের জন্য তথা বিবাহ সম্পাদনের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করেছে। ভালোবাসা দেয়া বা ভালোবাসা পাওয়া এ উভয়টিই মানুষের একটি প্রকৃতিগত চাহিদা, একটি গুণ, মানবীয় সত্তার অবিচ্ছেদ্য ও মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক এবং জৈবিক চাহিদা বিশ্বের প্রতিটি সমাজে প্রতিটি মানুষের মধ্যে জীবনের প্রতিটি স্তরে শৈশব হতে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এই ভালোবাসা পাওয়া ও ভালোবাসা দেওয়া উভয়টির জন্য বিবাহই হলো সর্বোত্তম মাধ্যম। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজেই এ কথাটি বলেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন যে, পারস্পরিক ভালোবাসার জন্য বিবাহের চেয়ে উত্তম অন্য কিছু তুমি দেখবে না। (ইবনে মাজা)

স্ত্রী শুধু ভোগ-উপভোগের সামগ্রী নয়– বরং স্ত্রী হলো জীবনের অবিচ্ছেদ্য

www.pathagar.com

একটি অংশ, তা আমরা ইতোপূর্বে আল-কুরআন হতে আয়াত চয়ন করে দেখেছি। স্ত্রীর প্রতি তথা পরিবারের প্রতি সদাচারণ ও যত্নবান হবার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে বারবার তাগাদা দেয়া হয়েছে ইসলামে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, সামান্য এক ঢোক পানিও যদি স্বামীরা স্ত্রীদের পান করায় তাহলে আল্লাহপাক তার বিনিময়ে তাকে (স্বামীকে) পুরস্কৃত করবেন।

অন্যত্র আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন-

"হযরত আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি সওয়াবের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য অর্থ-সম্পদ খরচ করলে তা তার জন্য সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হয়।" (সহীহ আল-বোখারী)

অন্যত্র তিনি (সা.) বলেছেন-

তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, যারা আপন স্ত্রীর নিকট শ্রেষ্ঠ, এই একই প্রসঙ্গে পুনরায় তিনি বলেছেন-

তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে আপন স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করে, তোমাদের সকল অপেক্ষা আমি আমার স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে থাকি।

মানুষ যেন তার স্ত্রীসহ পরিবার-পরিজনকে বোঝা মনে না করে বরং এগুলো তার জন্য সম্পদ ভাবে, তার প্রতি তার আচরণ ও তাদের জন্য তার সকল প্রচেষ্টা ও ত্যাগ যে বৃথা যাবে না এগুলোও যে তার জন্য উত্তম প্রতিদানপ্রাপ্তির এক অতি বর্ণাঢ্য উপলক্ষ হবে- তা তিনি (সা.) নিশ্চিত করেই বলেছেন। তাঁর (সা.) কর্তৃক নিম্নবর্ণিত হাদীসটি দেখুন–

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মানুষের আমলের দাঁড়িপাল্লায় সর্বপ্রথম যে আমল রাখা হবে, তা হবে তার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের ব্যয়রূপী সৎকর্ম। (তিবরানী)

লক্ষ করুন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার এই মৌলিক ভিত্তি (পরিবার)টিকে অক্ষত রাখতে কী ধরনের সর্বোচ্চ মানের গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, যেন একটি সুখী ও আদর্শ সমাজ গঠনের মৌলিক এ ভিত্তিটুকু ধসে না যায়। কারণ মৌলিক এ ভিতটুকু ধসে গেলে পুরো সমাজ ব্যবস্থাটিই ধসে পড়তে বাধ্য, ফলে এ কথাটি স্পষ্টতই বোধগম্য যে, মৌলিক এই ভিত্তিটিকে টিকিয়ে রাখাটা হলো ইসলামী দর্শনের নিকট সর্বাপেক্ষা জরুরি একটি বিষয়। এ ব্যাপারে বারবার রাসূলে কারীম (সা.) মুসলমানদের সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

"যথোপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত খেলাচ্ছলে স্ত্রীদের তালাক দিও না কেননা আল্লাহতাআলা দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে যাচ্ছেতাইকারী নারী-পুরুষকে ভালোবাসেন না।" (তিবরানী)

www.pathagar.com

অন্যত্র আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন–

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের বিভিন্ন রকম কষ্টদান ও উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে গৃহে আটক করে রেখ না। যে স্বামী এরূপ করবে সে নিজের ওপরেই জুলুম করবে। তোমরা আল্লাহপাকের আয়াতসমূহকে খেলনায় পরিণত করো না।"

গৃহকর্তা পুরুষ যেন তার আয়-উপার্জন, তার অর্থ-সম্পদ পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য সন্তুষ্টচিত্তে, দ্বিধাহীন মনে ব্যয় করে সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। যেমন দেখুন তাঁর একটি বাণী–

"যদি কোনো ব্যক্তি একটি স্বর্ণমুদ্রা জিহাদে ব্যয়ের জন্য দান করে, আর একটি মুদ্রার বিনিময়ে দাস ক্রয় করে মুক্ত করে, আর একটি মুদ্রা কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করে, আর একটি মুদ্রা স্বীয় স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করে তবে এই শেষোক্ত মুদ্রাটির সওয়াব সর্বাপেক্ষা বেশি হবে।"

অন্যদিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে নির্দেশ দিচ্ছেন-

অর্থাৎ তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। (সূরা নিসা-৩৬)

যে পিতা-মাতাকে কেন্দ্র করে একটি পরিবার গড়ে ওঠে, মানবজীবন আবর্তিত হয় আর মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটে সেই বাবা-মা'র প্রতি সদাচারী হবার নির্দেশ মূলত পারিবারিকভিত্তিকে মজবুত ও অটুট করারই প্রয়াস। কুরআনুল কারীমে অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা লোকমানে এরশাদ করেছেন–

অর্থাৎ তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে রেখেছেন এবং দুধপান করিয়েছেন দুবছর। অতএব আমি নির্দেশ দিচ্ছি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার (উভয়ের) প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিজন সকলের ইহলৌকিক-পারলৌকিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হবার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্দেশ দিচ্ছেন এভাবে-

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারের লোকজনকে দোযখের আগুন হতে রক্ষা করো।

আর আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন– তাঁর এক বাণীতে–

হযরত আইউব ইবনে মূসা, তিনি তাঁর পিতার নিকট হতে এবং পিতা তাঁর দাদার নিকট হতে বর্ণনা করেন– "রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন, কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার চাইতে আর মূল্যবান কোনো কিছু উপহার দিতে পারে না। (তিরমিযী) পিতার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার

www.pathagar.com

অসন্তুষ্টিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি হিসেবে এবং মা এর পদতলে তাদের বেহেশত অবস্থিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু এই কারণেই যে সন্তান-সন্ততিগণ যেন বাবা-মার প্রতি দায়িত্ব পালনকারী হয়ে গড়ে ওঠে, তাদের সুখে-দুঃখে তাদের সাথে হয়ে রয় শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসায়, যেন আজকের পশ্চিমা বিশ্বের মত সন্তান সন্ততিরা পিতা-মাতা হতে স্বাধীন হতে যেয়ে, স্বনির্ভর হতে যেয়ে পারিবারিক কাঠামোকে ধ্বংস করে না ফেলে। ইসলামী দর্শনে এমনকি কোনো সামান্যতম মত-পার্থক্য হোক বা বড় কোনো ধরনের ভুল বোঝাবুঝি, দ্বিমত তৈরি হোক কোনো অবস্থাতেই তাদের নিকট হতে পৃথক হওয়া যাবে না। এমনকি তাদের কারো প্রতি খারাপ ধারণাও পোষণ করার অনুমতি নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, 'পিতৃপুরুষ তথা মুরব্বিদের প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করো না, কারণ যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করল সে যেন ইসলামকেই অস্বীকার করল।" (বোখারী)

আল-কুরআনুল কারীমে তো আল্লাহপাক বলেই দিয়েছেন, বাবা-মা সন্তানের প্রতি যে আচরণই করুক না কেন সন্তান বাবা-মার আচরণের প্রতিবাদ তো দূরে থাকুক তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা বা বিরক্ত হয়ে 'উহ' শব্দটিও উচ্চারণ করতে পারবে না। (সূরা বনি ইসরাঈল)

এ দীর্ঘ আলোচনা হতে এ কথা আশাকরি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলাম মনুষ্য সমাজে পরিবার গঠনের প্রতি এবং সে পরিবারকে সংহত করার পাশাপাশি পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যাদের পারস্পরিক সদাচারণ-দায়িত্ব পালনকে নিছক লোকাচার হিসেবে বিবেচনা করে না বরং এটি হলো ইসলামী দর্শনে ইবাদাত, যা প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় ইসলামী সরকার পারিবারিক বন্ধনকে এর মূল দর্শন ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখে তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে, কারণ প্রতিটি মানুষের কল্যাণের সূচনা-ই হয়ে থাকে তার পরিবার হতে। একটি জনকল্যাণমূলক শাসন, জনকল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় আদৌ যদি না পরিবারসমূহকে কল্যাণ এর আধার হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে সূচনাটি হয়ে থাকে তা হয়ে থাকে কল্যাণকর পরিবার হতে। আর এই পরিবার হলো ইসলামের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রথম ধাপ। এর পরবর্তী পর্যায় হলো একটি সুষ্ঠু ও কল্যাণকর সামাজিক অবকাঠামো আর আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়ও সেটি-ই। আর এটিতো সহজেই বোধগম্য যে অনেকগুলো কল্যাণকর পরিবার নিয়েই একটি কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। কল্যাণ এর চেতনা পরিবার এর ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সূচনা হয়ে ক্রমশ বৃহত্তর পরিমণ্ডল সমাজে ছড়িয়ে পড়ে বিস্তৃত হয়।

www.pathagar.com

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

সুসংহত ও কল্যাণকর সামাজিক অবকাঠামো

রাসূলে পাক (সা.) যখন মদীনায় হিযরত করলেন, তাঁর পূর্বে তাঁরই নির্দেশে অন্য সম্মানিত সাহাবীগণও মদীনায় হিযরত করেছিলেন। আর মদীনায় স্থানীয় নও মুসলিমগণ তাদের সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। এখানে স্পষ্টতই দুটি গোষ্ঠী, একটি হলো মদীনার পূর্ব হতে বসবাসরত জনগোষ্ঠী যাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর রিসালাত-দাওয়াত ও আল্লাহর তাওহীদের ওপরে ঈমান এনে আল্লাহর রাসূল (সা.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথী অন্যান্য মুসলিম মুহাজিরদের আশ্রয় ও সহায়তাদানকারী আনসার হিসেবে অভিহিত। অপরদিকে অন্য একটি গোষ্ঠী হলো মক্কা হতে সর্বস্ব ত্যাগ করে রিক্ত হস্তে আগমনকারী স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)সহ অন্য সম্মানিত সাহাবীগণ। যারা মুহাজির নামে চিহ্নিত। উভয় গোষ্ঠীর আঞ্চলিকতা ও অবস্থানগত দৃষ্টির বিচারে স্পষ্ট দুটি পরিচয় ছিল কিন্তু আদর্শের দিক থেকে তাঁরা সকলেই মুসলমান ছিলেন। তাঁরা সকলে এক আল্লাহর দাসত্বে বিশ্বাসী। যদিও তারা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী হতে আগত। এখানে এরকম দুটি গোষ্ঠী যাঁরা একই আদর্শে উজ্জীবিত ও সংঘবদ্ধ। তাদের নিয়ে যখন একটি নতুন সমাজ ইসলামী সমাজ গঠনে তৎপর হলেন, তখন তিনি কোনো আঞ্চলিকতা বা গোষ্ঠী বা বংশ পরিচয়ের ভিত্তিতে নয় বরং একটি মাত্র দর্শন ইসলাম যাকে রূপক অর্থে আল্লাহপাকের রজ্জু বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার ভিত্তিতে আনসার এবং মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে এর চমৎকার ও অভিনব পদ্ধতিতে ঐক্যস্থাপন করলেন। তিনি এক আনসারী সাহাবীর সাথে অন্য এক রিক্ত হস্ত মুহাজির সাহাবীর ইখওয়ান বা ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন, ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে, যে তাঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এ ভ্রাতৃত্ব বা ইখওয়ান নিছক লোক দেখানো ব্যাপার ছিল না বরং তা তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত এমনকি মৃত্যুর পরে তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যেও বিরাজমান ছিল।

এভাবে প্রতিষ্ঠিত সমাজ যার কিছু সদস্য ছিলেন মদীনার স্থানীয় আর কিছু সদস্য ছিলেন মক্কা হতে আসা বহিরাগত। এরা সকলে মদীনায় পূর্ব হতে বসবাসরত ইহুদি-খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য পৌত্তলিক জনগোষ্ঠীর নাকের ডগায় একই ভূ-খণ্ডে একই ভাষাভাষী সমাজের মধ্যে হয়েও একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। ভাষা, অঞ্চল, চেহারা আকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমারেখা ইত্যাদি সব একই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা পাশাপাশি বাস করেও ঐ একই সমাজ ও এলাকার ভেতরেই ব্যতিক্রমধর্মীভাবে লক্ষণীয় একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রচলিত সমাজকে বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে তার অস্তিত্বকে ধর্তব্যের মধ্যে না নিয়ে তাকে অস্বীকার করে এ সমাজের প্রতিষ্ঠা বাস্তবিকই একটি চমৎকার পদযাত্রা একটি বৈপ্লবিক ঘটনা, একটি সাহসী ও বিস্ময়কর পদক্ষেপ।

www.pathagar.com

নতুন প্রতিষ্ঠিত এ সমাজটি যদি কোনো বিশেষ অঞ্চল বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বা ভাষা অথবা কোনো বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতো তবে তা অচিরেই মদীনা ও তার পাশাপাশি এলাকায় বসবাসরত ইহুদি-খ্রিষ্টানসহ পৌত্তলিক অন্যান্য জনগোষ্ঠী, যাদের ভাষা, পোশাক, কৃষ্টি, খাদ্য-জীবনযাপন প্রণালি ও উপাদান একই ছিল। তাদের সাথে লীন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। বস্তুত সত্য কথা হলো এই যে, তাদের মধ্যে একই এলাকায় বাস করে কোনো একটি পৃথক সমাজের সূচনা করাই সম্ভব হতো না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে, এ নতুন সমাজটি ঐ সকল উপাদানের কোনোটির ওপরেই ভিত্তি করে নয় বরং শুধুমাত্র একটি আদর্শকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে অঞ্চল, ভৌগোলিক সীমারেখা ভাষা-পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনযাপনের উপাদানসমূহের বৈপরীত্য পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে নতুন একটি সমাজের সূচনা হলো এবং তা অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুততার সাথে সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে মোকাবিলা করে ক্রমান্বয়ে সংহত হতে থাকল।

মক্কা ও মদীনার সেইসব সম্মানিত সাহাবীদের কথা চিন্তা করুন তাদের মধ্যে বংশ-গোষ্ঠী ও আঞ্চলিকতার পার্থক্য ছিল-আঞ্চলিকতার কারণে একই ভাষার মধ্যে, যে পার্থক্য সূচিত হয় তাও ছিল। এমনকি খোদ মদীনায় বসবাসরত আওস ও খাযরাজ দু গোষ্ঠীর মধ্যে শত বছর ধরে চলে আসা গৃহযুদ্ধ হানাহানি এবং তার মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক রেশও ছিল কিন্তু একটি মাত্র দর্শন ইসলাম এর ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হবার ফলে তাঁদের মধ্য হতে সেইসব হিংসা-বিদ্বেষ হানাহানি-শত্রুতা-অনৈক্য সব নিমেষেই দূর হয়ে গেল তুলনাহীন এক দুর্ভেদ্য ঐক্য। একটিমাত্র আদর্শ এর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবার ফলে তাদের মধ্যে পূর্ব হতে বিরাজমান শত্রুতা দুশমনি, প্রতিশোধপরায়ণতার কারণে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা-খুন, জখম, জীবন-সম্পদ ও ইজ্জতের হানি, স্ত্রী পুত্র-কন্যা-পরিজনদের প্রতি নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা তাদের বিধবা বা এতিম হবার সম্ভাবনাসহ শত রকমের পার্থিব অকল্যাণের পথ রুদ্ধ হলো আর একই সাথে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ, জুলুম-অন্যায় ইত্যাদি অপরাধের যে পরকালীন শাস্তি তা হতেও তারা বেঁচে গেলেন। এ চিত্রটি-ই সুন্দর করে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কুরআনুল কারীমে ফুটিয়ে তুলেছেন কুরআনের ভাষায়–

পৃথিবীতে পারস্পরিক শত্রুতা-বিদ্বেষজনিত অশান্তি এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে জাহান্নামের ভয়াবহ আজাব হতে যে তাঁরা বেঁচে গিয়েছেন, বেঁচে গিয়েছেন একটা বড় ধরনের অকল্যাণের হাত হতে, সে কথার ঘোষণা তো স্বয়ং আল্লাহপাকই দিচ্ছেন। পাশাপাশি তিনি এ কথারও স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, তাঁদের অন্তর পারস্পরিকভাবে জুড়ে গেছে (বন্ধুত্ব ও ভালোবাসায়)। এটি কেন হয়েছে

www.pathagar.com

তাতো স্পষ্ট। এটি হয়েছে চিন্তার পরিশুদ্ধি যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং ইসলামের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো যেমন, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি এ সবের সাথে অঙ্গীভূত হবার কারণে। আশাকরি এ কথা দ্বারা আমরা এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পেরেছি যে, ইসলাম একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠীর পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণকে নিশ্চিত করে তিনটি পর্যায়ক্রমিক স্তরের মাধ্যমে। এ অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা সে তিনটি উল্লেখও করেছি। প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো (পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজ) সেই তিনটির মধ্যে অন্যতম একটি।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকলে, শাসক ও দায়িত্বশীলগণ যেমন, তেমনি সমাজের বা রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকগণ সকলে, একক ও সামষ্টিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠন ও তা টিকিয়ে রাখতে নিরন্তর কাজ করে যান। মূলত শাসকবর্গের ওপরেই এ গুরু দায়িত্বের মূল অংশটি অর্পিত থাকে যে, তারা এ সমাজকে গঠন করবে, সংহত করবে, টিকিয়ে রাখবে এবং এ লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এ সমাজটি শাসকের শাসন কর্তৃত্ব, আইনের প্রয়োগও শাস্তির ভয়, দারোগা-পুলিশের ভয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকে না (যদিও এগুলোর প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ও সকলপ্রকার জুলুমের মূলোৎপাটন করতে) বরং এ সমাজ সেটি প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে একটি সু-নির্দিষ্ট দর্শনের ওপর ভিত্তি করে তা টিকেও থাকে, এ সমাজের সদস্যরা সেই দর্শন ও তার শিক্ষাকে কতটা আত্মীকরণ করেছে, সেই শিক্ষার প্রতি কতটা বিশ্বস্ত রয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে।

ইসলামী সমাজ এর ভেতরে সর্বপ্রকার অনৈক্য-হিংসা, হানাহানি দূর করার ও সে স্থলে পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা, দয়া-মায়া, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সহানুভূতি ইত্যাদি সৎ গুণাবলির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যেকোনো ধরনের অনৈক্যকে নির্মূল করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও তা সংহত করতে সদা তৎপর। এ জন্য ইসলামের দর্শনে রয়েছে হাজারো শিক্ষা। এগুলো ঐচ্ছিক নয় বরং বাধ্যতামূলক (বেশির ভাগই) প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর জন্য। আর মুসলমান নর-নারী যারা একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল উপাদান তারা যদি এগুলো মেনে চলে তবে সমাজে বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে শান্তি ও সিসাঢালা ঐক্য প্রতিষ্ঠা হতে বাধ্য। এ রকম হাজারো শিক্ষা নির্দেশনার মধ্যে মাত্র গুটি কতক এখানে উল্লেখ করে দেখা যেতে পারে। যেমন কুরআনুল কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন–

অর্থাৎ, তোমরা পূর্বদিকে মুখ করলে কী পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়, বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে মানুষ আল্লাহ, পরকাল ও

www.pathagar.com

ফেরেশতাকে এবং আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাসহ মান্য করবে আর আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে, আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন নিঃস্বপথিক, সাহায্যপ্রার্থীর ও ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য ব্যয় করবে। এ ছাড়াও নামায কায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে। প্রকৃত পুণ্যবান তারাই, যারা ওয়াদা করলে তা পূরণ করে, আর দারিদ্র্য, সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুত এরাই প্রকৃত সত্যপন্থি, তারাই মুত্তাকী। (সূরা বাকারা-১৭৭)

সামাজিক অনাচার অভাব ইত্যাদি দূরীকরণে এর চেয়ে উত্তম কোনো বিধান আছে কী? আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন–

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। সুতরাং আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে তাঁর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে। (মিশকাত)

অন্যত্র তিনি বলেন–

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দয়াকারীদের প্রতি রহমান দয়া করেন। যারা পৃথিবীতে আছে তোমরা তাদের প্রতি দয়া করো। যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (আবু দাউদ)

সমাজে সম্পদ ও প্রাচুর্যের বিভিন্নতার কারণে কেউ হন সম্পদশালী প্রাচুর্যময়, অপরপক্ষে কেউ রয়ে যান অভাবী বিত্তহীন। এ উভয় দলের মধ্যে অতি স্বাভাবিক কারণেই পারস্পরিক অনাস্থা, হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে পারে, যা প্রকারান্তরে তার গভীর হতে অনৈক্যের দিকে (যেমন শ্রেণী সংগ্রামজনিত অনৈক্য ও হানাহানি) ধাবিত করে। ইসলামী সমাজে এ আশংকাকে তিরোহিত করা হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে। প্রথমত অভাবী-অনটনকে সাহায্য-সহযোগিতা করার মানসিকতা তৈরি করে তাদের সহযোগিতা করাটা অত্যন্ত মর্যাদাকর, একটি পুণ্যকর ইবাদত হিসেবে বিবেচিত করে। অভাবী-অনাথকে সমাজের বোঝা নয় বরং তাদের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করে তাদেরকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কল্যাণপ্রাপ্তির এক দুর্লভ উপকরণ বা মাধ্যম বানানো হয়েছে। মানুষকে মর্যাদাদানের ক্ষেত্রে এ এক অতি বিস্ময়কর বৈপ্লবিক পদক্ষেপ এবং যা সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় জাদুর মতো কাজ করে। যেমন আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন–

হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা আমার সন্তুষ্টি দুর্বলদের মাঝে তালাশ করো। দুর্বলদের কারণেই তোমরা রিজিক ও সাহায্যপ্রাপ্ত হও। (মিশকাত)

www.pathagar.com

শুধু দুর্বল মানুষ-ই নয়, বরং মানুষ-প্রাণী নির্বিশেষে সকলের জন্যই মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত, তা দেখুন-

হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে–সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। সুতরাং আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে। (মিশকাত)

এ কথা স্পষ্ট যে উল্লিখিত হাদীসের নিষ্ঠাবান অনুসারী প্রতিটি মুসলমান শুধু নিজ ধর্মাবলম্বীই নয়, বরং ধর্ম-বর্ণ-মানুষ নির্বিশেষে সকল প্রাণীর জন্যই নিরাপত্তা- সহযোগিতা ও কল্যাণের একটি উত্তম ও সদা নির্ভরযোগ্য একটি উৎস হয়ে গড়ে ওঠবে।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তাআলার কাছে এই দোয়া করেন : হে আল্লাহ, আমাকে মিসকিন অবস্থায় জীবিত রাখ এবং মিসকিন অবস্থায় মৃত্যু দাও। মিসকিনদের মধ্যে আমার হাশর করো। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) আরয করলেন : কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন : এর কারণ এই যে, মিসকিনরা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে দাখিল হবে। হে আয়েশা, মিসকিনকে কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দিয়ো না। যাই পারো দিয়ে দাও, যদিও অর্ধেক খেজুর হয়। মিসকিনকে মহব্বত করো, তাকে নৈকট্য দাও। কিয়ামতে আল্লাহ তোমাকে নৈকট্য দিবেন। (মিশকাত)

উপরোল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত শিক্ষাটি কোনো মুসলমানের দৃষ্টিতে রয়ে গেলে মুসলমানদের সমাজে যেসব দুস্থ-অভাবী ও সামাজিকভাবে অনগ্রসর গোষ্ঠীটি থাকে তাদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে কী? এবং সেইসব অভাবী-দুস্থ লোকগুলো কী আর অভাবী বা দুস্থ রয়ে যেতে পারে?

সমাজে এতিম-মিসকিন-বিধবা এ ধরনের একটি অংশ তারা অবশ্যই সমাজের একটি অংশ। এই অংশটিকেও সমাজনামক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সাথে যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে অঙ্গীভূত করে নেয়াটা ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশ। তারা যেন সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় অবহেলিত অবস্থায় পড়ে না থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে ইসলামের শিক্ষা দেখুন-

হযরত আবু উমামা (রা.)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : যে ব্যক্তি কোনো এতিমের মাথায় হাত বুলায় এবং এ কাজ কেবল আল্লাহর জন্য করে, যে সকল চুলের ওপর দিয়ে তার হাত যাবে, সেগুলোর প্রত্যেকটির বিনিময়ে সে কয়েকটি করে পুণ্য পাবে। যে ব্যক্তি কোনো এতিম শিশুর সাথে সদ্ব্যবহার করে, যে শিশু তার কাছে থাকে, জান্নাতে সে ও আমি এভাবে থাকব। তিনি হাতের মধ্যাঙুলি ও শাহাদতের অঙ্গুলি একত্রিত করে দেখালেন। (আহমদ, তিরমিযী)

www.pathagar.com

এ শিক্ষাটিকে দেখুন আর সমগ্র বিশ্বের দেশে দেশে এ ধরনের এতিম অভিভাবকহীন সন্তানদের দিকে দৃষ্টি দিন এ কথাটি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, আজকের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত উগান্ডা, বরুন্ডি, শ্রীলংকা, লাইবেরিয়া ইত্যাদি দেশে এতিম শিশুরা পশুর মতো মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হতো না। কুকুরের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে বাধ্য হতো না ডাষ্টবিনের নোংরায় পড়ে থাকা গোশতহীন হাড়খানা-

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন: বিধবা ও মিসকিনদের জন্য অর্থোপার্জনকারী এমন, যেমন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে অর্থাৎ জিহাদে পরিশ্রম ও কষ্টসহকারে নিয়োজিত থাকে। রাবী বলেন : আমার মনে পড়ে, তিনি আরও বলেছেন, এই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ (সারারাত) নামাযে দণ্ডায়মান থাকে, কোনো অলসতা করে না এবং যেমন কেউ (উপর্যুপরি) রোযা রাখে এবং মাঝখানে রোযা না ছাড়ে। (বোখারী, মুসলিম)

ইসলামী সমাজে যেখানে সকলেই আল্লাহর ইবাদতে বিশ্বাসী ও সচেষ্ট। ইবাদতের এ ধরনের সুযোগ কেউ হাতছাড়া করবে কী? সমাজে উপার্জনহীন, সম্বলহীন রয়ে যাবার মত আশঙ্কায় ভোগার শঙ্কা থাকে কী কারও?

অন্যত্র তিনি (সা.) আরও বলেছেন–

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলে কারীম (সা.) বলেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তম গৃহ সেই গৃহ, যাতে কোনো এতিম থাকে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়। আর মুসলমানদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট গৃহ সেই গৃহ, যাতে কোন এতিম থাকে এবং তার সাথে অসদ্ব্যবহার করা হয়। (ইবনে মাজা)

আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশে এই একটিমাত্র শিক্ষার প্রতি সকল মুসলমানরা যদি নিষ্ঠার সাথে আমল করত তবে কোনো এতিম শিশুকে ক্ষুধায়-বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করতে হতো? রাস্তায় রাস্তায় কী পড়ে থাকতে দেখা যেত বেওয়ারিশ শিশু-কিশোরের লাশ। আজই যদি ইসলামী বিধান এদেশে জারি হয়ে যায়, সকল অভাব-অনটন সত্ত্বেও দেখা যাবে এ ধরনের করুণ অবস্থা দূরীভূত হয়েছে। স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা তালাকপ্রাপ্তা নারী সমাজে অপাঙ্‌ক্তের অভিভাবকহীন অবস্থায় নিদারুণ কষ্ট আর অবহেলায় দিন কাটায়। তাদের ব্যাপারেও ইসলামের সতর্ক দৃষ্টি মায়াভরা নির্দেশ ও সামাজিক বিধান দেখুন।

সুরাকা ইবনে মালেকের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি তোমাকে সর্বোত্তম দানের কথা বলব কী? অতঃপর তিনি জবাবে বললেন : সর্বোত্তম দান এই যে, তোমার কন্যা (তালাক কিংবা স্বামীর মৃত্যুর কারণে)

www.pathagar.com

তোমার কাছে ফিরে আসে এবং তুমি তার জন্য অর্থ ব্যয় করো। তুমি ছাড়া তার কোনো উপার্জনকারী নেই। (ইবনে মাজা), এভাবে সমাজে অনগ্রসর দুস্থ ও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় নিপতিত নাগরিকদের সমাজিক-আর্থিকসহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটা ইসলামের অতি বড় এক সফলতা।

সামাজিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা, সামাজিক ঐক্য সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ শর্তের অভাব হলে সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠাতো দূরের কথা অচিরেই সে সমাজ অনৈক্য-বিভেদ ও হানাহানি জনিত অশান্তিতে ভরে উঠবে, পরিশেষে সকল ধরনের অকল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে পড়বে তাই সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ–

হাদীস : হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলে কারীম (সা.) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, আল্লাহতাআলা তার বয়ঃক্রম দীর্ঘ করুন এবং রিজিক বৃদ্ধি করুন, সে যেন পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং অন্য আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। (বায়হাকী)

আত্মীয়-স্বজনদের সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে তিনি আরও বলেন–

হাদীস : হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলে কারীম (সা.) এরশাদ করেন- তোমরা বংশপরিচয় জেনে নাও, যা জানলে প্রিয়জনদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে। কেননা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা পরিবারের ভালোবাসার মাধ্যম হয়। এটা ধন-সম্পদ বৃদ্ধির কারণ হয় এবং এর কারণে বয়স বৃদ্ধি পায়। (তিরমিযী)

নিজের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী আত্মীয়স্বজনদের সাথে স্ব-উদ্যোগে সম্পর্ক রক্ষা নিঃসন্দেহে সামাজিক ঐক্যকে সুসংহত ও দৃঢ় করবে। সমাজের গভীরে অনৈক্য সৃষ্টির কারণ দূরীভূত হবে। এর পাশাপাশি আত্মীয় নয় এমন পরিচিতজন ও প্রতিবেশীদের সাথে সুন্দর আচরণ ও ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন–

হাদীস : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক মহিলা এমন যে তার অধিক নামায, রোযা ও সাদকার কথা মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হয়। কিন্তু সে আপন পড়শিদের মুখ দিয়ে কষ্ট দেয়। রাসূলাল্লাহ (সা.) বললেন, সে দোযখে যাবে। এরপর লোকটি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক মহিলা সম্পর্কে মানুষ বলাবলি করে যে সে নাকি নফল রোযা, নফল সাদকা এবং নফল নামায কমই পড়ে এবং পনিরের সামান্য খণ্ড দান করে এবং মুখে প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সে জান্নাতে যাবে। (আহমদ, বায়হাকী)

ইসলামী সমাজে মুমিন এর প্রকৃত মর্যাদাপ্রাপ্তি মুমিন হিসেবে গড়ে ওঠার প্রতিযোগিতা চলে নাগরিকগণের মধ্যে। এ সমাজে প্রতিটি মুসলমানের অভীষ্ট

www.pathagar.com

লক্ষ্য হলো শেষ বিচারে আল্লাহর দৃষ্টিতে মুমিন হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া আর সে দিকে দৃষ্টি দিয়ে মুমিনের প্রকৃত পরিচয় দিতে যেয়ে তিনি (সা.) বলেন–

একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতে থাকেন, আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কে মুমিন নয়? তিনি বললেন, যার দুষ্টুমি থেকে প্রতিবেশী শঙ্কাহীন নয়। (মুসলিম)

প্রতিবেশীর প্রতি যাবতীয় অনিষ্ট, কষ্টপীড়ার উদ্রেক করা হতে একজনকে বিরত ও সংযত করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয় না বরং প্রতিবেশীকে ব্যক্তির সুখ-সমৃদ্ধি সচ্ছলতা, তার সম্মান তার অর্থ-বিত্ত-বৈভব ইত্যাদিতে অধিকারের কথাও ইসলাম স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন দেখুন– রাসূলে কারীম (সা.) এরশাদ করেছেন– জিবরাঈল (আ.) আমাকে সবসময় প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ দিতে থাকায় আমার ধারণা জন্মে যে তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে ছাড়বেন। (বোখারী, মুসলিম)

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে কারো সাথে কখনও কোনো সামাজিক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেও ফেলে তবু সে সম্পর্ক যেন ছিন্নতার দিকে আরও বেশি ধাবিত না হয় তা নিশ্চিত করতে তিনি (সা.) বলেন–

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সদ্ব্যবহারের জবাবে সদ্ব্যবহার করে সে সদ্ব্যবহারকারী নয়। কিন্তু সদ্ব্যবহারকারী সেই ব্যক্তি যার সাথে সম্পর্কচ্ছেদের আচরণ করা হলেও সে সদ্ব্যবহার করে (বোখারী)।

অন্যত্র আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন–

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন : রাসূলে কারীম (সা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে আমি তড়িঘড়ি তাঁর পবিত্র হাত ধরে ফেললাম। তিনিও দ্রুত আমার হাত ধরলেন। অতঃপর বললেন, ওকবা, আমি কী তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের উত্তম চরিত্রের কথা বলব না? অতঃপর নিজেই বললেন, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখ। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দাও। যে তোমার ওপর জুলুম করে, তাকে ক্ষমা করো। এরপর বললেন : খবরদার, যে চায় তার আয়ু দীর্ঘ হোক, রিজিক প্রশস্ত হোক, তার উচিত আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। (হাকেম)

হাদীস : হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন رحم শব্দটি رحمن থেকে উদ্ভূত (যা কিনা আল্লাহর নাম)। আল্লাহ

www.pathagar.com

বললেন, হে রাহেম (আত্মীয়তা), যে তোমাকে বজায় রাখবে (অর্থাৎ আত্মীয়তার হক আদায় করবে), আমি তার প্রতি রহমত বজায় রাখব। আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমি তাকে (রহমত থেকে) ছিন্ন করে দিব। (বোখারী)

আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি–আল্লাহ সেই সম্প্রদায়ের প্রতি রহমত নাযিল করেন না, যাদের মধ্যে কোনো সম্পর্কচ্ছেদকারী থাকে। (বায়হাকী)

অর্থাৎ, যে সমাজের যে বাসিন্দা নাগরিক অথবা সদস্যগণ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি পদক্ষেপে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর রহমত অনুগ্রহ আশা করেন, তা পাবার জন্য মরিয়া হয়ে থাকে, তাদের মানসিকতায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই হাদীসটি কী গভীর ও সুদূরপ্রসারী সংশোধনমূলক আবেগ-আগ্রহ সৃষ্টি করবে তা ভেবে দেখুন।

অন্যত্র তিনি বলেছেন–

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার কিছু লোক উপবিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) আগমন করে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি কী বলব না যে তোমাদের মধ্যে ভালো কে এবং মন্দ কে? একথা শুনে সকলেই চুপ হয়ে গেল। তিনি তিনবার এ প্রশ্ন উচ্চারণ করলেন। এক ব্যক্তি আরয করল : ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যার কাছ থেকে কল্যাণ আশা করা হয় এবং যার অনিষ্ট থেকে মানুষ নিশ্চিন্ত থাকে। (অর্থাৎ মানুষ বিশ্বাস রাখে যে এ ব্যক্তি কারও ক্ষতি করবে না)। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যার কাছ থেকে কল্যাণ আশা করা হয় না এবং যার অনিষ্ট থেকে মানুষ নির্ভয়ে থাকে না। (তিরমিযী)

ইসলামী সমাজে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থাৎ তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক যেমন হবে সে কথার বর্ণনা দিতে যেয়ে তিনি (সা.) বলেন–

হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলে কারীম (সা.) বলেন, তুমি মুমিনদের পারস্পরিক দয়া, মহব্বত ও সম্প্রীতিতে এক দেহের মতো দেখবে (অর্থাৎ তারা যেন এক দেহ)। যখন এক অঙ্গে ব্যথা লাগে, তখন সমগ্র দেহই অনিদ্রা ও জ্বরকে ডেকে নেয়। (বোখারী, মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সকল মুসলমান এক ব্যক্তির মতো। চোখে কষ্ট দেখা দিলে সমগ্র দেহ কষ্ট পায়। মাথায় যন্ত্রণা থাকলে সমস্ত দেহ যন্ত্রণা অনুভব করে। (মুসলিম)

মানুষের নিজ শরীরের একটি অঙ্গ অপর অঙ্গকে আঘাত করে না, কষ্ট দেয় না, কষ্টে ত্যাগ করে না, একটি সমাজ যদি একটি দেহের মতো হয়ে যায়, তবে

www.pathagar.com

সেখানে এক সদস্য অপর সদস্যকে আঘাত করবে না, কষ্ট দেবে না, তাকে বিপদে একা ত্যাগ করবে না সে কথাই উল্লিখিত হাদীসে সুন্দর উপমায় ফুটে ওঠেছে।

অথবা দেখুন, তাঁর বক্তব্য–

হাদীস : হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কারও কোনো দোষ দেখে গোপন করে, সে (সওয়াবে) সেই ব্যক্তির মতো হবে, যেকোনো জীবন্ত প্রোথিত বালিকাকে জীবন দান করে। (আহমদ, তিরমিযী)

এটিও একজন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র অপমান অস্বস্তি হতে রক্ষা করার জন্যই নয় বরং সমাজে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত যেন সৃষ্টি না হয় এবং সামাজিক সম্পর্ক অক্ষত থাকে তার এক অব্যর্থ দাওয়াই হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে, যেকোনো মুসলমানের দোষ গোপন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন করবেন।

ইসলামী সমাজে বিপদগ্রস্ত-দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সাহায্যের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন–

এক হাদীসে আছে যে ব্যক্তি কোনো দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্য করে, আল্লাহ তার জন্য তেহাত্তরটি মাগফিরাত লিখে দেন। আর বাহাত্তরটি মাগফিরাত আখিরাতে তার মর্তবা উঁচু করার কাজে আসবে। (বায়হাকী)

সমাজে সদস্যদের মধ্যে, রাষ্ট্রে নাগরিকদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ দেখা দিতেই পারে। এটা মানুষের সমাজ, মানুষের মধ্যে মত-পথ ও রুচির পার্থক্য অনুযায়ী স্বাভাবিক একটি প্রবণতা। এই স্বাভাবিক প্রবণতার ভিত্তিতেই অনেক সময় মতপার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে। কিন্তু এই স্বাভাবিক ব্যাপারটিই যেন পরিণতিতে সামাজিক অশান্তি ও পারস্পরিক বিভেদ এর সূচনা করতে না পারে, তার দিকে লক্ষ্য রেখে আল্লাহর রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীস : হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : আমি কী তোমাদের এমন বিষয় বলব না, যা (নফল) রোযা, সাদকাহ ও নামাযের মর্তবা অপেক্ষা উত্তম? আমরা বললাম, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-মীমাংসা করে দেয়া। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব একটি মুণ্ডনকারী বিষয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

www.pathagar.com

এরকম শত শত নয়, বরং হাজার হাজার উদাহরণ নির্দেশ বিধি-বিধানকে চাইলে উপস্থাপন করা যাবে-যা দ্বারা এ কথা অকাট্যভাবেই প্রমাণ করা যায় যে, ইসলামী দর্শনই একমাত্র দর্শন যা কিনা সমাজ ও রাষ্ট্রে সামাজিক সদস্যদের ভেতরে অটুট ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং যেকোনো ধরনের অনৈক্য সৃষ্টির পথকে এমনকি দূরতম সম্ভাবনাকেও অত্যন্ত সফলতার সাথে দূর করতে পেরেছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে মুসলমানরা শুধুমাত্র নামে বা পরিচয়ে মুসলমান না হয়ে বরং চিন্তা ও চেতনায়, কর্মে ও বিশ্বাসে, ভেতরে ও বাহিরে প্রকৃত মুসলমান হয় বা ইসলামের শিক্ষা ও দর্শনের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণ করে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের বিধি-বিধান হতে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায়। যে মুহূর্তে সমাজবাসীরা এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলতে থাকে সেই মুহূর্ত হতে সমাজের অটুট ঐক্যে চির ধরতে থাকে, সমাজ দ্রুত অনৈক্যের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

এ সত্যটি বিশ্বাসে অটুট ও ভাস্বর থাকে বলেই ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল শাসকবর্গই শুধু নয় বরং প্রতিটি সচেতন মুসলমান এসব শিক্ষাকে পূর্ণমাত্রায় বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে চলে এবং তাদের দৃষ্টিসীমার ভেতরে যে কোনো ধরনের বিচ্যুতিকে রোধ করে। ইসলামী শাসন কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে এসব শিক্ষাকে অনুসরণে উৎসাহ জোগায়, অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলে। এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়েই এ হতে বিচ্যুত হবার যেকোনো প্রচেষ্টাকে, প্রবণতাকে রোধ করে। এভাবেই সামাজিক অবকাঠামো তৈরি ও রক্ষা করে, এমন একটি সামাজিক অবকাঠামো সেটি প্রতিটি মানুষের জন্যই কল্যাণকর।

অষ্টম অধ্যায়

রাষ্ট্র পরিচালকদের দায়িত্বানুভূতি ও তাকওয়া

প্রচলিত শাসন ব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাই যে, দেশের শাসন ক্ষমতার মতো এক বিরাট সফলতা ও সুযোগ পাবার পরে নির্বাচনে বিজয়ী ও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা সমষ্টি ও তাদের অনুসারীরা খুশিতে-আনন্দে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানাদি বা ভোজসভা, কিংবা সংবর্ধনা সভা অথবা গণসংবর্ধনা সভা ইত্যাদি চটকদার ও শ্রুতিমধুর নামে বিরাট বিরাট আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। শাসন ক্ষমতা হাতে পাবার কারণেই অথবা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে অংশীদারিত্ব পাবার কারণেই তারা এতটা খুশি ও আনন্দিত, সম্পদ-ক্ষমতা -সম্মান প্রতিপত্তি, বিত্ত-বৈভব-বিলাস এসব যেন হাতের মুঠোয় এসে গেছে। আর এ সোনার হরিণসম রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে,

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কত প্রচেষ্টাই না চালানো হয়েছে। কত লক্ষ লক্ষ এমনকি কোটি কোটি টাকা-ই না ঢালা হয়েছে, বিনিয়োগ করা হয়েছে। এ সকল প্রচেষ্টা ও বিনিয়োগের কাঙ্ক্ষিত ফল পেলে কে না খুশি হয়?

অথচ ইসলামী দর্শনের একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী সঠিক চেতনাসম্পন্ন একজন প্রকৃত ঈমানদার মুসলমানের নিকট রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনের যেকোন দায়িত্বভার শাসন কর্তৃত্ব বা রাষ্ট্রক্ষমতা অথবা এ সবের আওতায় কোনো প্রশাসনিক পদ অথবা এসব পদে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ কোনো বড় সুখকর বিষয় বা আনন্দদায়ক ঘটনা অথবা জীবনের এক মহাসৌভাগ্যজনক সুযোগ অথবা অঢেল প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কোনো দুর্লভ সফলতা নয়। এ ধরনের পদে অধিষ্ঠিত হবার সুবাদে তিনি (যিনি একজন প্রকৃত অর্থেই আল্লাহভীরু মুসলমান) অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থার আওতায় অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির মতো না কোন সম্পদ-অর্থ-বিত্তের জাদুকর উৎস হস্তগত করতে পারবেন, আর না ক্ষমতা প্রভাব-প্রতিপত্তির সুবাদে সে রকম কোনো উৎস রচনা করার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা চালাতে পারবেন। বরং একজন মানুষ হিসেবে, সাধারণ মুসলমান হিসেবে নিজের সকল বোধবিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, কর্মকাণ্ড, পাপ-পুণ্যসহ সার্বিক জীবনকালের সকল কিছুর জন্য জবাবদিহি করার পাশাপাশি রাষ্ট্র ও সমাজের একজন দায়িত্বশীল বা কর্তৃত্বশীল হবার সুবাদে সেসব দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া, তার সাফল্য-ব্যর্থতা ইত্যাদি বিষয়সহ অধীনস্থ সকল কর্মচারী, নাগরিকদের প্রাপ্য, অধিকার, তাদের কাজ-কর্ম এসব বিষয়েও তাকে আখিরাতের মাঠে প্রকাশ্য আদালতে আল্লাহর সামনে সকল প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে। সেখানে ব্যক্তিগত আমল-আখলাক, বোধ-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশ্নাবলির জবাবদিহিতায় যদি ব্যক্তি উৎরে যায়ও তারপরেও শাসক হিসেবে জনগণের কারো অধিকার হক আদায় না হয়ে থাকলে বা ক্ষুণ্ন হয়ে থাকলে, কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ জুলুম হয়ে থাকলে অথবা কোনো নাগরিক অন্য কোনো নাগরিকের দ্বারা জুলুমের শিকার হয়ে থাকলে এবং সেই জুলুমের যথাযথ প্রতিকার না হয়ে থাকলে তার জন্যও রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

একজন শাসকের হাতে পুরো দেশের তথা পুরো সমাজের সার্বিক দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকে। শাসক কর্তৃপক্ষ হলো একটি দেশ বা সমাজের যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায়ের মূল উৎস, এই উৎসমূল যদি স্বচ্ছ থাকে তাহলে পুরো দেশ ও সমাজের প্রতিটি সদস্য-সদস্যা তথা প্রতিটি নাগরিকের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা নির্মল ও স্বচ্ছ হয়ে গড়ে ওঠে। অপরপক্ষে এই উৎসমূল যদি অস্বচ্ছ দূষিত হয়ে পড়ে তাহলে দেশের সকল নারী-পুরুষ, সকল

www.pathagar.com

নাগরিকের (নিদেনপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের) মন-মানসিকতায়, চিন্তা-চেতনায় বিপর্যয় ও আদর্শ বিচ্যুতি দেখা দেয় আর এসব বিপর্যয় বিচ্যুতির দায়ভার সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের পাশাপাশি শাসক কর্তৃপক্ষকেও বইতে হয়, তাঁকে বা তাঁদের জনগণের এসব কর্মকাণ্ডের জন্যও আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। রাষ্ট্রের সমগ্র কল্যাণে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ববোধ-সততা ও তাদের ন্যায়পরায়ণতা যতটা গুরুত্বপূর্ণ সে কথার একটা ইঙ্গিত আমরা পাই প্রখ্যাত বুযুর্গ ও আল্লাহর অলী হযরত ফুজাইল ইবনে আয়ায (রা.)-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটিতে, যেখানে তিনি বলেছিলেন-

"যদি আমাকে বলা হয় যে, তোমার মাত্র একটি দোয়া কবুল হবে, তবে আমি সরকারের সংশোধনের জন্য দোয়া করতাম। কেননা একটা সরকার যদি সংশোধিত হয়ে যায়, তবে দেশের সকল লোকেরই সংশোধিত হওয়ার সুযোগ হয়"।

বস্তুত সরকারের ভালো হওয়া না হওয়ার সাথে দেশের জনগণের ভালো ও সৎ হওয়া না হওয়া নির্ভর করে। সরকারের চিন্তা-চেতনা ও গতি-প্রকৃতির সাথে আপামর জনমানুষের চিন্তা-চেতনা, গতি-প্রকৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পরের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়ে যায়। এটাই হলো এক নিরেট ও অনস্বীকার্য বাস্তবতা। বস্তুত সরকার প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া নিতান্তই এত বিরাট ও ব্যাপক গুরু দায়িত্বকে নিজ কাঁধে উত্তোলন করে নেয়া যে, যথাযথ ইসলামী শিক্ষা ও চেতনা সংবলিত একজন মুসলমান এ গুরুদায়িত্ব পেয়ে আনন্দে পুলকিত হয়ে আনন্দানুষ্ঠান-ভোজসভা ইত্যাদি আয়োজন তো দূরের কথা বরং তিনি এ গুরুদায়িত্বের ব্যাপকতা উপলব্ধি করে ভয়ে কাঁপতে থাকেন আল্লাহর ভয়ে, আখিরাতের আদালতে কঠিন হিসাবের মুহূর্তে তিনি কীভাবে এই হিসাবের পালা শেষ করবেন, কীভাবে হিসাব দেবেন, এ ভয়ে। তার চেতনায় তার মন ও মগজে বোধে ও বিশ্বাসে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর এ বাণীতো ভাস্বর হয়ে আছে, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

"হাশরের ময়দানে ঐ সমস্ত লোক সবচেয়ে বেশি শাস্তির সম্মুখীন হবে, আল্লাহপাক যাদেরকে শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন, কিন্তু সেই ক্ষমতা অপব্যবহার করে তারা স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।" "প্রিয় হাবীব মোস্তফা (সা.)-এর প্রিয় ও প্রধানতম সহচর, খলীফাতুর রাসূল সিদ্দীকে আকবর (রা.) বলেছেন, যিনি শাসক হবেন তাকে সর্বাপেক্ষা কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। তিনি সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তির ভয়ে শঙ্কিত থাকবেন। আর যে ব্যক্তি শাসক নয় তাকে সহজতর হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। তার সহজতর হিসাবের

www.pathagar.com

ভয় থাকবে। কেননা মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের সর্বাপেক্ষা বেশি সুযোগ ঘটে শাসকদের বেলায় এবং যারা মুসলমানদের ওপর জুলুম করে তারা প্রকারান্তরে আল্লাহর সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করে।" (ইসলামে মানবাধিকার, মুহাম্মদ সালাহউদ্দীন, আধুনিক প্রকাশনী, পৃঃ ১৭৩)

প্রকৃতপক্ষেই এ কথা সত্য যে, একজন ব্যক্তি শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সুবাদে সমগ্র দেশের সার্বিক-প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা, সম্পদ, সম্পদের উৎস, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল সুযোগ-সুবিধা ও কর্তৃত্ব তার হাতের মুঠোয় নিবদ্ধ থাকে। জনগণের মধ্য হতে একশ্রেণীর সুযোগসন্ধানী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সদা-সর্বদা তাকে আদর্শ হতে বিচ্যুত করে নিজেদের অনুকূলে অবৈধ ফায়দা লাভের চেষ্টায় লিপ্ত, অপর দিকে মানুষের চির দুশমন বিতাড়িত ও অভিশপ্ত শয়তানও তাকে পথভ্রষ্ট করতে সদা তৎপর, এমতাবস্থায় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত একজন শাসকের পক্ষে স্বৈরাচারী-অত্যাচারী, জালিম এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আশঙ্কা নিরেট অমূলক নয় বরং এক অকাট্য বাস্তবতা, এরকম ঝুঁকির মুখে দাঁড়িয়ে কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষ কী আনন্দে আত্মহারা হতে পারে? বরং তার তো ভয়ে আশঙ্কায় নিজ প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার কথা। এ চেতনার নামটুকুই হলো দায়িত্বানুভূতির সঠিক ও যথাযথ উপলব্ধি। এরকম উপলব্ধির বাস্তব প্রমাণ দেখতে পাই আমরা ইসলামী ইতিহাসের তথা সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য ন্যায়পরায়ণ শাসক হযরত ওমর বিন আঃ আজিজ (রহ.)-এর জীবনে। দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই তাঁর ভেতরে কী ধরনের দায়িত্ববোধ এর উন্মেষ ঘটেছিল ইতিহাস হতে তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আলেম ও সু-সাহিত্যিক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম তাঁর রচিত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.) নামক গ্রন্থে। সেখান হতেই উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি–

"অতঃপর তিনি তাঁর ঘরে বহুপূর্ব হতে একত্রিত করা ক্রীতদাসীগণকে ডেকে তাদের প্রত্যেককে সম্বোধন করে বললেন– আমার ওপর এক কঠিন দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে, ফলে তোমাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপমাত্র করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। এমতাবস্থায় যে চাবে, আমি তাকে মুক্তিদান করব। আর যদি কেউ এখানে থাকতে চায় সে থাকতে পারবে, তবে আমার নিকট হতে কারও কিছু প্রাপ্য থাকবে না।... অপর একটি বর্ণনা হতে জানা যায়, তিনি তাঁর স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন, তোমার জন্য স্বাধীনতা। ইচ্ছা হলে তুমি আমার ঘরে থাকতেও পারো নতুবা এখান হতে চলে যেতে পারো, কেননা আমার ওপরে এক মস্তবড় গুরু দায়িত্ব চাপিয়েছে, ফলে স্ত্রীর প্রতি লক্ষ্য দেওয়াও আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না, এটা শুনে তাঁর স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়লেন" (দ্রষ্টব্য : উমর ইবনে আব্দুল আজিজ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, পৃষ্ঠা-৪০)

www.pathagar.com

একটি রাষ্ট্রের প্রশাসক তথা সর্বময় ক্ষমতাধর মূল দায়িত্বশীল হিসেবে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাসকারী রাষ্ট্রের নাগরিকের চাহিদা পূরণ ও তা সরবরাহের মত মৌলিক গুরুদায়িত্ব রাষ্ট্রের শাসক কর্তৃপক্ষের। এ দায়িত্ব অন্য কোনো শাসন ব্যবস্থার আওতাধিন রাষ্ট্রের শাসকবর্গ স্বীকার ও পালন করেন কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর ও অযৌক্তিক। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতাধীন সমাজ অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি বা যাঁরা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার তাঁরা এ দায়িত্বকে না অস্বীকার করতে পারেন আর না তা কোনোক্রমে এড়িয়ে যেতে পারেন। কারণ এ দায়িত্বানুভূতি তাঁর শিক্ষা, বিশ্বাস ও আকিদার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, প্রাপক তার অধিকার রাষ্ট্রীয় কর্ণধার এর নিকট হতে আদায় করে নিতে পারল কিনা বিবেচ্য সেটি নয়, বরং বিবেচ্য হলো এটি যে রাষ্ট্রীয় কর্ণধার বা শাসক কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা সকল নাগরিকের নিকট নিজেদের দায়িত্বানুভূতির চেতনাসহ তাদের প্রাপ্য অধিকারকে তাদের হাতে পৌছে দিতে পারলেন কিনা! এটি হলো প্রকৃত অর্থে একজন আল্লাহভীরু ইসলামী শাসকের দায়িত্ববোধ। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর এক উক্তিতে এই চেতনার স্বীকৃতি মেলে। তিনি বলেছিলেন-

"আল্লাহর শপথ! আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে সানআর পার্বত্য অঞ্চলে মেষচালকও স্ব-স্থানে বসে তার অংশ পেয়ে যাবে, তার চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ ব্যতিরেকে (তাঁর একথার তাৎপর্য এই যে, নিজের অধিকার লাভের জন্য তাকে দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না যাতে সে অবসন্ন হতে পারে)।"

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কর্ণধার হিসেবে যাঁর ওপরে দায়িত্ব বর্তায় তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন আল্লাহভীরু ও নিষ্ঠাবান মুসলমান। তাঁর মনে আল্লাহর ভয়পূর্ণ মাত্রায় জাগ্রত থাকার কারণে তিনি এ শাসন ক্ষমতাকে বিরাট এক সুযোগ নয় বরং ভয়ঙ্কর ও ঝুঁকিপূর্ণ এক গুরুদায়িত্ব হিসেবেই বিবেচনা করবেন এটাই স্বাভাবিক। আমরা যদি ইসলামের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের বিভিন্ন মনীষী, যাঁরা দেশ ও সমাজের শাসক কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাদের জীবনীতিহাসে দেখি তবে তাঁদের মনে জাগ্রত এ ধরনের দায়িত্বানুভূতি বা দায়িত্ব সচেতনতার পেছনে আর কিছু নয় শুধু আল্লাহভীতিই কার্যকর ছিল।

হযরত ওমর বিন আঃ আজিজ (রহ.)-এর জীবনে দেখতে পাই তিনি ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে সারাদিন রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত সময় কাটাতেন, ফুরসত মিলত না তাঁর এতটুকুও। রাতের বেলাতেও তিনি বাড়ি ফিরে অনেক সময় রাত জেগে জেগে সরকারি কাজই করতেন। কাজ শেষে তিনি জায়নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন আর নামাযে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দুচোখ বেয়ে ঝরত অঝোরে অশ্রুধারা। কখনও কখনও তাঁর কান্নার সীমা বাঁধ ভেঙে যেত। তিনি শিশুর মত ডুকরে

www.pathagar.com

ডুকরে কাঁদতেন। তাঁর এ ধরনের অবস্থা দর্শনে স্ত্রী ফাতিমা উৎকণ্ঠিত হয়ে স্বামীকে এ কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি স্ত্রীকে কারণ হিসেবে বলেছিলেন-

"আমাকে এই মুসলিম উম্মতের ভালো-মন্দের জন্য দায়িত্বশীল বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা অসহায়, বন্দি, স্বল্পপুঁজির মালিক, বহুসংখ্যক পরিজনের পোষক এবং এই ধরনের যেসব লোক পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের কথা আমার খুব বেশি মনে পড়ছে। আমি জানি আল্লাহতাআলা এসব লোক সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আমার ভয় হচ্ছে, আল্লাহ হয়ত আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেন না, রাসূলে কারীম (সা.)ও আমাকে ছেড়ে দেবেন না।" (উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.), লেখক মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, পৃঃ ৬৪)

এটি শুধু ব্যক্তি ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এর মানসিক চিত্রের প্রকাশ নয় বরং এটি হলো একজন আল্লাহভীরু মুসলমান। যার ওপরে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনভার ন্যস্ত রয়েছে। তেমন একজন মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের মানসিক চিত্রের বহির্প্রকাশ। উল্লিখিত বক্তব্য যা আমরা উপরে উদ্ধৃত করেছি। তাতে একজন প্রবল ক্ষমতাধর শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়নি বরং প্রতিফলিত হয়েছে জনগণের একজন দরদি তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক এর দৃষ্টিভঙ্গি।

বস্তুত ইসলামী শাসনে একজন রাষ্ট্রনায়ক শাসক, জনগণের শাসক নন বরং তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকেন। তার চেতনায় পোষণ করা দৃষ্টিভঙ্গিও থাকে একজন তত্ত্বাবধায়কের, একজন অভিভাবকের দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ তো আল্লাহর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ তথা কর্মনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসন ক্ষমতা, সংবিধান, বিধি-বিধান, রাজ্যপ্রজা সকল কিছুই আল্লাহর, আল্লাহর দেয়া বিধানেই চলে এ সমাজ, এ রাষ্ট্র। শাসক কর্তৃপক্ষ হয়ে থাকেন ঐ বিধি-বিধান এর প্রতিনিধিত্বকারী, বাস্তবায়নকারী, এই জন্যই মানুষকে খলীফা বা প্রতিনিধি বলা হয়েছে–

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের দুনিয়াতে প্রতিনিধি করেছেন। (সূরা ফাতির-৩৯) এই জন্যই ইসলামী দৃষ্টিকোণে এর শিক্ষায় শাসন কর্তৃত্বকে খিলাফত নামে অভিহিত করা হয়েছে আর শাসক এর ভূমিকায় যিনি, তাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছে খলীফা নামে অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে তাঁর বিধান বাস্তবায়নের জন্য একজন প্রতিনিধিমাত্র। একজন মুসলমান শাসক ইসলামী রাষ্ট্রে বা ইসলামী সমাজে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে এবং তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.)-এর কর্মনীতির আলোকে বিধান প্রদান করে যাবেন ততক্ষণ

www.pathagar.com

পর্যন্ত তিনি খলীফা। আর যখনই তিনি আল্লাহর বিধান অনুসারে ফয়সালা করবেন না, তাঁর প্রিয় রাসূলের কর্মনীতি ত্যাগ করবেন, তখনই তিনি পরিণত হয়ে যাবেন একজন স্বৈরাচার জালিম শাসক-এ। আর এ ধরনের শাসক যতই নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচিতি দান করার চেষ্টা করুক না, আল্লাহপাক তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। জনগণের প্রতি একজন স্বৈরাচার ও একজন খলীফার দৃষ্টিভঙ্গি এক নয় কখনোই। একজন স্বৈরাচার শাসক এর কার্যক্রম ইতিহাস ও দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব প্রমাণ এ বিশ্ব ইতিহাস এর পাতায় পাতায় যেমনি রয়েছে তেমনি রয়েছে, একজন মুসলিম খলীফার দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকাল ও কার্যমেয়াদের ইতিহাস। চিন্তা-চেতনা ও দায়িত্ববোধের স্বর্ণোজ্জ্বল চমকপ্রদ তথ্যসমূহ। একজন স্বৈরাচারী শাসক হয়ে থাকে অহংকারী, দাম্ভিক ক্ষমতাদর্পী, রূঢ়, অত্যাচারী ও জালিম, এর বিপরীতে একজন মুসলিম খলীফা হয়ে থাকেন বিনীত, দয়ার্দ্র, প্রজাবৎসল, জনদরদি ও দায়িত্ব সচেতন এবং এর পাশাপাশি আল্লাহভীরু একজন মুমিন রাষ্ট্রের জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ এবং তাদের কল্যাণ চিন্তা তাদের সদা-সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করে রাখে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাজে। শুধু জনগণের কথাই বা বলি কেন একজন খলীফা তাঁর শাসন সীমানার আওতাধীন প্রতিটি জীব-জন্তুর কল্যাণ চিন্তায় ছটফট করতে থাকেন তাদের ভালো-মন্দের ব্যাপারে। নিজেকেই একদিন জবাবদিহি করতে হবে ভেবে তটস্থ থাকেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) যখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের খলীফা ছিলেন তখন তিনি এ বিশাল সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে বসবাসরত সকল নাগরিকের কল্যাণ চিন্তায় সদা-সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। এমনকি মদীনায় বাস করেও সুদূর ইরাকের ফোরাত নদীর কূলে একটি ছাগলছানার চিন্তাও তার দরদি মনকে উদগ্রীব করে তুলত। তিনি বলতেন– "ফোরাত নদীর কূলে একটা ছাগলছানাও যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাতে আমার ভয় হচ্ছে যে, এ জন্য আল্লাহ আমাকে অভিযুক্ত করবেন।" ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল যিনি, তিনি হবেন সর্বাধিক খোদাভীরু একজন মানুষ, শুধু একজন খলীফা হিসেবেই নয় বরং তাঁর ব্যক্তি জীবনে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেও তিনি হবেন প্রকৃত অর্থেই একজন খোদাভীরু মানুষ। তাঁর ব্যক্তি জীবন, তাঁর পারিবারিক জীবন, তাঁর রাষ্ট্রীয়-সামাজিক ও প্রশাসনিক জীবন, অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার কথা, তার কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাসে ও চরিত্র মাধুর্যে এই তাকওয়া বা আল্লাহভীরুতার একটি স্পষ্ট প্রকাশ থাকবে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি তাঁর ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, প্রশাসনিক জীবন তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ পালন ও

www.pathagar.com

বাস্তবায়ন এবং তাঁর প্রিয় রাসূল (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণের ক্ষেত্রে আর সেই সাথে ইসলামী শরীয়তকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা বা প্রতিষ্ঠিত রাখার ক্ষেত্রে তিনি হবেন সর্বাধিক কর্মতৎপর ও নিরাপসকামী একজন ব্যক্তি। নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের অনুসারী হবার পরিবর্তে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হবার পাশাপাশি পূর্ণ প্রশাসন ও রাষ্ট্রের আপামর জনসাধারণকেও সেই একই পথে পরিচালিত করবেন পূর্ণ সতর্কতা ও দায়িত্ববোধের সাথে। রাষ্ট্রক্ষমতা বা খিলাফত হাতে পাবার পরপরই আমরা হযরত ওমর বিন আঃ আজিজ (রহ.)-এর দেয়া এক ভাষণে এ সত্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটতে দেখি।

"ইসলামের নিজস্ব বিশেষ নিয়ম-বিধান, আইন-প্রথা, পন্থা ও সীমাসরহাদ্দ সুনির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। যে লোক তা কাজে পরিণত করল বোঝা যাবে, তার ঈমান পূর্ণত্ব পেয়েছে। আর যে লোক তা কাজে পরিণত করল না, বুঝতে হবে তার ঈমান অসম্পূর্ণ, অপূর্ণাঙ্গ। আমি যদি বেঁচে থাকি, তা হলে আমি তোমাদের তার শিক্ষা দেব এবং তা কাজে পরিণত করতে তোমাদের বাধ্য করব। রাসূলে করীম (সা.) এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ একটা সুস্পষ্ট কর্মপন্থা আমাদের সম্মুখে সমুদ্ভাসিত করে রেখে গেছেন। এই কর্মপন্থার অনুসরণই আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ এবং আল্লাহর দীনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। তাকে রদ-বদল করার বা তার পরিবর্তে অন্য কোনো কর্মপন্থা গ্রহণের দুঃসাহস কারও হতে পারে না। তার বিপরীত কোনো কর্মপন্থার কথাও কেউ ভাবতে পারে না। যে লোক এই কর্মপন্থার ভিত্তিতে সঠিক পথ গ্রহণ করল, সে-ই লাভ করল নির্ভুল পথের সন্ধান।

'হে জনগণ! জেনে রাখ, তোমাদের নবীর [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] পর আর কোনো নবী আসবে না এবং তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাবের পর আর কোনো কিতাবও নাযিল হবে না। আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমে যা হালাল করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হালাল। আর যা হারাম করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম। আমি চূড়ান্ত ফয়সালাকারী নই, তাই নিজের মতের ভিত্তিতে আমি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না। আমি তো আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নকারী মাত্র। আমি নতুন পন্থার উদ্ভাবক নই। আমি আল্লাহর দেওয়া আইন-বিধান ও পন্থার অনুসরণকারী মাত্র।' (উমর ইবনে আব্দুল আজিজ, লেখক মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, পৃষ্ঠা-৬৭-৬৮)

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি এ ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য, সেই সাথে আল্লাহভীতি এবং আখিরাতে জবাবদিহিতার চেতনা জাগ্রত থাকার পাশাপাশি নিজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সীমারেখা সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন থাকার ফলে এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে খলীফার হাতে

www.pathagar.com

সমগ্র রাষ্ট্র ও জনপদ নিরাপত্তা পায় যথাযথভাবে। রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার, রাষ্ট্রের অর্থসম্পদ তথা বায়তুল মাল ও অপচয় হতে, অপব্যবহার বা আত্মসাৎ হতে রক্ষা পায়। রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভাণ্ডার তথা বায়তুল মাল সম্বন্ধে একজন আল্লাহভীরু খলীফার দৃষ্টিভঙ্গি হলো তিনি এ সম্পদের হিফাযতকারীমাত্র, মালিক নন। ফলে জনগণের তথা রাষ্ট্রের এ সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা বা আত্মসাৎ করা তো দূরের কথা তিনি এ সম্পদকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কাজে লাগাতে বা এ হতে উপকৃত হতেও প্রস্তুত নন। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব এর হাতে বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের রূপকথা সম-ঐশ্বর্য ও সম্পদ ভাণ্ডারের এক কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার হতে নিজের বা নিজের পরিবারের অন্ন-বস্ত্রসহ ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ না করে নিজ হাতে রাত জেগে জেগে কুরআন নকল করতেন আর সেই কুরআনের কপি বিক্রিত অর্থ দিয়ে একজন সাধারণ ফকিরের মত জীবনযাপন করতেন। শততালি দেয়া জীর্ণ কাপড় পরিধান করতেন অথচ তখনও তিনি বিশাল ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁর সামান্যতম অঙ্গুলি ইশারায় কোটি কোটি টাকা হীরা-মণি-মুক্তা তাঁর পা-এর নিকট গড়াগড়ি খেত। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর জীবনেও আমরা এ ধরনের ঘটনা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। ইবনে কাসীর এর রচনা হতে মুহতারাম মরহুম মওলানা আব্দুর রহীম তাঁর রচিত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.) গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন নিম্নোক্ত ঘটনার,

"রাতেরবেলা খলীফা ওমর যদি সরকারি কাজ করতেন তা হলে তিনি তখন সরকারি প্রদীপ ব্যবহার করতেন। আর যখনই নিজের কাজ শুরু করতেন তখনই তিনি সরকারি প্রদীপ নিভিয়ে নিজস্ব প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতেন।

কিন্তু তিনি যখন সরকারি কার্যোপলক্ষে বাইরে সফরে যেতেন, তখন তিনি খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি তখন সরকারি ঘর-বাড়িতে অবস্থান করতেন না। তিনি নিজস্ব তাঁবু খাটিয়ে সেখানে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আহার্য খেতেন। এ সময় তিনি কারও ঘরে খাবার দাওয়াত গ্রহণ করতেন না, কোনো লোকের পাঠানো খাবার তিনি খেতেন না, কারো দেওয়া কোনো ফল গ্রহণ করতেন না। কেননা তিনি এসব করাকে রীতিমত ঘুষ গ্রহণ মনে করতেন।" (উক্ত গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠা)

আজও যদি বিশ্বের কোথাও মুসলমানরা নিজেদের জনপদে ইসলামী আদর্শ ও বিশ্বাস তথা তাওহীদ-এর ভিত্তিতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করে তবে সে শাসন কর্তৃত্ব যাদের হাতে থাকবে তাঁদের ও তাঁদের চিন্তা-চেতনায় কাজে-কর্মে, বোধে-বিশ্বাসে, তাদের ভেতর-বাহির স্পষ্টভাবে এ ধরনের দায়িত্বানুভূতি এ

www.pathagar.com

ধরনের আল্লাহভীরুতা তথা তাকওয়াকে ধারণ করতে হবে। কারণ এ দায়িত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের কারণে তাকে আদালতে-আখিরাতে এক ভয়াবহ ও কঠিন প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে। সেখানে এ জবাবদিহিতায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে তাঁর পরকালীন জীবন পুরোপুরিভাবেই নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, কপালে জুটবে চিরন্তন লাঞ্ছনা আর ভয়ানক পীড়াদায়ক আজাব। কোনো প্রকৃত মুসলমান শাসক কী কখনো দুনিয়ার স্বল্পকালীন এ জীবনে সামান্য কদিনের জন্য শাসন ভার হাতে পেয়ে এ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার অসন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানাতে পারে?

যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শকে ধারণ করে, যে রাষ্ট্রের সকল মুসলমান নাগরিকগণ সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে মনেপ্রাণে স্বীকার করেন রাসূলুল্লাহ (সা.)কে, সেই আদর্শ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনেই তো রয়েছে তাদের মঞ্জিল এর ঠিকানা। আর বাস্তবিকই আমরা শুধু আমরা কেন এ বিশ্বের সর্বকালের সকল মুক্তি পিয়াসী মানুষই সেই মঞ্জিলের ঠিকানা খুঁজে পায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া ছোট-বড় হাজার হাজার ঘটনার মধ্যে। এ রকমই একটি ঘটনাকে আমরা উদ্ধৃত করব তাঁর জীবন হতে, আর এ ঘটনাটি তথা তাঁর এ বাণীটি তাঁর জীবনকালের সেই সময় হতে চয়ন করা হয়েছে যখন তিনি নিজে একজন রাষ্ট্রনায়ক। একটি রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্ব তাঁর কাঁধে নিয়োজিত। ১০ লক্ষ বর্গমাইল পরিধিব্যাপী সেই বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এ বাণীতে একজন প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রনায়কের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠছে। কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে (রাষ্ট্রের শাসক কর্তৃপক্ষসহ) তাদের জীবনের প্রকৃত মঞ্জিল চিনিয়ে দেবে এ ঘটনাটি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি একবার হুজুর (সা.)-এর কাছে হাজির হয়ে দেখি তিনি খেজুরপাতার মাদুরের উপর আরাম করছেন। মাদুরের চিহ্ন তাঁর পবিত্র শরীরে ফুটে ওঠেছে। এ দৃশ্য দেখে আমি কেঁদে ফেললাম। রাসূল (সা.) আমাকে বললেন, কী হয়েছে, কাঁদছো কেন? আমি বললাম– হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! রোম ও পারস্যের সম্রাটরা রেশম ও মখমলের শয্যায় নিদ্রা যায়, আর আপনি খেজুরপাতায় মাদুরের উপর? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এতে কাঁদার কী আছে, তাদের জন্য দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখিরাত"!

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

জনগণের জান-মাল-ইজ্জত এর নিরাপত্তা

মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের জান-মাল-ইজ্জতের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় মৌলিক দায়িত্ব। আর প্রতিটি মুসলমানের ওপরে মহান আল্লাহপাকের এ নির্দেশ রয়েছে যে, সে কারো নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে না, কারো ওপরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই কোনোরকম জুলুম করবে না। সমাজে কোনো ধরনের অন্যায়-অনাচার ফিৎনা-ফেসাদ এর সে জন্ম দেবে না। সমগ্র কুরআনুল-কারীমের ছত্রে ছত্রে এ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি ছড়িয়ে আছে। দুএকটি নমুনা দেখুন–

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (البقرة ـ ١٩١)

অর্থাৎ, ফিৎনা হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। (সূরা বাকারা-১৯১)

অথবা বলা হয়েছে- وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ـ (الحديد ٢٣)

অর্থাৎ, আল্লাহ কোনো ঔদ্ধত্য অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা আল-হাদীদ-২৩)

মূলত মানুষ নিজ ক্ষমতা-প্রতিপত্তি, বিত্ত-বৈভব, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদিতে শ্রেষ্ঠত্বের কারণে ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কারীতে পরিণত হয়। আর এই ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কারের কারণেই সে অপরকে অবজ্ঞা হেয় প্রতিপন্ন করে তার হক নষ্ট করে তার ওপর জুলুম করে। তাই এসব কার্যকরণের মূলে যে অপশক্তিটি লুকিয়ে থাকে সেখানেই আঘাত করা হয়েছে, এমন কোন মুসলমান, যার নিকট বিশ্ব ও তার যাবতীয় সম্পদের চেয়েও আল্লাহর সন্তুষ্টির মূল্য বেশি, যেন এই সর্বনাশা অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যবোধে আক্রান্ত না হয় যেন সমাজে অন্যায়-অনাচার, ফিৎনা-ফেসাদ সৃষ্টিতে তৎপর না হয়।

অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ـ (الاسرائل-٣٣)

অর্থাৎ, প্রাণ হত্যার অপরাধ করিও না যা আল্লাহ হারাম করেছেন কিন্তু সত্যতা সহকারে। (বনি-ইসরাঈল-৩৩)

কেউ কোনো লোককে বিনা কারণে হত্যা করবে এটা কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ হলে সেটা ভিন্নকথা। আর আল্লাহপাকের নির্ধারিত শাস্তি

www.pathagar.com

মৃত্যুদণ্ড করতে পারে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈধ আদালত সন্দেহাতীতভাবে অপরাধ প্রমাণিত হলেই। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা দলের এ ক্ষমতা নেই যে তারা কোনো অপরাধীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন করে। যদিও অপরাধী প্রকৃতই অপরাধ সংঘটন করে থাকে। সমাজে মনুষ্য হত্যা বন্ধ করার লক্ষ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর দেয়া বিধান জারি করা হয় ইসলামী রাষ্ট্রে। এ বিধানটিকে বলা হয়ে থাকে কিসাস অর্থাৎ হত্যার বদলে হত্যাকারীকেও হত্যা করা হবে। অবশ্য নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ ইচ্ছে করলে হত্যাকারীকে মাফ করে দিতে পারে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হত্যাকারীকে ক্ষমা করার আইনগত ক্ষমতা অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির হাতে নিবদ্ধ থাকে, পক্ষান্তরে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় এ ক্ষমতাটি রাষ্ট্রপতির হাতে নয় বরং নিহত ব্যক্তির আইনগত ও বৈধ ওয়ারিশগণের হাতে নিবদ্ধ রাখা হয়েছে। এর ফলে কোনো ব্যক্তি নিজ জীবনের মায়ায় এবং অত্যন্ত কষ্টকর মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে অপর কোনো লোককে হত্যা করার কথা ঘুর্ণাক্ষরেও মাথায় আনবে না। ফলে সমাজে অযথা যে খুন-খারাবি হয়ে থাকে সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে থাকে তা বন্ধ হয়ে যাবে। সমাজবাসীর জীবন হবে নিরাপদ ও শঙ্কামুক্ত। এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেছেন–

অর্থাৎ, হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো। (সূরা বাকারা-১৭৯)

এমনকি কোনো মুসলমানকে গালমন্দ, ঝগড়া-ঝাঁটি বা তার সাথে লড়াই করাটাও ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর এক বাণীতে এরশাদ করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন নবী (সা.) বলেছেন, কোনো মুসলমানকে গালমন্দ করা ফিস্‌ক, কোনো মুসলমানের সাথে লড়াই করা কুফরি (সহীহ- বোখারী)।

কাউকে লজ্জিত অপদস্থ করার সুযোগ ইসলামে নেই এমনকি সে যদি অপরাধীও হয়ে থাকে, তবুও নয়। কুরআনুল-কারীমে আল্লাহপাক এরশাদ করেন–

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, (তোমাদের) কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারীও যেন অপর নারীকে উপহাস না করে, কেননা সে (যার প্রতি উপহাস করা হচ্ছে) উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ

www.pathagar.com

করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এরকম কাজ হতে তওবা না করে তারাই জালিম। (সূরা হুজুরাত-১১)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র আরও বলেছেন–

অর্থাৎ, ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি বেশি অনুমান করা হতে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কোন কোন ধারণা পাপ! এবং (কারও) গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কী তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো তা ঘৃণাই করো। আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু (সূরা হুজুরাত-১২)

কোনো মুসলমানের নিন্দাবাদ করা, তার দোষত্রুটি অনুসন্ধান করা, প্রকাশ করার মাধ্যমে সমাজে তার মান-সম্মান এর হানি করা উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় হাবীব এ ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন–

"মুসলমানদের গিবত করো না, তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না, কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্ব-গৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন। (কুরতুবী)

অন্যত্র আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন–

হযরত আবু সায়ীদ (রা.) ও হযরত জাবের (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, "গিবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক গুনাহ।" সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন এটা কীভাবে? তিনি (সা.) বললেন, এক ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তাওবা করলে তা মাফ হয়ে যায় কিন্তু যে গিবত করে তার গুনাহ প্রতিপক্ষের মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হয় না। (মাযহারী)

এমনকি পাপ অপরাধ সংঘটনের ইতিহাস জানা আছে এমন অপরাধীরও গিবত করা বা তাকে তার কৃত অপরাধের খোঁটা দিয়ে অপমানিত করা বা লজ্জিত করাটাও ইসলামে চরমভাবে অন্যায় বলে বিবেচিত ও শাস্তিযোগ্য এক অপরাধ। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সা.) পরিষ্কার সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন–

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন গুনাহ দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তাওবা করেছে, তাকে সেই গুনাহে লিপ্ত করে ইহকালে ও পরকালে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব আল্লাহতাআলা গ্রহণ করেন। (কুরতুবী)।

অন্যত্র বলেছেন–

www.pathagar.com

"প্রত্যেক মুসলমানের ধন, প্রাণ ও সম্মান অন্য মুসলমানের জন্য হারাম।" এমনকি কোনো মুসলমানকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত-সন্ত্রস্তও করা যাবে না। তার মনে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করাটাও একটি বড় অত্যাচার, এটি কোনো মুসলমানের কাজ নয়। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন-

"মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার রসনা ও হাত থেকে অন্য মুসলমানেরা নিরাপদ থাকে।" (বোখারী ও মুসলিম)

অন্যত্র আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে–তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

পরস্পরের মধ্যে হিংসা করো না, একে অপরের জন্য নিলাম ডেকে দাম বাড়াবে না, পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা করো না, একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যেও না, নিজের কোনো জিনিস অন্যের বিক্রির সময় সামনে এগিয়ে দিয়ো না, বরং হে আল্লাহর বান্দাহগণ, পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও– মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার ওপর জুলুম করে না ও তাকে সঙ্গীহীন ও সহায়হীনভাবে ছেড়ে দেয় না, সে তার কাছে মিথ্যা বলে না ও তাকে অপমান করে না। তাকওয়া এখানে আছে–তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করেন। কোন মানুষের জন্য এতটুকু মন্দই যথেষ্ট যে, সে আপন মুসলমান ভাইকে নীচ ও হীন মনে করে। প্রত্যেক মুসলমানের এসব জিনিস প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হারাম, তার রক্ত, তার সম্পদ ও তার মান-সম্মান। (মুসলিম)

এভাবে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাব যে ইসলামে একজন ব্যক্তির জান-মাল-ইজ্জতসহ সকল মৌলিক চাহিদা ও নিরাপত্তা রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। কারো মান-ইজ্জতের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হতে পারে এমন পরিস্থিতিই সৃষ্টি হোক সেটা ইসলামে কাম্য নয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন–

অর্থাৎ, মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে, এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। (সূরা নূর-৩০)

অন্যত্র তিনি বলেন–

অর্থাৎ, জিনার নিকটেও যেও না, তা অত্যন্ত খারাপ কাজ, অতি নিকৃষ্ট পথ। (সূরা বনি ইসরাঈল-৩২)

www.pathagar.com

এখানে অর্থাৎ, ইসলামী সমাজ তথা ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় কাউকে ঠকানোর সুযোগ নেই। আল্লাহর রাসূল (সা.) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন–

অর্থাৎ, যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়।

এখানে অনাহারে কারো মৃত্যুবরণ করার আশঙ্কা নেই। কারণ প্রতিটি নাগরিকের উপার্জনের একটা সম্মানজনক ব্যবস্থা করে দেয়া অথবা উপার্জনের জন্য সহজ একটা আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া ও সেই পরিবেশকে টিকিয়ে রাখা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্রসীমানার মধ্যে বসবাসকারী যেসব নাগরিকগণ নিজেদের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা তারা নিজেরা করতে পারবে না তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর মতো আহার-বাসস্থান ও বস্ত্রসহ সকল সুবিধাদি রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে পূরণ করতে বাধ্য। এ ছাড়া ইসলামী সমাজটাই এমন যে, এ সমাজের নাগরিকগণ যাদের চরিত্র আকিদা ইসলামী শিক্ষা ও বিশ্বাস অনুযায়ী গড়ে ওঠেছে তারা শুধু নিজেদের নিয়েই মত্ত থাকে না। তারা তাদের পাড়া-পড়শি বা আশপাশের গরিব লোকজনের নিয়তই খোঁজ নিতে থাকেন তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ করেন। তারা একথা খুব ভালোভাবে জানেন যে, তারা নিজেরা নিজেদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকেন– পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে আহার করেন আর অপরদিকে তাদের পাড়াপ্রতিবেশী অভুক্ত থাকবে। অবস্থাটা যদি এরকম হয় তবে তাদের মুসলমান বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বা তাঁর রাসূল (সা.) কেউই স্বীকৃতি দেবেন না। এক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই বিখ্যাত হাদীসটি স্মরণ করুন।

মুসলমানদের সমাজ তথা ইসলামী সমাজে বা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতায় কোনো নাগরিকের বস্ত্রহীন রয়ে যাবার বা অসুস্থতায় পথ্যহীন হবার কোনো আশঙ্কা নেই। কারণ এটি একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র, আর যে আদর্শকে এ রাষ্ট্র ও সমাজ ধারণ করে থাকে যার ওপর ভিত্তি করে এ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়, পরিচালিত হয় এবং এই রাষ্ট্রের নাগরিকগণের বা এই সমাজের সদস্যগণের চরিত্র গড়ে ওঠে সেই আদর্শ এ শিক্ষাটিও দিচ্ছে। যাতে বলা হয়েছে–

"কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে আল্লাহপাক বলবেন– "হে আদম সন্তান। আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আস নি। তখন বান্দা বলবে, হে প্রভু আপনি তো সমস্ত সৃষ্টির পালনকারী। আমি কীভাবে আপনাকে দেখতে আসব? আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দাহ অসুস্থ ছিল। তুমি তাকে দেখতে যাও নি। তুমি কী জানতে না যে যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে, তবে তার নিকট আমাকে পেতে। আবার বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাও নি। বান্দাহ বলবে, হে প্রভু আপনি তো সারাজাহানের প্রতিপালক, আপনাকে কীভাবে আমি খাবার দেব?

www.pathagar.com

তখন আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দাহ তোমার নিকট খাবার চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাও নি, তুমি কী জানতে না যে, যদি তুমি তাকে খাবার দিতে তবে তার নিকট আমাকে পেতে। আল্লাহ আবার বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি পিপাসার্ত হয়ে তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাও নি, তখন বান্দাহ বলবে– প্রভু আপনি তো সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক, আমি কীভাবে আপনাকে পানি পান করাব? তখন আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দাহ তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি দাও নি। তুমি কী জানতে না যে তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে তবে তার নিকট আমাকে পেতে।

অন্যত্র বলা হয়েছে–

"যে দরিদ্র ও অভাবীকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে কোনো রোগীকে দেখতে যাবে, তার জন্য সারাটা দিন ও সারাটা রাত সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করতে থাকবে আর তার জন্য বেহেশতে বাগান তৈরি করা হবে।"

এ শাসনের আওতায় কোন পাপিষ্ঠ ধর্ষকের এ সুযোগ নেই যে, সে একের পর এক ধর্ষণ করেই যাবে এবং শেষ পর্যন্ত সে ধর্ষণের সেঞ্চুরি উদ্‌যাপন করবে। এখানে কোন প্রভাবশালী শিল্পপতির এ সুযোগ নেই যে ব্যাংক হতে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে সে ঋণ ফেরত না দিয়ে পার পেয়ে যাবে বা সমাজে নেতা হয়ে বুক ফুলিয়ে চলবে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার এ ধরনের আত্মসাৎকারী দুরাচার প্রতারক তৈরি হবার কোনো সুযোগই থাকে না। কোনো সময় কোনো সুযোগে এ ধরনের অপরাধ যদি কেউ করেই বসে, সকল ধরনের শাসন ও আইনের বেড়াজাল ডিঙিয়ে, তবে সে ক্ষেত্রে ইসলামী শাসকবর্গ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক এ সমস্ত অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া শাস্তি এত দ্রুত ও এত কঠোরতার সাথে প্রয়োগ করেন যে, সে শাস্তির নমুনা অবলোকন করার পর আর কোন দুর্বৃত্তের ধর্ষণ বা পরসম্পদ আত্মসাতের বিন্দু পরিমাণও খায়েশ অবশিষ্ট থাকে না, থাকতে পারে না।

আমরা ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের ঘটনায় দেখতে পাই বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসক আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.) রাতের আঁধারে বিশ্রাম ত্যাগ করে জনগণের তথা রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনযাপন ও দিনাতিপাতের বাস্তব অবস্থা জানার জন্য পথে পথে, মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন, কখনও নিতান্তই একাকী আবার কখনও তাঁর ব্যক্তিগত ভৃত্যকে সাথে নিয়ে। এরকম এক রাতে তিনি দুস্থ এক পরিবারের সন্ধান পান, যে পরিবারে খাবার কোন ধরনের সংস্থান না থাকার ফলে ক্ষুধার তাড়নায় ক্রন্দনরত কচি

www.pathagar.com

শিশুদের মিথ্যে প্রবোধদানরতা দুঃখিনী মা এর কাছে বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রবল ক্ষমতাধর শাসক আমীরুল মুমিনীন রাষ্ট্রীয় খাদ্যভাণ্ডার হতে নিজ পিঠে করে বয়ে নিয়ে যেয়ে ময়দার বস্তা পৌঁছে দিয়েছেন। ভৃত্য এ বস্তাটি খলীফার পিঠ হতে নিজ পিঠে নিয়ে সেই দুঃখিনী মার নিকট পৌঁছে দিতে চাইলে হযরত ফারুকে আজম জবাব দিয়েছিলেন, এটি আমার দায়িত্ব। কিয়ামতের মাঠে আমাকেই যখন এসব লোকের জন্য জবাব দিতে হবে তখন আজ এ বস্তাটিও আমাকেই বইতে দাও।" বিস্ময়কর এ ঘটনাটি সবিস্তারে আমরা সকলেই জানি।

ইসলামী শাসনের আওতায় অভাবের তাড়নায় কোনো হতভাগ্য পিতা-মাতাকে তাদের প্রিয় সন্তানকে বিক্রি করে দিতে হয় না, যেমনটি ঘটেছে আমাদের এ দেশটায়। এই তো সেদিন যশোর জেলার এক দুস্থ রিকশাচালক আশরাফ অভাব-অনটনে পর্যুদস্ত অনাহারে-অর্ধাহারে ভগ্ন স্বাস্থ্য ও পঙ্গুপ্রায় ঠিকমত রিকশা টানতে পারে না, দিনের পর দিন অনাহারে-উপোসে কাটাতে হয় জীবন পরিচালনায় ব্যর্থ, হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। তাদের একমাত্র ছোট শিশুটির জন্য চিন্তা হয়, তাকে কী করে বাঁচানো যায়। অনেকভাবে অনেক চিন্তা করে স্বামী-স্ত্রী দুজনে অনেক শলাপরামর্শ করে এরপরে সন্তানের জীবন বাঁচানোর জন্য এক হৃদয় বিদারক কিন্তু অভিনব পথ বের করে। কলিজার টুকরো সন্তানকে বাঁচানোর জন্য ধনাঢ্য পরিবারে মাত্র একশত দশ টাকায় সন্তানটি বিক্রি করে দেয়!! (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : মাসিক আত্ তাহরিক, ডিসেম্বর-১৯৯৮ সংখ্যা)

এখানে বস্ত্রের অভাবে ইজ্জত-আব্রু ঢাকতে জাল পরতে হয় না বাসন্তীদের। ইজ্জত হারিয়ে বিচার না পেয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে লজ্জা আর অপমান হতে পালাতে হয় না শবমেহেরকে। আইনের রক্ষক পুলিশের কাছে আশ্রয় নিয়ে এখানে ইয়াসমিনদের ঐ রক্ষক পুলিশের হাতেই ধর্ষিতা হতে হয় না। বরং এখানে ইসলামী শাসনের আওতায় যে সমাজ সেখানে জনগণ রূপ কথার মত সুখ-সমৃদ্ধি আর সার্বিক নিরাপত্তাসহ শান্তির অস্তিত্ব বাস্তবে তাদের ঘরে বসেই পেয়ে যায়। এর জন্য তাদেরকে ছুটে বেড়াতে হয় না। চেষ্টা-তদবির করতে হয় না কারো কাছে, করুণা ভিক্ষা করে ফিরতে হয় না দ্বারে দ্বারে। কারণ এ সমাজে যারা শাসক তাদের চেতনাটা কেমন তার একটি চিত্র আমরা খুঁজে পাই। হযরত ওমর ফারুকের নিম্নল্লিখিত ভাষ্যে তিনি বলেছিলেন–

"আল্লাহর শপথ! আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে সানআর পার্বত্য অঞ্চলে মেষ চালকও স্ব-স্থানে বসে তার অংশ পেয়ে যাবে, তার চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ ব্যতিরেকে (তাঁর একথার তাৎপর্য এই যে, নিজের অধিকার লাভের জন্য তাকে দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না যাতে সে অবসন্ন হতে পারে।)"

www.pathagar.com

এরকম চেতনা যে শুধু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতেগড়া তাঁর মহান সান্নিধ্যে ধন্য সাহাবীদের মধ্যেই ছিল, তা নয় বরং এ চেতনা যেকোনো নিষ্ঠাবান মুমিন মুসলিম শাসকের মধ্যে সৃষ্টি হতে বাধ্য। যদি তিনি প্রকৃত অর্থেই ইসলামী দর্শনে উজ্জীবিত ও পরিচালিত হয়ে থাকেন। এ কথারই বাস্তব প্রতিফলন দেখি ইতিহাসখ্যাত অন্য এক মুসলিম তথা ইসলামী রাষ্ট্রীয় কর্ণধারের কর্মধারায়।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) ইরাকের গভর্নর আবদুল হামীদ ইবনে আবদুর রহমানকে লিখেন, "জনগণকে তাদের ভাতা দিয়ে দাও"। এই চিঠির জবাবে আবদুল হামীদ লিখেন, "আমি জনগণের নির্ধারিত ভাতা পরিশোধ করেছি এবং তারপরও বায়তুল মালে অর্থ উদ্বৃত্ত রয়েছে।" তদুত্তরে উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) লিখলেন, "এখন ঋণগ্রস্ত লোকদের তালাশ করো, তারা কোনো অপব্যয় কিংবা অসৎ কাজের জন্য ঐ ঋণগ্রহণ না করে থাকলে বায়তুল মালের উদ্বৃত্ত তহবিল থেকে তাদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করো।"

এর জবাবে আবদুল হামীদ খলীফাকে লিখলেন, "আমি এরূপ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের ঋণও পরিশোধ করে দিয়েছি। অথচ এখনও বায়তুল মালে যথেষ্ট অর্থ অবশিষ্ট আছে। জবাবে উমর ইবনে আবদুল আযীয লিখলেন, "এখন এমন অবিবাহিত যুবকদের তালাশ করো, যারা নিঃসম্বল এবং তারা পছন্দ করে যে, তুমি তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও। তাহলে তুমি তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও এবং তাদের দায়িত্বে অবশ্য দেয় মোহর আদায় করে দাও।" জবাবে আবদুল হামীদ লিখলেন, "আমি তালাশ করে যত অবিবাহিত যুবক পেয়েছি তাদের বিবাহের বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। তাসত্ত্বেও বায়তুল মালে প্রচুর অর্থ মজুদ রয়েছে।"

জবাবে উমার ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) লিখলেন, এখন এমন লোক তালাশ করো যাদের ওপর জিজিয়া ধার্য করা হয়েছে এবং তারা তাদের জমি চাষাবাদ করতে পারছে না। এসব জিম্মিদের এতটা পরিমাণ ঋণ দাও যাতে তারা তাদের ভূমি সঠিকভাবে চাষাবাদ করতে পারে। কেননা তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক এক-দুই বছরের জন্য নয়।" (ইসলামে মানবাধিকার, মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন, পৃ.-২৮৬-২৮৭)

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

ইসলামী রাষ্ট্র ও শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা একজন ব্যক্তির অন্যতম একটি মৌলিক চাহিদা। শিক্ষা একজন ব্যক্তির মানসিক সত্তাকে বিকশিত করে, তাকে তার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করে। শিক্ষা একজন ব্যক্তির দৃষ্টির সম্মুখে তার জীবনের লক্ষ্যকে তুলে ধরে এবং সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের সঠিক পথপ্রদর্শনের পাশাপাশি তা অর্জনের পথে পরিচালিত করে। শিক্ষা একজন ব্যক্তি ও পারিপার্শ্বিকতা এ দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ককে চিহ্নিত করে দেয়। উভয়ের যথাযথ ও সঙ্গত অবস্থান এবং দায়িত্বকে নির্দেশ করে দেয়। শিক্ষা ব্যতীত একজন মানুষ শুধুই যে অজ্ঞ ও নির্বোধ রয়ে যায়, তাই নয় বরং প্রকৃত অর্থে একজন মানুষ মানুষ হিসেবেই অপূর্ণাঙ্গ রয়ে যায়। এ অপূর্ণাঙ্গতা শারীরিক অর্থে নয় বরং মানসিক বিকাশ, আদর্শিক পরিচিতি এবং সচেতনতা অর্থে।

বিশ্বের বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। প্রখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণযোগ্য, তাঁর মতে শিক্ষা হলো নিজেকে জানা। একজন প্রকৃত জ্ঞানীর উদ্দেশ্য হলো নিজেকে জানা, Know Thyself।

অন্য এক পশ্চিমা দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ (Neimeyer) বলেন- "Education is the concious physical and mental influence exerted on in childhood and youth in Order to bring him to a higher conciousness and to Develop all his faculties and power.

অর্থাৎ, (একজন মানুষকে) একটি উন্নত সত্তায় উন্নীতকরণ ও তার সকল মেধাশক্তি ও প্রতিভাকে বিকশিত করার লক্ষ্যে শৈশব ও যৌবনে সচেতনতার সাথে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রভাবিত করার যে প্রক্রিয়া তাই হলো শিক্ষা।

অন্য এক মনীষী ও শিক্ষাবিদ এর মতে Education is the Key of Uplock Prospect অর্থাৎ "মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ বা দ্বার উন্মোচনের নাম-ই হল শিক্ষা" আবার কেউবা বলেছেন- "Education is the adaptability অর্থাৎ "পরিবেশগত ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতার নাম-ই হলো শিক্ষা।" অপর দিকে Sir Milton এর মতে "Educatidn is the harmonious development of

www.pathagar.com

Body, Mind, and soul অর্থাৎ "শরীর-মন ও আত্মা'র সমন্বিত উন্নয়নের নামই হলো শিক্ষা।"

ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে যদি আমরা বিষয়টি বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমরা শিক্ষাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যে "শিক্ষা" হলো একটি সু-সমন্বিত প্রক্রিয়ার নাম, যার দ্বারা একজন ব্যক্তির ব্যক্তি সত্তার এতটা উন্নয়ন ঘটানো যায় যে, ব্যক্তি তার নিজের যথার্থ পরিচয় পাবার পাশাপাশি পারিপার্শ্বিকতার সাথে তার সম্পর্ক ও দায়িত্ব, তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, স্রষ্টার পরিচয় ও তাঁর সাথে নিজ সম্পর্ক, জীবনের লক্ষ্য ও তা অর্জনের পথ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে।"

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন মনীষীর বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয় তেমনি এর উদ্দেশ্য নিয়েও মত পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে অথবা বিভিন্নজনে বিভিন্নভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে চিত্রায়িত করতে পারেন। Sir Milton এর দেয়া সংজ্ঞাকে ধর্তব্যে নিলে মানতেই হয় যে শরীর-আত্মা ও মন এ ত্রয়ের সমন্বিত উন্নয়নই হলো শিক্ষার উদ্দেশ্য।

অপর মনীষীর প্রদত্ত সংজ্ঞাকে স্বীকার করে নিলে আমাদের মানতেই হয় যে, আর্থ-সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিকসহ যেকোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজকে যথাযথভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারাই হলো শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আর উদ্ধৃতি না বাড়িয়েই বলতে চাই যে, এসব সংজ্ঞাসমূহের সবকটিই অপূর্ণাঙ্গ ও সংকীর্ণতাকে ধারণ করে আছে। উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি তো মানুষের চরিত্রে একটি সুবিধাবাদী দিকের উন্মোচন ঘটিয়ে দেয়।

ব্যক্তির নিজ মনে পোষণ করা দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন ও আকিদা-বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই এ বিষয়ে মতামত পেশ করে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, দর্শনে ও বিশ্বাসে ব্যাপক ও গভীর পার্থক্য থাকার কারণে এ বিষয়ে মত পার্থক্য সৃষ্টি হতে বাধ্য। তাই আমরা বরং সে দিকে না যেয়ে যদি সর্বগ্রাহ্য একটি উদ্দেশ্যকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে স্থির নির্ধারণ করতে পারি তা হলে সম্ভবত সেটিই হবে বেশি কল্যাণকর।

এ বিষয়ে জটিল ও বিস্তারিত আলোচনা এবং বিতর্কের সূত্রপাত না করে আমরা বরং একটি স্বতঃসিদ্ধ কথায় একমত হতে পারি তা হলো একটি জাতির ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও তাদের জীবনের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক লক্ষ্য অর্জনই হলো শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লিখিত বক্তব্য

www.pathagar.com

ও দর্শনকে যদি আমরা মেনে নেই তাহলে মুসলমান জাতি হিসেবে কোন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসরণ আমাদের করতে হবে, ইসলামী দর্শনভিত্তিক একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার মুসলিম নাগরিক হিসেবে কোন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সমাজ তথা রাষ্ট্রে প্রবর্তিত হতে হবে তা মেঘমুক্ত আকাশের মত স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে যায়।

দেশ বা সমাজের অনুসৃতব্য শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য যদি ঐ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম, দর্শন, আকিদা, সংস্কৃতির উন্নয়ন ও রক্ষা এবং তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের পথকে সুগম করা হয়ে থাকে তবে এ কথা অত্যন্ত দুঃখ, লজ্জা ও পরিতাপের সাথেই স্বীকার করে নিতে হয় যে, আমরা বর্তমান বিশ্বের মুসলমানরা শিক্ষা ব্যবস্থার তথা শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিদারুণভাবে অসচেতন হয়ে পড়ে আছি অথবা জেনে-বুঝে আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আকিদা-বিশ্বাস দর্শনবিরোধী ভূমিকায় নিজেদের দাঁড় করিয়েছি অথবা কোন অপশক্তি এরকম একটা অবস্থানে এনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আর আমরা বিনা প্রতিবাদে সে অবস্থান মেনে তো নিয়েছি-ই, আরও দুঃখজনক হলো যে, এ অবস্থানকে আমরাই আমাদের সমস্ত মেধা, শ্রম ও যোগ্যতা দিয়ে টিকিয়ে রেখেছি।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সবকটি মুসলিম দেশে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের বিশ্বাস-আদর্শ ও আকিদাবিরোধী একটি অসংলগ্ন সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর প্রকৃত কারণ ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা আলোচনা করার ক্ষেত্র এটি নয়, তবে শুধু এতটুকু অবশ্যই আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, ইউরোপীয় রেনেসাঁ, ফরাসি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব ইত্যাদি বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনা ও সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে পশ্চাৎপদ ইউরোপ অতি দ্রুততার সাথে একটি আমূল পরিবর্তনের পথে ধাবিত হয় এবং সমগ্র ইউরোপ ও খ্রিষ্ট সমাজব্যাপী জনমানসে চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের সূচনা ঘটে। এর পাশাপাশি ঐ একই সময়ে যুগপৎ ঘটনা হিসেবে মুসলিম বিশ্বে উমাইয়া, আব্বাসীয়, মূর ফাতেমীয় খিলাফত ব্যবস্থায় কর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের (দু একটি ব্যতিক্রম বাদে) সীমাহীন গাফলতি-ব্যর্থতা ও দায়িত্বহীনতা, উদীয়মান শক্তি হিসেবে খ্রিষ্টীয় শক্তির সাথে ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সংঘাত, ক্রুসেড যুদ্ধজনিত ভূ-রাজনৈতিক ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিবর্তনসহ আরও নানাবিধ কারণে মাত্র কয়েকটি শতাব্দীর মধ্যে খ্রিষ্ট বিশ্ব পুরোটা মুসলিম বিশ্বকে হয় সামরিক নয়তো আদর্শিকভাবে পরাভূত করে ফেলে এবং তারাই মুসলিম দেশসমূহে শাসক-প্রশাসকের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বসে।

www.pathagar.com

বিজয়ী ও প্রাধান্য বিস্তারকারী এ গোষ্ঠীটি (খ্রিষ্ট বিশ্ব) বিজিত গোষ্ঠীর (মুসলমান) স্বতন্ত্র-স্বকীয়তা, তাদের আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক পৃথক অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে ফেলার লক্ষ্য নিয়ে অতি দ্রুতগতিতে ক্ষিপ্রতার সাথে মুসলিম জনপদসমূহে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাল। যে শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের মন হতে আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মপরিচয়ের লেশটুকু পর্যন্ত নির্মূল করে ফেলল। মূলত এ লক্ষ্যটুকুই অর্জনের জন্য খ্রিষ্টান দখলদারী ও ঔপনিবেশ শক্তি মুসলমানদের সমাজে একটা অদ্ভুত ও বিপরীতধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে। তারা এ কথা খুব ভালো করেই উপলব্ধি করেছিল যে, অধিকৃত এসব জনপদের মুসলমান জনগোষ্ঠী যদি নিজেদের পরিচয়, নিজেদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য, নিজেদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন রয়েই যায় তাহলে তাদের ওপর শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ও প্রতিষ্ঠিত রাখা খ্রিষ্ট বিশ্বের জন্য মোটেও সম্ভবপর হবে না। তাদের এ উপলব্ধির স্বীকৃতি পাই যখন দেখি ভিক্টোরিয় যুগের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন নিজের এক হাতে পবিত্র আল-কুরআন উঁচু করে তুলে ধরে তা দেখিয়ে কমনস্ সভায় উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাষায় বলেন– "মিসরীয়দের হাতে যতদিন এই পুস্তকটি থাকবে ততদিন আমরা মিসরে নিরিবিলি, শান্তিতে থাকতে পারব না।" তাই মুসলমানদের সোনালি ঐতিহ্য ও ইতিহাস হতে বিচ্যুত করে তাদের জীবনের উন্নত শাশ্বত দর্শন, মহত্তম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হতে বিচ্যুত করে ও তা ভুলিয়ে দিয়ে তাদেরকে এমন একটি জাতি সত্তায় পরিণত করার প্রয়োজন পড়ল যাদেরকে সহজেই শাসন করা যাবে এবং তাদের আত্মপরিচয় অবলুপ্ত হবার কারণে তাদের ভেতরে প্রতিরোধ চেতনাও অবলুপ্ত হয়ে পড়বে।

এ উপলব্ধি হতেই দখলদার খ্রিষ্টশক্তি প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত জনপদে ঐ দেশ ও সমাজের জনমানসের পরিপন্থী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে বসে। মিসরে ব্রিটেন, আলজেরীয়া-তিউনিশিয়া-লিবিয়া ও মরক্কোতে ফরাসি এবং এই ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ তাদের রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা বলে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয় যা মুসলমান জনগোষ্ঠীর চেতনা ও আদর্শের পুরোপুরি বিপরীত বস্তুবাদী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের এ অঞ্চল অর্থাৎ, ভারতীয় উপমহাদেশে এ কাজটি সম্পন্ন করা হয় ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে।

কিন্তু তারও অনেক আগে নিজেদের প্রবর্তিত এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালু করার পূর্বে ইংরেজ দখলদার শক্তি আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত ইসলামী শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ ও তার সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেন অর্জিত না হয় সে ব্যাপারে তৎপর হয়। এ উদ্দেশ্যে তারা সরকারি উদ্যোগে এ দেশের মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা নির্মাণ করে। ১৭৮০ সালে বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস এর শাসনামলে

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম এ উদ্যোগ তারা নেয়। মজার ব্যাপার হলো তাদের এ ধরনের উদ্যোগ এর পেছনে যে দুরভিসন্ধি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের পদে কুরআন-হাদীস না জানা, না মানা একজন খ্রিষ্টান ইংরেজকে নিয়োগদানের ঘটনা দেখে। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ম্যাকলে ভারতীয় ইংরেজ সরকারের নির্দেশে ভারতীয় জনগণের জন্য এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার খসড়া সরকারের নিকট উপস্থাপন করেন যে, নতুন প্রস্তাবিত এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রকারান্তরে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকে রক্ষা করবে এবং সর্বতোভাবে ব্রিটিশ স্বার্থ সুবিধা নিশ্চিত করবে। এ ব্যাপারে বলতে যেয়ে লর্ড ম্যাকলে তার সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন– এই শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ কথা– কাজে ভারতীয় হলেও চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে হবে সম্পূর্ণ ইউরোপীয়।

এ শিক্ষা ব্যবস্থাটি বলাই বাহুল্য ছিল সম্পূর্ণ একটি সেক্যুলার (Seculnr) ও বস্তুবাদী ধর্মহীন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। একটি ঔপনিবেশিক শক্তি দখলদার বিদেশী বিজাতীয় গোষ্ঠী তাদের নিজ স্বার্থ রক্ষা, নিজ দখলদারিত্বকে প্রলম্বিত ও নির্বিঘ্ন করার জন্য তাদের স্বার্থ সহায়ক একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তারপরবর্তী দীর্ঘ দেড়শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সেই দখলদারী বিদেশী শক্তি প্রস্থান করলেও এবং এ অঞ্চলে ভূ-রাজনৈতিকসহ ব্যাপক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হলেও আজ পর্যন্ত সেই একই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ভারত সরকার তাদের নিজ স্বার্থ ও প্রয়োজনের নিরিখে কিছু কিছু সংস্কার করলেও মুসলিম প্রধান দুটি দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বলতে গেলে কোন মৌলিক পরিবর্তন ছাড়াই সেই একই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

Secular শিক্ষা ব্যবস্থা

Secular শব্দটির বাংলা অর্থ কী এ নিয়ে আমাদের দেশে জ্ঞানপাপী একটি চক্র বড় চতুরতার সাথে স্বেচ্ছায় একটা প্রহেলিকার ধোঁয়া তৈরি করেছেন। ইংরেজি ভাষার এ শব্দটিকে ঐ ভাষার লোকজনই ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন এবং তারা তা করেছেনও, কিন্তু সমস্যা হলো একটা হীন উদ্দেশ্যকে অর্জন ও প্রতিষ্ঠা করার অশুভ লক্ষ্য নিয়ে এক ধরনের বিশ্বাসঘাতক গাদ্দার অশিক্ষিত অথবা স্বল্প শিক্ষিত আপামর জনগোষ্ঠীকে ফাঁকি দিয়ে চলেছে, তারা বলছে Secular মানে হলো ধর্মনিরপেক্ষতা, অর্থাৎ যার যার ধর্ম-কর্ম সে সে পালন করবে, এ ধরনের বহু চটকদার প্রগলভতা দিয়ে একটা অস্বচ্ছতার আবহ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। অথচ Secular শব্দটিকে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে স্বয়ং ইংরেজ ভাষী বুদ্ধিজীবীরা কী বলেন আসুন তা দেখা যাক। Oxford Dictionary তে Secularism এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

www.pathagar.com

"Belief that morality, Education should not be based on religion"

অর্থাৎ, "এটি এমন একটি বিশ্বাস বা মতবাদ, যাতে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, শিক্ষা ইত্যাদি ধর্মনির্ভর নয়।"

তার মানে হল নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, শিক্ষা-দীক্ষা এসবই হল ধর্ম হতে মুক্ত অর্থাৎ, এসবে ধর্মের কোন অস্তিত্ব নেই, সোজা কথা এবং চূড়ান্ত কথা হলো "ধর্মহীনতা"। এখানে ধর্মনিরপেক্ষ মানে প্রতিষ্ঠা করার কোনো সুযোগই নেই বরং উল্লিখিত সংজ্ঞার দিকে নজর দিলে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যায় যে Secularism মানে হলো ধর্মহীনতা, Secular শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ Secular Education System এর মানে হল ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা। ধর্মের প্রভাব, তার পৃথক অস্তিত্ব, তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে মানুষের বাস্তব জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে অস্বীকার করেই এ মতবাদটি প্রতিষ্ঠা পায়। এটি স্পষ্টতই একটি কুফরি মতবাদ।

শিক্ষার সাথে ধর্ম, ধর্মীয় চেতনা, বিধি-বিধান এর সম্পর্ককে কী পৃথক করা যায়? কেউ কী এ দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ককে অস্বীকার করতে পারে? ধর্ম-ই তো মানুষের কাছে প্রকৃত ও যথাযথ জ্ঞানকে উন্মোচিত করে তোলে। ধর্মই মানুষকে তার পৃথক সত্তা ও অস্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় ও ঠিকানা সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়েছে। ধর্মই মানুষকে তার মনে সকল জটিল ও ছোট-বড় প্রশ্নের জবাব বোধগম্য এবং যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তুলে ধরে। এই ধর্ম মানুষের সৃষ্ট নয় বরং মানুষের মধ্য হতে নির্বাচিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে মানুষসহ সমগ্র বিশ্ব মাখলুকাতের একমাত্র স্রষ্টা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার অহী আকারে দিয়েছেন। এই অহী আর কিছুই নয়, এই অহী হলো শিক্ষা, আল্লাহ তাঁর নির্বাচিত প্রিয় বান্দাদের শিক্ষা দিয়েছেন আর নির্দেশ দিয়েছেন ঐসব নির্বাচিত প্রিয় বান্দাদের (নবী/রাসূল) তাঁরা যেন এই শিক্ষা (অহী)কে ব্যতিক্রমহীনভাবে আপামর জনগণের নিকট পৌছে দেন, তাদের তা শিখিয়ে দেন। যেহেতু সকল জ্ঞানের একমাত্র উৎস আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাই তাঁর নাযিল করা অহীই প্রকৃত শিক্ষাকে ধারণ করেছে। এই অহীভিত্তিক জ্ঞানই হলো মানবতার জন্য কল্যাণ ও মুক্তি নিশ্চিতকারী জ্ঞান। অতএব মানবতার সমগ্র চাহিদা পূরণ তার সার্বিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধিকে যদি সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত করতে হয় তবে অবশ্যম্ভাবীভাবে মানবতার জন্য প্রণীত সকল শিক্ষা ব্যবস্থাকে অহীর শিক্ষার ভিত্তিতে অর্থাৎ ধর্মীয় বিধি-বিধানের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে হবে। এর সোজা অর্থ হলো শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে ধর্মভিত্তিক ।

www.pathagar.com

ধর্মভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে প্রকৃত মানব শিশুর মানবীয় প্রতিভা ও মেধা, নৈতিকতা ইত্যাদির প্রস্ফুটন বা বিকাশ ঘটে না বরং একজন মানব শিশু কিছু অক্ষরজ্ঞান, কিছু ফর্মুলা, কিছু বিদ্যা মুখস্ত করে আরও বেশি অজ্ঞানতার আঁধারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, সেক্যুলার বা ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব ব্যক্তি একজন অশিক্ষিত মূর্খের চেয়েও সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য শতগুণ বেশি ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকারক হিসেবে প্রমাণিত হয়। একজন অশিক্ষিত, মূর্খ নাগরিক বড়জোর রাষ্ট্রের জন্য একটি অনুৎপাদনশীল বোঝায় পরিণত হতে পারে কিন্তু এর বিপরীতে একজন সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি যার মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ইতিহাস, সমাজসহ অন্যান্য বিষয়ে কম-বেশি জ্ঞানের উদ্রেক হয়েছে কিন্তু নৈতিকতার তথা উন্নত নৈতিকতার উন্মেষ ঘটেনি। (সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থাৎ ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নত নৈতিকতার উন্মেষ ঘটা আদৌ সম্ভব নয়), তাকে সমাজ, রাষ্ট্র অথবা প্রশাসনের যেখানেই বসানো হোক না কেন তারা সেখান হতেই অর্থাৎ তাদের নিজ নিজ অবস্থান হতেই রাষ্ট্র-সমাজ এবং সমগ্র অর্থে মানবতার জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড শুরু করে। এ কারণেই বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা প্রযুক্তি ও প্রাচুর্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ বলে দাবিদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষার হার শতকরা একশতভাগ থাকা সত্ত্বেও এ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা অপরাধ বহুল দশটি শহরের মধ্যে ছয়টির অবস্থানই সে দেশে, এর অন্যতম ও মৌলিক কারণ হলো তাদের সমাজে সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় তার দ্বারা নাগরিকদের ভেতরে যে ধরনের বা যত ধরনের পরিবর্তন বা উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হোক না কেন, তাদের আদর্শ ও নৈতিকতার কোন উন্নয়নই ঘটেনি ফলে এসব তথাকথিত শিক্ষিত সম্পদগুলোই ঐ রাষ্ট্রের জন্য সমস্যায় পর্যবসিত হয়েছে।

শিক্ষার সাথে ধর্মের গুরুত্ব বা ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে প্রখ্যাত এক পশ্চিমা খ্রিষ্টান শিক্ষাবিদ অত্যন্ত চমৎকার ও বিখ্যাত একটি মন্তব্য করেছিলেন, এখানে তা উল্লেখ করা যেতে পারে–

Sir Stanly Hall একবার বলেছিলেন– "If you teach your children with three R's (Reading. Writing, arithmatic) Leaving the fourth 'R' (Religion) then you will get the fibth 'R' (Rascality)" আজ সমগ্র বিশ্ব, এমনকি আমাদের দেশে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব নাগরিক তৈরি হচ্ছে এরাইতো হত্যা ধর্ষণ, সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি ছিনতাইসহ যাবতীয় অপরাধ কর্মের সাথে জড়িত। আমাদের দেশসহ সমগ্রভাবে সমগ্রবিশ্বে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় উপরোল্লিখিত

www.pathagar.com

বক্তব্যের সেই চতুর্থ "R" religion বা ধর্ম এর সংশ্লিষ্টতা না থাকায় Sir Stanly Hall এর আখ্যায়িত পঞ্চম 'R' অর্থাৎ Rascality এর প্রাদুর্ভাব সীমাহীনভাবে ও অত্যন্ত আশংকাজনক পর্যায়ে বেড়ে গেছে। বলতে দুঃখ হয়, লজ্জাও হয়, তবুও সত্যকে স্বীকার না করে কোন পথ নেই যে, আজকের বিশ্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রে (সামান্য দু একটি ব্যতিক্রম বাদে) সমাজ সভ্যতাসহ সার্বিক মানবতার নেতৃত্বের ও পরিচালনায় দায়িত্ব রয়েছে এই পঞ্চম 'R' বা Rascality এর ধারক ও বাহকদের হাতে। এটা সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য যেমনি অপমানজনক তেমনি গভীর দুঃখেরও কারণ বটে।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় ইসলামী দর্শন ও আদর্শকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত একটি রাষ্ট্রে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নাগরিকগণ ইসলামী দর্শনের অনুসারী ও ধারক-বাহক মুসলমান, সেখানে এটাই ইনসাফের দাবি যে, তাদের রাষ্ট্রে তাদের জন্য প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাটিও হবে ইসলামী দর্শনভিত্তিক অর্থাৎ, অহীর জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে ইসলামী শিক্ষার নামে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে, যদিও তা ইসলামের নামেই চালু রয়েছে এবং যদিও সেখানে কুরআন-হাদীসভিত্তিক শিক্ষাই দেয়া হয়ে থাকে তবু সে শিক্ষা ব্যবস্থা একটি স্বাধীন দেশ ও জাতির জন্য অপূর্ণাঙ্গ, একটি দেশ ও জাতির জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। বস্তুত এটাই বাস্তবতা যে, একটি বিশেষ সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীকর্তৃক এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের ইসলামী চেতনা বিকাশ, তাদের ভেতরে যুগোপযোগী যোগ্যতা ও দক্ষতা তৈরি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করায়ত্ত করার মত এবং তা পরিচালনা করার মত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যাবলি যেন প্রস্ফুটিত না হয়, তার জন্যই এরকম গোঁজামিল দেয়া একটি শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা নামে চালু করে আপামর মুসলিম জনগণকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলা হয়েছে এবং প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ভবিষ্যতে এই মুসলিম সমাজে চালু করার সম্ভাবনাকেও সুদূর পরাহত করা হয়েছে। এ কাজটি করা হয়েছে অত্যন্ত চতুরতার সাথে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতরেই রয়েছে গলদ ও অপূর্ণাঙ্গতা, এটি মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি অংশকে কর্মোদ্দীপনাহীন অদূরদর্শী, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অনুপযুক্ত চেতনাহীন একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত করতে সফল হয়েছে আর এটিই ছিল এর প্রণেতাদের কাঙ্ক্ষিত। অথচ ভারতের লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক ১৭৮০ সালে প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মাদ্রাসাসমূহ আর যাই হোক, মুসলিম জাতিসত্তার বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা পূরণ ও মুসলিম জনগণকে সমকালীন যুগোপযোগী যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলার নিমিত্তে প্রবর্তিত হয়নি বরং সেটি প্রবর্তিত হয়েছে পূর্বেই বলেছি

www.pathagar.com

একটি সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র ও প্রতারণাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, হীন রাজনৈতিক স্বার্থে। মুসলমানদের জন্য প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমানরা মোটেও লাভবান হয়নি বরং লাভবান হয়েছে তাদের আদর্শিক দুশমন আধিপত্যবাদী শক্তি ও তাদের দোসররা। মুসলমানরা এ শিক্ষা ব্যবস্থায় সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়ে সমসাময়িক বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে নিজেদের অঙ্গীভূত করে, নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ এবং নিজেদের সমস্যাসমূহের যথাযথ সমাধান উদ্ভাবনে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়ে পিছিয়ে পড়েছে।

এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে এর প্রতিরোধ কল্পেই হোক আর মুসলমানদের নিদেনপক্ষে ঈমানের প্রাথমিক স্তরটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্যই হোক আল্লাহর এক নিবেদিত প্রাণ ও দূরদর্শী বান্দা হাজী মুহাম্মদ মহসীন ১৮১৭ সালে সর্বপ্রথম বেসরকারি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে এবং নিজের অর্থ ব্যয়ে। তাঁর এ উদ্যোগটি মহৎ ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটুকু স্বীকার করতে হয় যে, তৎকালীন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পট পরিবর্তনের আলোকে দূরদর্শী পরিকল্পনা প্রণয়নে যোগ্য মুসলিম উম্মাহর পতনের পেছনে সঠিক কারণ নির্ণয় ও উপলব্ধিতে সক্ষম শিক্ষাবিদ এর অনুপস্থিতি অথবা তাঁর এ মহৎ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হতে না পারা বা না হওয়ার ফলে দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসীন এর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ও তাঁর অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত অন্য মাদ্রাসাসমূহ হতে কুরআন-হাদীস এর কারী, মোহাদ্দীস, হাফিজ, ইমাম, মোয়াজ্জিন ইত্যাদি তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেও এসব লোকদের মধ্যে কেউই কিন্তু ব্যতিক্রম কিছু হতে কিংবা সে যুগে মুসলিম সমাজের চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়ে জন্মালেন না। এঁরা সমাজে বক্তা ওয়ায়েজ, মাদ্রাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম-মোয়াজ্জিন, বিবাহ-নিকাহ রেজিস্ট্রার হতে পারলেও কেউই কিন্তু ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, পত্রিকার সম্পাদক, দক্ষ সংগঠক, যশস্বী শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলী, বৈজ্ঞানিক আইনবিদ সমাজ বিজ্ঞানী, গবেষক হতে পারলেন না। ফলে তীব্র প্রতিযোগিতা পূর্ণ সমাজে অন্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় এঁরা মুসলিম জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠী, আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থে সমগ্র মুসলিম উম্মাহই পিছিয়ে পড়তে থাকলেন। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর পরে এসে দেখা গেল সমগ্র বিশ্বজুড়ে পুরো মুসলিম জনগোষ্ঠীই এক সীমাহীন পশ্চাৎপদতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। তাই তো আমরা দেখতে পাই বিগত বেশ কয়েক শতাব্দী, সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, বিগত প্রায় এক হাজার বছর সময়ের মধ্যে মুসলিম বিশ্বে আর একজনও ইবনে সিনার

www.pathagar.com

মত চিকিৎসক দার্শনিক, আল-রাজীর মত গবেষক রসায়নবিদ, ইবনে রুশদ এর মত চিকিৎসাবিজ্ঞানী তৈরি হলো না, যারা অধুনা বিশ্বের বৈরী প্রতিপক্ষের হাত থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব করায়ত্ত করতে পারত। কে না জানে যে এই ইবনে সিনা, আল-রাজী, ইবনে রুশদ এদের শিক্ষা ও গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেছে এই আজকের গর্বিত ও উদ্ধত পশ্চিমা বিশ্বের জ্ঞান-গবেষণা ভাণ্ডার।

আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সাথে ইসলামী দর্শন তথা কুরআন ও হাদীস-এর শিক্ষার সুসমন্বয় করানো গেলে অচিরেই মুসলিম বিশ্বের আনাচে-কানাচে ঐসব মনীষীদের মত আজও তৈরি হয়ে যেত বিশ্ব বরেণ্য একদল বিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণা তথা বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে এতটাই অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠতেন যে, স্বল্পতম সময়ের ভেতরেই এই গোষ্ঠীর হাতে ওঠে আসত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তথা সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব। সাথে সাথে এই নেতৃত্বের আসনেই অধিষ্ঠিত হতো সকল বিশ্বের আপামর মুসলিম উম্মাহ।

আজ যদি বিশ্বের কোথাও পরিপূর্ণভাবে যথার্থ অর্থেই একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েই যায় (এবং আমার কথা হলো এই যে, বিশ্বের কয়েকটি অঞ্চলে চালু থাকা ইসলামী আন্দোলন সকল বাধা-বিপত্তি ও অপপ্রচার সত্ত্বেও এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে এবং সেসব অঞ্চলে রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে এতটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে যে, আগামী কয়েকটি দশকের মধ্যেই ইনশাআল্লাহ এরকম পূর্ণাঙ্গ কয়েকটি ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে-এ সম্ভাবনা যেমন মুসলমানদের কাছে দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে ওঠছে তেমনি অমুসলিম সম্প্রদায়ও এরকম আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে ওঠছে প্রতিদিনই) তবে সেখানে অহীভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও আধুনিক জ্ঞান-গবেষণা ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা, এ উভয়ের সমন্বয়ে এমন একটি যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে, যার মধ্যে কোন ধরনের বৈষম্য থাকবে না, দৃষ্টিভঙ্গির কোন সংকীর্ণতাও থাকবে না। ফলে সে শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় খুব স্বল্পতম সময়ের ভেতরেই এমনসব যোগ্য লোক, যোগ্য মুসলমান তৈরি হয়ে যাবে যাদের মধ্যে বা কোন আদর্শিক স্ববিরোধিতা থাকবে, আর না থাকবে কোন ধরনের হীনম্মন্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতা। বরং এ গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যই হবে পঞ্চম R (Rascality) হতে মুক্ত, বৃহত্তর মানবতার জন্য কল্যাণকর একজন মানুষ-এ ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হবে, তার মৌলিক উদ্দেশ্যই হবে শিক্ষার্থীর মন-মগজে আল্লাহভীরুতা জাগ্রত

www.pathagar.com

করা বা জাগ্রত রাখা এবং তা প্রতিষ্ঠা করা। এটাই হলো শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য। এর পরে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা এবং ব্যক্তির নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে বিভিন্ন আধুনিক ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হবে।

ইসলামী শিক্ষার আরও একটি উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির মনে ভালো ও মন্দের মধ্যে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ইলম এর উদ্দেশ্যই হলো ভালো এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া। অপরদিকে অপর এক প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, "অনেক কিছু মুখস্ত করার নাম ইলম নয়, ইলম হচ্ছে অন্তরে আল্লাহর ভয় সর্বাপেক্ষা বেশি জাগ্রত করা।"

উপরে উল্লিখিত বক্তব্যদ্বয়ের ভেতরে যে সত্য নিহিত রয়েছে তাকে সামনে রেখেই এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় নাগরিকদের নৈতিক উন্নয়ন ঘটানো যায়। এ শিক্ষা ব্যবস্থা হবে একমুখী ও সু-সমন্বিত।

বর্তমান বিশ্বে আধুনিক শিক্ষা যেমন মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ অন্য কারিগরি শিক্ষা, যা সার্বিকভাবে মানবতার জন্য কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয়, তা যে সূত্র থেকেই আসুক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্রে তা চালু থাকবে। শুধু চালুই থাকবে না বরং ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখবে, তার প্রসার ঘটাবে। এ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনায় সক্ষম, উপযুক্ত ও যোগ্য লোকদের তথা বিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিকসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে উৎসাহ জোগাবে।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অনৈসলামিক মানবতার জন্য ক্ষতিকর যেকোন শিক্ষা কর্মসূচি পুরোপুরি বর্জন করা হবে (যেমন জাদুবিদ্যা, কার্লমার্কস এর সমাজতন্ত্র ও শ্রেণী সংগ্রাম এর শিক্ষা, সুদকষা হিসাব, যুক্তিবিদ্যা, বৈরাগ্যবাদ ইত্যাদি)

মহিলাদের জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও তাদের উপযোগী স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। রাষ্ট্র তার দায়িত্ব হিসেবে মহিলাদের শিক্ষার সকল সুযোগ ও অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করবে, প্রদান করবে।

প্রতিটি সুস্থ-সবল ও সক্ষম মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রণয়ন ও পরিচালনা করা হবে। শিক্ষাকে ব্যবসা ও ব্যবসায়িক পণ্য এর অবস্থান হতে তুলে নিয়ে একটি সর্বোত্তম ইবাদত এর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

www.pathagar.com

দেশের অমুসলিম নাগরিকদের জন্য তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় পূর্ণ মাত্রায় সহযোগিতা প্রদান করবে, তাদের শিক্ষার অধিকার ও সুযোগকে নিশ্চিত করবে।

শিক্ষকবৃন্দ হবেন সমাজে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁদের যথাযথ সম্মানজনক আসনে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে। তাঁদের যাবতীয় সামাজিক ও নাগরিক সেই সাথে ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ হতে পারে। এমনভাবেই তাঁদের বেতন ও ভাতাদিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রণয়ন করা হবে।

শিক্ষা হবে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার, আর শিক্ষার সুযোগকে এ চেতনায় পূর্ণরূপেই প্রতিষ্ঠা করা হবে। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সুযোগ থাকবে তাদের এ অধিকার যেন তারা রাষ্ট্র হতে পূর্ণ মাত্রায় আদায় করে নিতে পারে। তাদেরকে এ অধিকার প্রদান করাটা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের জন্য ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয় বরং তাদের জন্য এটি বাধ্যতামূলক একটি দায়িত্ব যা যথাযথভাবেই তারা পালনে বাধ্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামী রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি

সংস্কৃতি একটি জাতির পরিচয়। এটা এমন একটা শক্তিশালী মাধ্যম যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমষ্টির সমগ্র চিন্তাধারা ও বোধ-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। সংস্কৃতি জীবনের খণ্ডিত কোন অংশের নাম নয়, বরং সংস্কৃতি হলো পুরো জীবনাচারের নাম, পুরো জীবনের নাম। সংস্কৃতি বলতে জীবনের বিশেষ কোন কর্মকাণ্ডকে বোঝালে জীবনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে ফেলা হয়। এটা জীবনের জন্য একটা বিপর্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। এ অবস্থায় মানুষের বোধে-বিশ্বাসে আর বাস্তব জীবনাচারের মধ্যে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভাজন সৃষ্টি হয়। পরিণতিতে সে একদিন বোধে-বিশ্বাসে, বিশ্বাসে-কর্মে, ভেতরে-বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন সত্তায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। অথচ এ বিভাজন মানবতার মত উন্নত সত্তার জন্য আদৌ সঙ্গত ও সম্মানজনক নয়।

আজকের বিশ্বে আমরা মুসলমানরা এরকম বিভাজিত ও অপমানজনক পরিস্থিতির শিকার। এর জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বোন্নত ও সর্বোত্তম দর্শনভিত্তিক এমন একটা সংস্কৃতি আমাদের ছিল, যা সার্বিক দিক থেকে মানুষের মনের সকল প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ জবাবই শুধু দান করে না, বরং যেকোনো জটিলতা থেকে তাকে মুক্ত রাখে, আর এ বিশ্বের সাথে তার জীবনের বিভিন্ন দিককে সুসমন্বয় ঘটায় এবং এগুলোর মধ্যে বিভাজন রোধ করে। বস্তুত বিশ্বের সাথে সুসমন্বিত ও বিভাজনমুক্ত জীবনই হলো সুখ-শান্তি আর প্রগতির

www.pathagar.com

আধার। কিন্তু আমরা যেদিন থেকে সহজ-সরল, যৌক্তিক ও আদর্শভিত্তিক জীবনাচার বা সংস্কৃতি ছেড়ে, বিশ্বাসকে শুধু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রেখে অবিশ্বাসীদের মত ভোগবাদী সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হওয়া শুরু করেছি, সেদিন থেকেই আমাদের জীবনের সুখ ও প্রশান্তি দূরীভূত হওয়া শুরু হয়েছে। যা আমরা বিশ্বাস করি তা বাস্তব জীবনে পালন করি না বরং সেটাই বাস্তব জীবনে মেনে চলি, যা আমাদের বিশ্বাসের অংশ নয়। এ দ্বৈততা আমাদের বাস্তবজগৎ আর বিশ্বাসের জগৎ-এ বিভক্ত করেছে, আর এ দুটো সত্তাকে দুটো বিপরীতমুখী অবস্থানে নিয়ে ছেড়েছে। যার এক প্রান্তে আমাদের অন্তর্জগৎ, অপর প্রান্তে আমাদের ব্যবহারিক জীবন। এ দুয়ের মধ্যে যোজন। যোজন দূরত্ব আমাদের আজ ধ্বংসের শেষপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। অর্থ, বিজ্ঞান ও কারিগরি দিকসহ বিভিন্ন দিকে কিছুটা অগ্রগতি হয়ত আমরা অর্জন করেছি কিন্তু এ থেকে যে সুখ-শান্তি পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল আমাদের নিজেদের সত্তায়, এই বিভাজনের কারণে তা আমরা অর্জন করতে পারছি না।

আজ যদি আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের অর্থাৎ ইসলামের সেই সুমহান যুগের সোনার মানুষদের ন্যায় জীবনের সরলতা, সুখ-শান্তি আর জীবনের উন্নত রূপ অর্জন করতে চাই-তবে আমাদেরও সেইসব সোনার মানুষদের মত ভেতর-বাহির ও চিন্তা-কর্মে উভয় দিকে পূর্ণ স্বচ্ছতা অর্জন করতে হবে। যতই যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করা হোক না কেন, যতই প্রচেষ্টা চালানো হোক না কেন, মানুষের সত্তায় এ বিভাজন দূর করতে না পারলে তার মনোজগৎ ও বহির্জগৎ, কোনো জগতেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

মানুষের সত্তায় এই বিভাজন সৃষ্টির সবচেয়ে কার্যকর ও অন্যতম মাধ্যম হলো সংস্কৃতি। শয়তান ও তার অনুচরেরা মুসলমানদের সম্মান, সমৃদ্ধি আর উন্নতির চরম শিখর থেকে টেনে নামাতে এই সংস্কৃতিকেই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং এখনও করছে। এ ব্যাপারে তারা আশাতীত রকমের সফলতা অর্জন করেছে। তারা তাদের নগ্নতা-যৌনতা নির্ভর সংস্কৃতি, এই পার্থিব জীবনকে মুখ্য হিসেবে দেখার ও "নগদ যা পাও-হাত পেতে নাও, বাকির নাম ফাঁকি" এই দর্শনভিত্তিক সংস্কৃতি, যা তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে লালন ও পালন করে থাকে-সুকৌশলে তা আমাদের সমাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর আমরা মুসলমানরা আধুনিকতা ও প্রগতির নামে উক্ত সংস্কৃতিকেই জীবনাচার হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং তাতেই বিভোর হয়ে আছি। আমাদের অলক্ষ্যেই এর ফলস্বরূপ আমাদের উন্নত অবস্থান, উন্নত দর্শন, আমাদের শান্তি-সমৃদ্ধির জীবন ও সমাজ সব হাতছাড়া হয়ে গেছে। আর এ পরিণতি হলো জীবনকে খণ্ডে খণ্ডে

www.pathagar.com

বিভক্ত করার, জীবনকে 'ধর্মীয় জীবন' ও 'ব্যবহারিক জীবন' এ দ্বৈত পর্যায়ে বিভক্ত করে ফেলার অনিবার্য ফল, অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, অমোঘ পরিণাম।

এ ধরনের দ্বৈততা সৃষ্টি ও তা লালনের কোন সুযোগ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা দেবে না। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের নামে বর্তমান বিশ্বে যতরকম অশ্লীলতা মানব সভ্যতার কাঁধের উপরে সওয়ার হয়েছে তার বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব ইসলামী শাসন তার নিজ ভৌগোলিক সীমানায় প্রবেশ করতে দেবে না। এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা সে নেবে এ ধরনের যেকোনো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধে।

সংস্কৃতির নামে অশ্লীল ও বিবেকবর্জিত সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র, বিনোদনের নামে নারীদেহ প্রদর্শনী নির্ভর যাত্রা-থিয়েটার, ফ্যাশন শো এ সবের কোনোটি-ই ইসলামী রাষ্ট্র তার ভৌগোলিক সীমানায় চলতে দেবে না। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে চলচ্চিত্র থাকবে না, সঙ্গীত যাত্রা, নাটক ইত্যাদি কিছুই থাকবে না, বরং এগুলো শুধু থাকবেই না, এগুলো রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতায় চালু করা হবে, তবে উপস্থাপনার ধরন ও বিষয়বস্তু পাল্টে যাবে।

ইসলামের রয়েছে এক বর্ণাঢ্য ইতিহাস ও চিত্তাকর্ষক সোনালি ঐতিহ্য। এ সকল ইতিহাস হতে উপাদান নিয়ে তার ওপর ভিত্তি করে রচিত হবে নাটক, চলচ্চিত্র, যাত্রা, সাহিত্য-সঙ্গীত, যে সবের মাধ্যমে দেশের নাগরিকগণ নিজেদের সোনালি ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করবেন। নিজেদের আকিদা ও দর্শন সম্বন্ধে আরও বেশি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞান লাভ করবে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিরেট শুধু চিত্তবিনোদনের মাধ্যম না হয়ে বরং শিক্ষা ও ইবাদত এর এক উৎকৃষ্ট মাধ্যমে পরিণত হবে। সেখানে এমন সব সাহিত্য, সঙ্গীত রচিত হবে ও পরিবেশিত হবে, যা অধ্যয়নে বা শ্রবণে শ্রোতার মনে আল্লাহর অস্তিত্ব ক্ষমতা, তাঁর ভয়, নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ও নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটবে।

বড়ই আশার কথা যে, এ ধরনের সঙ্গীত, সাহিত্য, নাটক রচনা প্রকাশ ও প্রচার আমাদের দেশে আল্লাহর মেহেরবানীতে ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং প্রতিদিনই এসব কার্যক্রম যেমন বাড়ছে তেমনি তা সাধারণ জনগোষ্ঠীর নিকট জনপ্রিয় হয়ে ওঠছে। এ রকম ধারা ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় চালু থাকবে আর এর পাশাপাশি সাহিত্য সাংস্কৃতির নামে অশ্লীলতার সকল পথ রাষ্ট্র তার নিজ দায়িত্বেই বন্ধ করবে।

এর বিপরীতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তার সম্ভাব্য সকল সামর্থ্য ও শক্তি দ্বারা সমাজে সুস্থ ইসলামী সংস্কৃতি বিস্তারের পথকে সুগম করে দেবে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তিদের যথাযথ উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দানসহ সকল ধরনের নৈতিক ও বৈষয়িক সহযোগিতা প্রদান করে যাবে। সমাজে তাদের

www.pathagar.com

পুনর্বাসিত করার মাধ্যমে একটি নিবেদিতপ্রাণ সাংস্কৃতিক কর্মীবাহিনী সদা প্রস্তুত রাখবে। কারণ সুস্থ ও আদর্শভিত্তিক ইসলামী সংস্কৃতি দেশের মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নয়ন এর জন্য অত্যন্ত কার্যকর বলে বিবেচিত হতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ দেশবাসীর চরিত্র তৈরিতে এ কার্যকর মাধ্যমটিকে পূর্ণ মর্যাদার সাথে ব্যবহার করবেন। ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানকালে সারা বিশ্বব্যাপী ইসলাম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ঘোরতর বিরোধী। ইসলামী সরকার সঙ্গীত, সিনেমা, নাটকসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেবে এ ধরনের যেসব শত অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বিগত বেশ কয়েকটি দশক ধরে, তা সে সবের নির্জলা মিথ্যা, সে কথাটিই প্রমাণ করে দেয়।

একাদশ অধ্যায়
ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান

এই তো মাত্র কিছুদিন পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের বিশ্ব বাণিজ্য ও তৎসংলগ্ন টাওয়ারে ঘটে যাওয়া বিস্ময়কর সন্ত্রাসী হামলা ঘটে যাবার পরে সকল আমেরিকান নাগরিকদের মনে সীমাহীন শঙ্কা ও উৎকণ্ঠার জন্ম নেয়। বয়স্কদের পাশাপাশি শিশুরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। শিশুদের মনে জন্ম নেওয়া হাজারো প্রশ্নের জবাব প্রদান ও তাদের আশ্বস্ত করার লক্ষ্যে মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেল এবিসি নিউজ (ABC American Broadcasting Corporation News) এক বিশেষ ও চমৎকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বয়সের শতাধিক শিশু-কিশোর তাদের অভিভাবক, সাইকোলজিস্ট, সাইক্রিয়াটিস্ট, সাংবাদিক, সৈনিকসহ বিভিন্ন পেশার লোকদের নিয়ে অনুষ্ঠান উপস্থাপক পিটার এক চমৎকার মতবিনিময় ও আলোচনার সূত্রপাত করেন। উক্ত সন্ত্রাসী হামলা ঘটে যাবার পরে তাদের ও তাদের অভিভাবকদের নিরাপত্তা, সন্ত্রাস, ধর্ম, গোষ্ঠী ইত্যাদি নিয়ে চমৎকার চমৎকার সব প্রশ্ন করে আর সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিক, সৈনিক, সাইকোলজিস্ট, ধর্মীয় নেতা ও স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে অংশ নিয়ে ওয়াশিংটন হতে এফবিআই (FBI) কর্মকর্তাবৃন্দ এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে শিশুদের আশ্বস্ত করতে থাকেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে একজন মাত্র কিশোরী যার বয়স হয়ত ১২/১৩ বছর হতে পারে, তার মাথায় শোভা পাচ্ছিল 'হিজাব'। এটিই তার পরিচয় তুলে ধরছিল যে সে মুসলমান। পরে অবশ্য আলোচনার এক পর্যায়ে জানা গেল যে, কিশোরী এ মেয়েটি আফগান বংশোদ্ভূত একজন মুসলমান আমেরিকান নাগরিক। অনুষ্ঠান উপস্থাপক পিটার একবার উক্ত কিশোরীর হাতে মাইক্রোফোন ধরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেন যে, সে যে 'হিজাব' পরেছে মাথায় এর কী বিশেষত্ব রয়েছে তার কাছে?

www.pathagar.com

সে কী এ বিষয়ে কিছু বলবে এখানে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের কাছে? মাত্র ১২/১৩ বছরের একটি মেয়ে উপস্থাপকের প্রশ্নের জবাবে অত্যন্ত সাবলীলভাবে সপ্রতিভার সাথে বলিষ্ঠ কণ্ঠে যে জবাব দিয়েছে তা এক কথায় বিস্ময়কর। দীর্ঘ এ অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে দেখেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া ঐ মুসলিম মেয়েটির জবাব হতে এমন কিছু আমি শিখেছি যা একজন পুরুষ হিসেবে আমার জ্ঞান উপলব্ধি ও অভিব্যক্তির বাইরে ছিল অথবা বিষয়টিকে এত অল্প কথায় এতটা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করাটা আমার প্রকাশভঙ্গির বাইরে ছিল। অনুষ্ঠান উপস্থাপকের প্রশ্নের জবাবে উক্ত কিশোরীটি তাঁর পরিচয় তুলে ধরেছে এভাবে। (আমার যতদূর মনে পড়ে)

"In islam, women are the most precise something, I Am wearing the veil, It means I am the most important and precise one In the community. this symbol (veil) bears that testimony"

"অর্থাৎ ইসলামে নারী হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান একজন। আমি হিজাব পরেছি তার মানে হল এই যে সমাজে আমি সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ একজন এ (হিজাব) তারই প্রতীক। আমেরিকার মত একটি অমুসলিম সমাজে মাত্র ১২/১৩ বছর বয়সের এক কিশোরী যে ভাষায় নিজেকে উপস্থাপিত ও চিত্রায়িত করেছে আমিও সেই একই কথার প্রতিধ্বনি করতে চাই মাত্র। বস্তুতই ইসলামে নারী হচ্ছে সবচেয়ে মহার্ঘ বস্তু। মূলত নারীকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে সমাজ। নারী হলো একটি সুস্থ-সুশীল সমাজ গঠনের সূচনা বিন্দু। জীবনের যেকোন পর্যায়েই হোক না কেন, নারী হচ্ছে সমাজ কাঠামোর মূল নিয়ামক শক্তি। নারী হলো মা, নারী হলো স্ত্রী, নারী হলো কন্যা, তিনটি স্তর, তিনটি পরিচয়। আর তিনটিই হলো মানব সমাজে প্রতিটি মানুষের স্নেহ মায়া-মমতা ইত্যাদি মৌলিক জীবনী শক্তি, যা একজন মানুষের মানসিক আত্মিক ও জৈবিক সুস্থতার জন্য অনিবার্য অনুষঙ্গ, সরবরাহের প্রাথমিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উৎস, এই উৎসই যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে উৎসমূল হতে উৎসারিত সকল কিছুই হবে দূষিত। এদের দ্বারা যে পরিবার বা যে সমাজ বা যে রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান গঠিত হবে, তা সবই হবে অস্বাভাবিকভাবে ব্যতিক্রম ও অসুস্থ। এ সত্যটিকে ইসলাম তার শিক্ষা ও দর্শন দ্বারা সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নারীকে মহার্ঘ হিসেবে চিত্রিত করেছে তার যথাযথ মূল্যায়ন করার পাশাপাশি তার যথাযথ ও যোগ্য অবস্থান স্থলকে নির্দেশ ও নির্দিষ্ট করেছে এবং এর পাশাপাশি সে অবস্থান ও মর্যাদাকে সংহত করতে, তা রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানও সে দিয়েছে।

www.pathagar.com

বস্তুত এ কথাটি একটি অকাট্য প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত সত্য যে ইসলামই নারীকে প্রকৃত ও যথাযথ নারী স্বাধীনতা দান করেছে। একজন নারী যতক্ষণ না স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের গণ্ডি অর্থাৎ নারী সংক্রান্ত ইসলামী দর্শনের গণ্ডিতে না আসে ততক্ষণ বিশ্বের কোন দর্শন মতবাদ বা ব্যবস্থাই নারীকে সত্যিকারভাবে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম নয়। কারণ স্বাধীনতা ইজ্জত ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে নারীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে একজন নারীর স্বাধীনতা ইজ্জত অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়টি নির্ভর করে থাকে। আমাদের তথা এ বিশ্ববাসীর বড়ই দুর্ভাগ্য যে অব্যাহতভাবে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার ফলে তাবৎ বিশ্বজুড়ে 'নারী স্বাধীনতা' নারী অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে প্রকৃত ও সঠিক ধারণা ও সংজ্ঞা বিকৃত হয়েছে অবাধ যৌনাচার ও উশৃঙ্খলতা, বেলেল্লাপনা ও সংসার বিমুখতা, স্বেচ্ছায় নিজের নিরাপত্তাকে পদদলিত করা, নিজের নারীসুলভ অস্তিত্ব ও অবস্থানকে ঝুঁকিপূর্ণ করা, দায়িত্ব অবহেলা করে নিজেকে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে নিক্ষেপ করা এসবই আজ নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধারণাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এ যেন বিষকে অমৃত বলে চালিয়ে দেয়ার ঘটনা। বিশ্বের ভোগবাদী দুশ্চরিত্র ও লম্পট একটি গোষ্ঠী অত্যন্ত চতুরতার সাথে, অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে এ জঘন্য কাজটি করেছে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এর আলোকে বলতে গেলে এ কথা না মেনে কোন উপায় নেই যে, নারী শারীরিকভাবে একজন পুরুষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রকৃতির। মানসিকভাবেও সে বড় বেশি দুর্বল। মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসার আধার। আবেগপ্রবণ, পরিবেশ ও পরিস্থিতি দ্বারা সে দ্রুত ও বড় বেশি আবেগতাড়িত হয়ে যায়। সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিকসহ যেকোন চাপের নিকট সে দ্রুত নতি স্বীকার করে সম্ভাব্য প্রতিকূল পরিবেশ দেখে সে সহজেই ভেঙে পড়ে, নিদেনপক্ষে দিশেহারা হয়ে যায়। এসব তার দোষ বা ত্রুটি নয় বরং এগুলো হলো তার প্রকৃতিগত ও জন্মগত বৈশিষ্ট্য। নারী যদি এ বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ না করত তবে এ পৃথিবীতে কোন সমাজ-ই বোধ হয় গড়ে উঠত না। নারীর এ ধরনের বিশেষ ও ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্যাবলির অনিবার্য দাবি হলো এই যে, তার কর্মক্ষেত্র ও কর্মপরিধিও হবে একই রকম ব্যতিক্রম ও তার সহজাত বৈশিষ্ট্যাবলির উপযোগী। এই অনিবার্যতাকে অস্বীকার করা মানে প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা।

নারীকে ঘরের বাইরে প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রম লব্ধ কাজ, নিয়তই দূরের পথ পাড়ি দিয়ে কষ্ট-ক্লেশ সয়ে সম্পন্ন করার মত কাজ, নানামত, নানা চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পুরুষের সাথে (যারা শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই নারীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ও কম আবেগতাড়িত) প্রতিযোগিতা করে কার্যাদি

www.pathagar.com

সম্পন্ন করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না। যদি প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই যাবতীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করে নিজের অবস্থান ও অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হয় তবে এ ক্ষেত্রে সে তার অধিকার হারাতে, বঞ্চিত হয়ে পড়তে বাধ্য। প্রথমত প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে, তার নিজস্ব সহজাত দুর্বলতার কারণে এবং দ্বিতীয়ত পুরুষের অন্যায় ও জুলুমের শিকার হয়ে। উভয় ক্ষেত্রেই নারী তার প্রাপ্য অধিকার, প্রাপ্য হক হতে বঞ্চিত হতে বাধ্য এবং তার নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হতে বাধ্য।

নারীকে যদি তার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের বিপরীত কর্মক্ষেত্র ও কর্মপরিধিতে নামিয়ে আনা হয়, যে জগতে সে টিকে থাকতে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না তা হলে সে একই সাথে দুটি অবস্থানেই বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। বাইরের কর্মক্ষেত্রে সে নিজ সহজাত প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষের জুলুম-নির্যাতন ও অসহযোগিতার কারণে পিছিয়ে পড়ছে আর অপর দিকে সে তার নিজ ঘরের শান্ত-স্নিগ্ধ ও নিরাপদ যে কোনটি ছিল যা তার নারীসুলভ প্রকৃতি ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলির জন্য অনুকূল ও উপযুক্ত সেটাও সে হারিয়ে ফেলছে। উভয় ক্ষেত্রেই তার কপালে জুটছে বঞ্চনা।

স্ত্রী-কন্যা- মা-বোন একজন নারী তার জীবনের এ সমস্ত পর্যায়ক্রমিক অবস্থানসমূহের যে অবস্থানেই থাকুক না কেন, তার অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, তার যাবতীয় মৌলিক চাহিদা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব সংসারের পুরুষ দায়িত্বশীল তথা তার পিতা, স্বামী, ভাই বা এরকম কোন অভিভাবকের হাতে ন্যস্ত থাকলে আর্থিক উপার্জন নিজের ভরণ-পোষণের চিন্তা-ক্লেশ হতে নারী মুক্তি পেতে পারে এবং এর ফলে সে তার নিজস্ব ঘর-সংসার ও পরিবারের প্রতি সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারে এবং এখানেই সূত্রপাত হয় একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের।

মানব সমাজের মৌলিক একক ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। এ রকম লক্ষ লক্ষ পরিবারকে একই আদর্শ ও লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করেই গড়ে ওঠে একটি সমাজ বা একটি রাষ্ট্র। একটি সু-সংহত ও শক্তিশালী সমাজ গঠনের অনিবার্য দাবি হলো, সেই সমাজের প্রতিটি একক, প্রতিটি পরিবার সুস্থ ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠবে। সমাজের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ প্রতিটি সদস্য-সদস্যাই কোন না কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে থাকে। তাদের চিন্তা-চেতনা, দর্শন আকিদা, আচার-আচরণ, নীতি-নৈতিকতা মৌলিক মানবীয় গুণাবলি ও মানবীয় চরিত্রের প্রাথমিক ভিত্তিটি গড়েই ওঠে একটি পরিবার হতে, পারিবারিক পরিবেশে। একজন মানুষ তার পরিণত বয়সে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও

www.pathagar.com

কর্মদক্ষতায় যতই এগিয়ে থাক না কেন, যতই পারদর্শী হয়ে ওঠুক না কেন, সে তার শৈশবে পারিবারিক পরিবেশে অর্জিত শিক্ষা-দীক্ষা, দর্শন, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, পছন্দ-অপছন্দের রেশ কাটিয়ে ওঠতে পারে না। শৈশবে অর্জিত এসব শিক্ষা-দর্শন, পছন্দ-অপছন্দ, ভালো লাগা না লাগা সারাটি জীবন ধরে তাদের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করতে থাকে। ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেগুলোতে আমরা দলিল হিসেবে উদাহরণ পেশ করতে পারি। সম্রাট আকবরের হেরেমে রাজপুত ও হিন্দু রক্ষিতা এবং স্ত্রীগণের ঔরসেই জন্ম নিয়েছিলেন জাহাঙ্গীর এর মত ভাবী সম্রাটেরা। এসব মহিলাদের দর্শন ও বিশ্বাসে শৈশব হতেই প্রশিক্ষিত ও প্রভাবিত সম্রাট জাহাঙ্গীর ইসলাম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাথে কী ন্যক্কারজনক ও জঘন্য আচরণ করেছিলেন, তা বিভিন্ন ঐতিহাসিকের ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। হযরত সেরহিন্দ (রহ.)-এর সাথে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আচরণও ইসলামী জিহাদ এর ইতিহাস ভাস্বর। শোনা যায় তুরস্কের কামাল পাশা'র মা একজন ইহুদি নারী। এই ইহুদি রমণীর ঔরসে জন্ম নেয়া তারই তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা কামাল পাশা ইসলাম ও তার শিক্ষা ঐতিহ্যের সাথে কী জঘন্য আচরণ করেছেন, তুরস্কের মাটিতে ইসলাম ও সেই সাথে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পতন ঘটাতে কী ন্যক্কারজনক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা মুসলমানদের বর্তমান জীবিত বংশধরেরা খুব ভালো করেই জানেন। এই কুলাঙ্গারই ইসলামী খিলাফেত ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক মূলোৎপাটন করেছে। যার ফলে আজ এই বিশ্বের মুসলমানগণ কোন কেন্দ্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার একটি কার্যকর প্লাটফরম খুঁজে পাচ্ছে না। বর্বর তাতার জাতি বাগদাদের বিশ্বখ্যাত আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে তছনছ করে ফেলে। লক্ষলক্ষ মুসলমানকে হত্যা করে মুসলিম নারীদের বন্দি করে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নেয়। বাগদাদের শাসন ক্ষমতাও হস্তগত করে। এসব বন্দি মুসলিম মহিলাদের ঔরসে জন্ম নেয়া শিশুরা তাদের মা এর তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠে আগ্রাসী চেঙ্গিজ খান হালাকু খানের বংশধর হিসেবে। মজার ব্যাপার হলো মুসলিম মা এর তত্ত্বধানে বেড়ে ওঠা এসব শিশুরাই মাত্র চল্লিশ বছর সময়কালের মধ্যে ইসলামের রক্ষক এ পরিণত হয়ে গেল। পরবর্তিতে এরাই আফগানিস্তান-পাকিস্তান ও ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ইসলামী দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলল অথবা তা প্রতিষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

অতএব এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য যে, পরিবার হলো একজন ব্যক্তির প্রতিটি ব্যক্তির শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের প্রাথমিক ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ পাঠশালা। আর এই গুরুত্বপূর্ণ পাঠশালাটির শিক্ষক-শিক্ষিকা উপাচার্য যাই বলুন না কেন, তা হলেন একজন মা, একজন নারী। এ বাস্তব ও নিরেট সত্যটির স্বতঃস্ফূর্ত

www.pathagar.com

স্বীকৃতি মেলে, সম্রাট নেপোলিয়ান এর কথায় তিনি বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিতা মা দাও আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দেব"।

নারী হলেন একটি উন্নত জাতি গঠনের মূল কারিগর, আর একজন কারিগরের কর্মস্থল হলো কারখানা এবং সেই কারখানাটিই হলো পরিবার। এখানেই একজন মানুষের ভালো-মন্দ চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ চলে হাতে-কলমে। নারী, যিনি একজন মানব শিশুর সবচেয়ে আপনজন, প্রিয়জন 'মা' এর ভূমিকায় অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনিই দিয়ে থাকেন এই বাস্তব প্রশিক্ষণ। এই মা যদি ঘরের শান্ত-স্নিগ্ধ কোণ ছেড়ে তার কর্মক্ষেত্র হিসেবে ঠিক করে নেন। ঘরের বাইরের কোনো জগৎ কল-কারখানায়, অফিস আদালতে, যেখানে তার অধিকার তার প্রাপ্য আদায় করতে (মাসিক বেতন এর আকারে যা পাওয়া যায়) তার সকল মেধা-শ্রম, তার সকল কর্মোদ্দীপনা, কর্মস্পৃহাকে নিঃশেষ করে দিয়ে অন্যান্য সহকর্মী নারী-পুরুষ এর সাথে প্রতিযোগিতা করে (নিজ অস্তিত্ব বা অবস্থানকে টিকিয়ে রাখতে বা সংহত করতে) যে অর্থটুকু, যে সচ্ছলতাটুকু বয়ে আনেন, সংসারে তাতে হয়ত কিছুটা বাড়তি সচ্ছলতা আসে, কিন্তু এ সচ্ছলতাটুকু সেই জিনিসটির বিকল্প হতে পারে না যা ঐ নারী, ঐ মা এর সন্তানেরা হারিয়েছে বাইরের জগতে তার কর্মক্ষেত্র স্থির করে নেবার কারণে। মা এর সাহচার্য, সংস্পর্শ, মা এর শাসন-অনুশাসন, তার শিক্ষা-দর্শন ও নির্দেশনা হারিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ জনশক্তি, ভবিষ্যৎ কর্মীবাহিনী এমনভাবে বেড়ে ওঠে যে, তাদের মধ্যে সেই মানের মানবীয় চিন্তা-চেতনা, উন্নত নীতি-নৈতিকতা থাকে না যার উপর ভিত্তি করে একটি সুষ্ঠু-সুস্থ-সুশীল ও সুন্দর সমাজ গঠন করা যায়। এ জনশক্তিটি তার জন্মলগ্ন হতেই রক্ষনার শিকার, যার অনিবার্য মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব তাদের বিশ্বাস ও চরিত্রে, চিন্তা ও চেতনায় ঠাঁই করে নেয়। এরা তাদের পুরো জীবনকালে গড়ার চেয়ে ভাঙে বেশি। এদের দ্বারা যদি কিছু গড়া নাও যায় তবে ভাঙা যায় অতি সহজে। এদের চরিত্র ও মানসিক প্রবৃত্তিটাই গড়ে ওঠে এমনভাবে যে, এরা শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলার দিকে এগুতে ভালবাসে, এরা গঠনমূলক পথে যতটুকু না এগিয়ে আসে তার চেয়ে শতগুণ দ্রুততার সাথে ধেয়ে যায় ভাঙনের পথে। এরাই হয় একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্শন-চিন্তা ও আদর্শবিরোধী গোষ্ঠীর সহজ টার্গেট, প্রাথমিক ও সহজ শিকার, এদের দ্বারাই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা আর সার্বিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার অশুভ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। কোন সমাজে বা কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত পঞ্চম বাহিনীর দিকে লক্ষ্য করে দেখুন– সেখানে দেখবেন এদেরই সহজাত ও সংখ্যাগরিষ্ঠতায় উপস্থিতি বিদ্যমান। উপরে যে কথাগুলো বললাম, এগুলো কোন আবেগতাড়িত মনের উদ্ভ্রান্ত প্রলাপ নয় বরং এটা এক

www.pathagar.com

নিরেট বাস্তবতা, আর এ রূঢ় বাস্তবতার প্রকাশ ঘটে চলেছে আজ প্রতিটি সমাজে, প্রতিটি দেশে, এরকম পরিস্থিতির সবচেয়ে করুণ শিকার হয়েছে আজকের বিশ্বে আধুনিক উন্নত ও প্রগতিশীল বলে পরিচিত তথাকথিত উন্নত বিশ্ব ইউরোপ-আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের প্রায় সবকটি দেশেই। আর ঐসব দেশের অন্ধ অনুসরণকারী মুসলিম দেশসমূহের তথাকথিত আধুনিক প্রগতিশীল ও মুক্তচিন্তার ধ্বজাধারী মুসলিম নামধারী ব্যক্তিবর্গের বা গোষ্ঠীর পরিবারসমূহ তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা। বিগত প্রায় কয়েকটি দশক ধরে চলে আসা এ প্রক্রিয়ার ফলাফল কী হয়েছে তার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। বরং মুসলিম দেশসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ যুব মানস পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে সহজেই তা বোঝা যায় যে, কী ভয়ংকর চারিত্রিক ও আদর্শিক বৈপরীত্য ও বিচ্যুতির কারণে আজ সমগ্র মুসলিম সমাজের এ নৈরাজ্যকর অবস্থা।

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন মতবাদ ও দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজ ও রাষ্ট্রের কখন, কীভাবে এবং কোন কোন পর্যায়ে নারীকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে তার প্রতি কী ধরনের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হয়েছে এবং তার পেছনে দার্শনিক-সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, তা ইতিহাস হতে তথ্য প্রমাণ ও উপাত্তসহ আলোচনা করে দেখতে গেলে এত ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত হয়ে পড়ে যে, তা একটি পৃথক গ্রন্থের কলেবর তৈরি করে দেয়। (এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও ইতিহাস সংবলিত গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছা রয়েছে আল্লাহ চায় তো তা লেখা হবে) তাই এখানে বিস্তারিত ও ব্যাপকতর আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে শুধু এ কথাটি বলে রাখি যে, অধুনা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম মতবাদ, দর্শন নারীকে অধিকার প্রদানের নামে তার কাঁধে এমন সব গুরুদায়িত্ব চাপিয়েছে যে দায়িত্বগুলো বহনের কথা ছিল নারীর, পুরুষ-অভিভাবকদের। এসব গুরুদায়িত্বগুলো নারীর প্রকৃতিগত, জন্মগত নারীসুলভ গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলির জন্য মোটেও অনুকূল নয়। সম অধিকার এর নামে নারীকে তার নিরাপদ অঙ্গন গৃহ কোণ হতে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে পুরুষের পাশে, পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অফিস-আদালতে, কল-কারখানায়, ক্ষেত-খামারে, মাটিতে-আকাশে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। অথচ এ মৌলিক এবং স্বতঃসিদ্ধ কথাটা তারা চিন্তা করেনি যে, একজন পুরুষ তার জন্মগত প্রকৃতি ও পৌরুষজনিত শক্তি আবেগ দিয়ে যতটা কষ্ট সইতে পারে, যতটা পরিশ্রম করতে পারে। একজন নারী তার জন্মগত নারীসুলভ প্রকৃতি দিয়ে না পারে ঐ মানের কষ্ট সইতে, আর না পারে ঐ মানের মনোদৈহিক পরিশ্রম করতে। আধুনিক বিশ্ব সমাজ নারীকে স্বাধীনতা ও সম অধিকার এর চটকদার বুলি শুনিয়ে তাকে স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদানের নামে গৃহস্থালি ও ঘরকন্যা, সন্তান লালন-পালন ও মায়াবী মাতৃত্ব প্রদানের

www.pathagar.com

সহজাত দায়িত্ব হতে মুক্ত করেছে (অথচ এ কাজগুলো একজন নারীর জন্য তার নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যের পক্ষে সহজসাধ্য ও অনুকূল এবং সমাজ জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে অনিবার্যও বটে) এবং দাঁড় করে দিয়েছে উন্মুক্ত বিশাল ও তার জন্য প্রতিকূল এক কর্মক্ষেত্র, বলেছে এটিই তোমার প্রকৃত ও উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র। এখানে এই যে অফিস-আদালতে, কল-কারখানায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পুরুষ স্বাধীনভাবে কাজ করছে তুমিও তাদের মত স্বাধীন ভাবে খেটে খাও। এ সকল পুরুষ মাস শেষে তাদের অধিকার পাচ্ছে মাসিক বেতনের আকারে। তুমিও এভাবে মাস শেষে তোমার অধিকার (বেতন) আদায় করে নাও। এটিই তোমার বহুল কাঙ্ক্ষিত নারী স্বাধীনতা, এটিই তোমার স্বপ্নের সেই নারী অধিকার যা তোমাকে প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়েছে। এভাবে নারীর ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার যে বিরাট দায়িত্ব তার কাঁধে ন্যস্ত ছিল, অতি কৌশলে সে দায়িত্ব নারীর ঘাড়েই চাপিয়েছে এবং নিজেকে সে দায়িত্ব হতে মুক্ত করেছে। কী অদ্ভুত প্রতারণা। কী নিদারুণ ঠকবাজি। অথচ এই নারী ঘরে ছিল সুরক্ষিত আয় রোজগারের কষ্ট-ক্লেশ হতে মুক্ত। সংসারের প্রধান দায়িত্বশীল মেনে নিয়ে পুরুষের ওপরে সে নিশ্চিন্তে ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে নির্ভর করতে পারত। আর অপরদিকে সেই পুরুষও অতি স্বাভাবিক ও সহজাত দায়িত্ববোধের এবং ভালবাসার তাড়নায় বিনা প্রশ্নে সংসারে নারীর (স্ত্রী, মা, কন্যা, বোন সকলের) ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব, কষ্ট-ক্লেশ বহন করে চলত নিজেদের কাঁধে। সমগ্র বিশ্বের আনাচে-কানাচে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রক্ষণশীল মৌলবাদী, সেকেলে, অনগ্রসর, প্রগতিবিরোধী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত, চিহ্নিত মুসলিম পরিবারগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, আজও সেসব পরিবারে এ প্রবণতা একই মাত্রায় সম্মান ও ইজ্জতের সাথে চালু আছে কিন্তু এর বিপরীতে যে সমাজে যে মুহূর্ত হতে নারী তার নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার, সম অধিকার ইত্যাদি চটকদার বিশেষণে প্রভাবিত-প্রতারিত হয়ে এ গুরুদায়িত্ব (ভরণপোষণ ও নিরাপত্তা এ সবের) নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছে সংসারের পুরুষদের দায়িত্বসীমা হতে নিজেকে মুক্ত করেছে, সেই সমাজে সেই মুহূর্ত হতেই শুধু তার নিজের জীবনই নয় বরং সংসারের সকলের জীবনই এক ধ্বংসকর অশান্তি ও নৈরাজ্যের আবর্তে নিপতিত হয়েছে।

নারীকে তার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র হতে একটি অসম অনুপযোগী ও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে এনে পুরুষ তাকে অর্থাৎ নারীকে নারীত্বকে কীভাবে অপমানিত করেছে, নির্যাতিত করেছে, বঞ্চিত করেছে এবং এ সবের অনিবার্য কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে, এমনকি পুরো মানবসভ্যতার ওপরে তা প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

দলিল, প্রমাণ, তথ্য, উপাত্ত হাতের কাছেই আছে, মানবসভ্যতার প্রতিটি চিন্তাশীল ও শানিত বিবেকবান ব্যক্তির। তারা যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সমাজ জীবনের গভীরে চোখ বুলিয়ে নেন তখন অতি সহজেই তাদের কাছে এটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যায়। এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে স্বাধীনতা, সম অধিকার, নারী অধিকার ইত্যাদি প্রাপ্তির কথা বলে তাকে ঘরের বাইরে টেনে নামানো হয়েছে সেসব তো তার কপালে জোটেই নি বরং এর বিপরীতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রতিটি নারীর ললাটে জুটেছে জিল্লতি, অপমান, সীমাহীন বঞ্চনা-দুর্গতি আর অবজ্ঞা।

বর্তমান বিশ্বে উন্নত-অনুন্নত পূর্বে কী পশ্চিমে নির্বিশেষে সকল দেশে সকল সমাজেই নারীর অবস্থা সামাজিক চিত্র কম-বেশি এরকম। যদিও মুসলিম দেশসমূহে নারীদের অবস্থা-অবস্থান (মুসলিম আদর্শের নিষ্ঠাবান ধারক মুসলিম পরিবারসমূহে) কিছুটা হলেও ইউরোপীয় সমাজে নারীদের অবস্থা-অবস্থান হতে উন্নত কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যন্ত দুঃখের সাথে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে মুসলিম দেশসমূহে নারীদের পশ্চিমা বিশ্বের নারীদের মত অবজ্ঞা-অপমান আর জিল্লতির গহ্বরে পড়তে হয়নি বটে, কিন্তু মুসলিম নারীরা ইসলামী দর্শন ও শিক্ষায় যে অধিকার ও সুযোগ যে সম্মান এবং ইজ্জত তাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছে তা তারা পায়নি। অথবা তাদেরকে তা দেয়া হয়নি, এর যথাযথ কারণ কী তা আমরা এই স্বল্প পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যায় যাব না, আমরা শুধু এ কথাটিই জোর দিয়ে বলতে চাই যে, মুসলিম দেশসমূহে নারীদের বর্তমান বঞ্চনাপূর্ণ অবস্থা সম্বন্ধে যে মন্তব্য আমরা করেছি, তা কম-বেশি সামান্য ব্যতিক্রম বাদে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহে নারী সমাজের বেলায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

উপরে এতক্ষণ যেসব অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় সেরকম অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটার কোন সুযোগ নেই। বরং ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এখানে অর্থাৎ, ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র বা সমাজে ইসলামী দর্শন ও শিক্ষার সাথে পরিপূর্ণ সঙ্গতি রেখে শাসক কর্তৃপক্ষ তথা পুরো সমাজ নারীকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সামষ্টিকভাবে তাদের নিজ নিজ যথাযথ অবস্থান ও মর্যাদায় সমাসীন করবে। নারীকে নিয়ে অন্যান্য মতবাদ, দর্শন ও বিশ্বাসভিত্তিক সমাজ বা রাষ্ট্রে যে ধরনের ন্যক্কারজনক চালবাজি, ধাপ্পাবাজি, যে ধরনের প্রতারণাসহ অনৈতিক, অমানবিক ও অমর্যাদাকর, কাজকর্ম, জুলুম ও নির্যাতন হয়েছে যুগ যুগ ধরে সে ধরনের যে কোন পরিস্থিতির উদ্ভাবনা বা সৃষ্টির দূরতম সম্ভাবনাকেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বলে প্রতিহত করবে এবং নারীকে তার যথাযোগ্য ইজ্জত ও

www.pathagar.com

সম্মানে মূল্যায়ন করবে। এর পাশাপাশি সমাজের যেকোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী একক বা সমগ্রভাবে নারীদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র অনীহা প্রকাশ করলে রাষ্ট্র তার আইনগত কর্তৃত্ব বলে তাকে তার দায়িত্ব পালনে বাধ্য করবে। অনৈসলামিক সমাজে পুরুষ যেমন প্রতারণার মাধ্যমে নারীর প্রতি তার দায়িত্বকে কৌশলে পাশ কাটিয়ে গেছে ইসলামী শাসন ব্যবস্থাভিত্তিক সমাজে তার কোন রকম সুযোগ নেই।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا * (سُوْرَةُ النِّسَآءِ - ١)

অর্থাৎ, হে মানুষ, তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদের একটি মাত্র ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতেই তার জোড়া তৈরি করেছেন, উভয় হতে বহুসংখ্যক নারী-পুরুষকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের নিকট হতে নিজের অধিকার দাবি কর এবং আত্মীয়তা ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা হতে বিরত থাক, নিশ্চয় আল্লাহ তোমার (কাজকর্মের) ওপরে কড়া দৃষ্টি রাখেন। (সূরা নিসা-১)

উপরে বাংলা অর্থসহ কুরআনুল কারীম হতে যে আয়াতে কারীমার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, তা হলো সেই দর্শন এর (ইসলাম) শিক্ষা যে দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ইসলামী রাষ্ট্র। তাই এ রাষ্ট্রটি তার সকল প্রশাসন যন্ত্র সকল প্রতিষ্ঠান তথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই উক্ত আয়াতে বিধৃত শিক্ষাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করবে।

একটি সমাজে জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধাংশই হলো নারী। এ নারীরাও ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক, ঐ সমাজের সদস্যা। কাজেই অতি সহজেই এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর জীবনে বা তাদের প্রতি আদর্শের বাস্তবায়ন না ঘটিয়ে আদর্শে বর্ণিত তাদের প্রাপ্য অধিকার হক, সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করে কীভাবে একটি রাষ্ট্র আদর্শবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার অনুসারী জনগণ ও নাগরিকদের জীবনে ইসলামের বাস্তবায়ন না করে তাদেরকে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও সুযোগ প্রদান না করে প্রাপ্য ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকসহ সার্বিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করে কিসের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচয়ে চিহ্নিত হতে পারে বা স্বীকৃতি পেতে পারে?

www.pathagar.com

ইসলাম নারীকে কী কী অধিকার দিয়েছে তা আলোচনা করার ক্ষেত্র এটি নয়, এটি একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। ইসলাম নারীকে কী দেয় নি? কোন সুযোগ হতে, কোন কোন অধিকার হতে বঞ্চিত করেছে? সে প্রশ্নটিই বরং উঠতে পারে। আমরা সেদিকেও যাব না, বরং ইসলামী শাসন এর কথা শুনলে আধুনিক বিশ্বের কিছু আধুনিক ও প্রগতিমনা নারী এবং অতিরিক্ত নারী দরদি কিছু মতলববাজ পুরুষের মনে যেসব প্রশ্ন উদিত হয় অথবা তারা যেসব প্রশ্ন তোলেন, যেসব বিষয়ে অপপ্রচার চালিয়ে সরলমনা মুসলিম নারীদের ইসলামী রাষ্ট্র তথা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলেন, তাদেরকে নিরুৎসাহিত করে তোলেন, তাদের জ্ঞাতার্থে অতি সংক্ষেপে এবং অতি সহজ ভাষায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত মৌলিক কথা তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ। নচেৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর সম্মানিত রাসূল (সা.)-এর ওপরে পূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক মনোনীত দীন ইসলামকে নিজেদের জন্য একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে মানেন ও নিষ্ঠার সাথে তা স্বীকারও করেন। তারা তো এটাও খুব ভালো করেই জানেন যে, ইসলাম নারীকে যে সম্মান-ইজ্জত ও অধিকার দিয়েছে এ বিশ্বে আজ পর্যন্ত কোন দর্শন অথবা ইসলাম ছাড়া বিশ্বের অন্য সকল দর্শন সম্মিলিতভাবেও তাকে সে অধিকার, সম্মান ও সুযোগ দেয়নি বা দিতে পারেনি। এ শেষোক্ত গোষ্ঠীর জন্য এ আলোচনাটি নিরর্থক হলেও প্রথমোক্ত গোষ্ঠীটির মধ্যে যারা প্রকৃতই অনুসন্ধিৎসু ও বিবেকবান, তাদের হয়ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হলেও হতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর শিক্ষার অধিকার থাকবে কেননা শিক্ষা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য বাধ্যতামূলক। সে ক্ষেত্রে নারীর মেধা-যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী নারী যদি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চায় (তার বৈধ অভিভাবক, যেমন কুমারী হলে পিতা, মাতা, ভাই অথবা সংসারের প্রধান এবং বিবাহিতা হলে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে) এবং যদি উক্ত শিক্ষার বিষয়টি ইসলামী দর্শনবিরোধী অথবা ইসলামে নিষিদ্ধ না হয়ে থাকে (যেমন জাদুবিদ্যা) তবে উচ্চশিক্ষার দ্বারও তার জন্য অবারিত থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রের আওতায় যোগ্যতাসম্পন্ন একজন নারী তার নিজ যোগ্যতা বলে অবশ্যই একজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনিয়ার বা একজন বিজ্ঞানী বা একজন শিক্ষাবিদ অথবা পেশাজীবী হতে পারবেন এবং স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পেশা ও ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতায় একজন নারীকে তার অভিভাবক কেউই তার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে পারবে না। আজকাল আমাদের দেশসহ অধিকাংশ মুসলিম দেশেই ইসলামী শিক্ষার অভাব অথবা ইসলাম সম্বন্ধে

www.pathagar.com

অজ্ঞতার কারণে নারী বাস্তবে এ অধিকারটি যথাযথভাবে ভোগ করতে পারছে না। একজন নারীকে তার মতের বিরুদ্ধে বিবাহ দেয়া বা শৈশবে বিয়ে দেয়া (বাল্য বিবাহ নারী বালেগ হবার পূর্বে) নিষিদ্ধ এ রকম যেকোন প্রচেষ্টা রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় আইন ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করে রদ করবে এবং নারীর সব রকম প্রাপ্য অধিকার রক্ষা করবে, এ ব্যাপারে নারীর অভিভাবকের মতামত বড় কথা নয়, তবে তার নিকট কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি ও তার (অভিভাবকের) কর্মকাণ্ডের সপক্ষে কোন ব্যাখ্যা থাকলে রাষ্ট্রের নিকট তা পেশ করার অধিকার সে রাখে। কিন্তু এখানে এ বিষয়টি চূড়ান্ত যে, একজন নারীর মতের বিরুদ্ধে তার বিবাহ সংঘটিত হতে পারে না। স্বামী বাছাই করে নেবার একমাত্র অধিকার নারীর নিজের। তবে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, একজন নারী তার বিবাহের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পাত্র নির্বাচনের বেলায় সে তার বাবা-মা, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, ফুফু-দাদা-দাদি অর্থাৎ নিকটাত্মীয় অভিভাবকদের মতামত ও পছন্দ-অপছন্দের প্রতি গুরুত্ব দেবে কারণ, সংসার জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতাহীন অনভিজ্ঞ একজন নারী প্রায়শই জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবেগতাড়িত হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলে, যার পরিণতিতে প্রতারিত হয়ে সারা জীবনই তাকে কাঁদতে হয়। একজন নারী তার অধিকার ও স্বাধীনতার জোরে যেকোন পুরুষের হাত ধরে কোর্টের এজলাসে বা কাজীর অফিসে যেয়ে হাজির হবে বিয়ে রেজিস্ট্রির জন্য। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার মত পরিবেশ ও সুযোগ ইসলামী শাসন ব্যবস্থাধীন সমাজে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। তাই এখানে সে বিষয়টি আলোচনা অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয়।

বিবাহ সম্পাদন বা তাতে সম্মতি প্রদানের ক্ষেত্রে নারী তার নিজ ইচ্ছামত শর্তারোপ করতে পারে (অবশ্যই বৈধ শর্ত এবং সেসব শর্তাবলি এমন হতে হবে যে, এসব শর্ত বিয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত করে না এবং শরীয়তের কোন বিধি-বিধান এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়)। স্বামী এসব শর্তাদি মেনে নিয়ে বিয়ে সম্পাদন করলে পরবর্তীতে সে এসব শর্ত মেনে চলতে বাধ্য এবং শর্ত ভঙ্গ করলে স্ত্রী সে ক্ষেত্রে বিয়ে বাতিলও করতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাক সংঘটিত হয়ে গেলে তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ দিতে স্বামী বাধ্য থাকবে। যদি তাদের সন্তান থাকে তবে সে সন্তানের লালন-পালনের অধিকার নারীর অর্থাৎ সন্তানের মার। স্বামী তার নিকট হতে সন্তানকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না যতক্ষণ না উক্ত নারী অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করে স্বামী হিসেবে গ্রহণ না করে। আর এই সন্তানের লালন-পালনের ব্যয়ভার সর্বাবস্থায়ই সন্তানের পিতার ওপরে ন্যস্ত থাকবে।

www.pathagar.com

বিয়ের ক্ষেত্রে ধার্যকৃত দেনমোহর পরিপূর্ণভাবেই নারীর অধিকার। এ অধিকার স্বামী প্রদান করতে বাধ্য। স্বামী এ অর্থ প্রদান না করলে বা প্রদানে গড়িমসি করলে স্ত্রী তা আদায়ের জন্য সরকারি বা রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে অর্থাৎ সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে সে অর্থ আদায় করে নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র স্বামীকে বাধ্য করবে স্ত্রীর এ অধিকার প্রদান করতে। দেনমোহরের এ অর্থ বা সম্পত্তি একান্তভাবেই স্ত্রীর, তা ক্ষমা করা বা সংরক্ষণ করা বা তা খরচ করার সার্বিক ক্ষমতাও স্ত্রীর নিজের।

একজন নারী, মুসলিম নারী কুরআনে বর্ণিত বিধানানুযায়ী তার পিতা-মাতা, স্বামী-সন্তান অর্থাৎ তার উত্তরাধিকারের সূত্রে সম্পত্তি পাবেন। ইসলামী পরিভাষায় বলতে গেলে এভাবে বলতে হয় যে, একজন নারী মিরাস এর হকদার হবেন। দুঃখের বিষয় হলো আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ হক নারীকে দেয়া হয় না বা দিলেও আংশিক প্রদান করা হয় এবং বিভিন্ন ছলে-কৌশলে তাকে তার এ বৈধ প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করে রাখা হয়। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতায় একজন নারী আল-কুরআনে বর্ণিত তার এই মিরাসি হক পরিপূর্ণভাবেই পাবেন। ইসলামী রাষ্ট্র তার আইন ও রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব বলে এ ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের ব্যতিক্রম ঘটানোর প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করবে। যেকোন মুসলিম নারী তার মিরাস আদায়ে প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় সহায়তা চাইতে পারবেন এবং রাষ্ট্র বিনা ব্যয়ে এ ধরনের প্রয়োজনীয় যেকোন সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকবে এটি রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর স্বাধীন আয়-রোজগারের এবং তার সম্পদ এর অধিকারিণী হবার অধিকার থাকবে। একজন নারী যদি বৈধ কোন ব্যবসা পরিচালনা বা যথাযথ পর্দা ও নীতি-নৈতিকতার মধ্যে অবস্থান করে কোন উপার্জনক্ষম পেশা অবলম্বন করতে চান, তবে তা তিনি করতে পারবেন। একজন নারী যতই সম্পদ ও অর্থের অধিকারিণী হোক না কেন তিনি তার এ অর্থ-সম্পদ স্বামী সন্তানের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য নন। বরং সর্বাবস্থায় উক্ত নারীর ভরণপোষণের দায়-দায়িত্ব স্বামীর ওপরে ন্যস্ত।

নারী যদি স্বামী পরিত্যক্তা হয় বা অভিভাবকহীনা হয়ে পড়ে এবং নিজের সহায়-সম্পদ ও অর্থ হতে তার নিজের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়, অপারগ হয়, তবে তার সকল মৌলিক চাহিদা যেমন আহার-বাসস্থান, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি সকল কিছুর দায়-দায়িত্ব সরকারের। এটি সরকারের ঐচ্ছিক কোন ব্যাপার নয় বরং এটি হলো ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের ওপর বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কোনক্রমেই তার এ দায়িত্বকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। যেকোন ধরনের ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে একজন নারী সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এ অধিকার আদায় করে নিতে পারে।

www.pathagar.com

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের মধ্যে সকল বৈধ সীমারেখা বজায় রাখা সাপেক্ষে নারীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার থাকবে।

একজন নারী শরীয়তের দাবি পূরণ করে (পর্দা করে) চাকরি করতে পারবেন, ঘরের বাইরে তার কর্মক্ষেত্রে যেতে পারবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রে নারীগণ প্রয়োজন ও তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারি পদে নিয়োগ লাভ করতে পারবেন। নারীরা দেশের সংসদ বা পার্লামেন্ট এর সদস্যও হতে পারবেন। সংসদে নারী জাতির মতামত এর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। তারা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারও হতে পারবেন।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে প্রতিটি পুরুষের মত প্রতিটি নারীরও। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক যেকোন বিষয়ে যেমন মতামত প্রকাশ করতে পারবেন তেমনি রাষ্ট্রীয় ও শাসক কর্তৃপক্ষের যেকোন কর্মকাণ্ড, যেকোন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করার অথবা তাদের প্রতি পরামর্শ প্রদানের পূর্ণ ইখতিয়ার থাকবে।

বর্তমান যুগে প্রচলিত আকারের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ নেই, কারণ এতে না নারীর পর্দা রক্ষা করা সম্ভব আর না তার পক্ষে সংসারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব।

যৌক্তিক ও বোধগম্য কারণে একজন নারী, তা যিনি যতই যোগ্যতাসম্পন্না হোন না কেন, কোন অবস্থাতেই একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ, রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী যাই বলুন না কেন, সে পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না। নারীর শারীরিক (Biological ও Phisiological) এবং মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) গঠন ঐ পদের দাবি পূরণে সহায়ক নয়, এটি আজকে আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞান গবেষণালব্ধ ফলাফল দ্বারা সন্দেহাতীত প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত একটি সত্যতে পরিণত হয়েছে। অথচ ইসলাম এ সত্যের ঘোষণা ও বাস্তব স্বীকৃতি আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই তার শিক্ষা ও দর্শন দ্বারা মানব সমাজে বিশেষ করে ইসলামী সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ঐ একই বোধগম্য কারণে একজন নারী ইসলামী রাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনীর প্রধান পদটি অর্থাৎ সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না। তবে নারীকে মৌলিক আত্মরক্ষা, প্রতিরক্ষা, যুদ্ধকালীন বিশেষ বিশেষ কার্যাদির প্রশিক্ষণ ও দায়িত্বভার অর্পণ করা যাবে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতায় একটি সমাজে বা একটি দেশে তথাকথিত ও বহুল আলোচিত নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার ইত্যাদির নামে ফ্যাশন শো, উন্মুক্ত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, প্রচলিত আকারে নাটক, যাত্রা, থিয়েটার বা সিনেমা এ জাতীয় অশ্লীল কর্মকাণ্ড চলতে দেয়া হবে না।

www.pathagar.com

একজন পুরুষের মত একজন নারীও স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম ইবাদত-বন্দেগী ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করতে পারবেন। যেকোন পরিস্থিতিতে একজন নারীর জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে ইসলামী রাষ্ট্র বাধ্য থাকবে। রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ কোন ওজর বা কোন ছল-ছুতায় পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে না।

বস্তুত সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি মৌলিক দিকের প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। কুরআন, হাদীস, ফিকাহ শাস্ত্র ও ইসলামী ইতিহাস হতে প্রয়োজনীয় দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে গেলে শুধু এ অধ্যায়টিই একটি বিশাল গ্রন্থের আকার পেয়ে যাবে। তাই আমরা সে বিষয়টিকে দৃষ্টিতে রেখেই নিচে সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে এতক্ষণ ধরে আলোচিত বিষয়ের সারাংশ তুলে ধরছি–

এক. একজন নারীর জন্য ইসলাম তথা আল-কুরআন, রাসূল (সা.)-এর কর্মনীতি, হাদীস ও খোলাফায়ে রাশেদার চার খলীফাকর্তৃক যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নির্ধারিত হয়েছে ব্যতিক্রমহীনভাবে ইসলামী রাষ্ট্র এ যুগেও তা নারীকে প্রদান করতে বাধ্য।

দুই. একজন নারীকে এমনভাবে গড়ে তোলা হবে যে চিন্তা-চেতনা এবং শিক্ষা ও মননে একজন নারী যেন পরিবার গঠন, সন্তান লালন-পালন ও নারীর সামাজিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে।

তিন. পর্দা ও নৈতিকতার সীমারেখা লঙ্ঘন না করে একজন নারী ঘরের বাইরে নিজের ও সংসারের প্রয়োজনে যেতে পারবেন। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে নারীকে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি জীবনযাপন করতে হবে বলে যে কথা প্রচার করা হয় তা নিতান্তই মিথ্যা ও একটি মতলবি চক্রের অপপ্রচার।

চার. নারীর শিক্ষার অধিকার পুরোমাত্রায় সংরক্ষিত থাকবে। তার জন্য সিলেবাস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে ভিন্ন। নারীর দৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল। উচ্চশিক্ষার দ্বারও তার জন্য অবারিত থাকবে।

পাঁচ. সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে তাদের কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্ব এমনভাবে বিন্যাস করা হবে যে, নারী যেন তার জন্য উপযোগী ও মানানসই পেশায় পূর্ণ মর্যাদার সাথে নিয়োগ পায় এবং বর্তমানকালে প্রায় সমগ্র বিশ্বজুড়ে বেতন ও সুবিধাদির যেসব বৈষম্য রয়েছে একজন নারী শ্রমিক ও একজন পুরুষ শ্রমিক এর মধ্যে সে ধরনের কোন বৈষম্য ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতায় থাকবে না।

ছয়. একজন নারী দেশ রক্ষা আত্মরক্ষামূলক প্রতিরক্ষা বিষয়ক মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ নেবেন, রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও নারীর জন্য মানানসই এ ধরনের কর্মসূচি রাষ্ট্র তার নিজ দায়িত্বে প্রণয়ন ও সম্পাদন এবং পরিচালনা করবে।

www.pathagar.com

সাত. নারীর আহার, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের মত বৈধ আইনগত অভিভাবক যেমন পিতা-স্বামী, সন্তান ইত্যাদি না থাকলে এ ধরনের অসহায় নারীদের যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব সার্বিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের, এটি পালন করতে ইসলামী রাষ্ট্র নৈতিকভাবে বাধ্য। সে এ দায়িত্বকে এড়িয়ে যেতে পারে না কোন মতেই।

আট. নারীর জন্য পর্দা বাধ্যতামূলক এটি তার ইচ্ছাধীন একটি ঐচ্ছিক বিষয় নয়। এ বিধান ভঙ্গকারিণীকে রাষ্ট্র অপরাধের গুরুত্বানুযায়ী শাস্তি প্রদান করবে।

নয়. নারী সৌন্দর্যের প্রকাশ্যচর্চা, ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, অশ্লীল সাহিত্য-সংস্কৃতির নামে অশ্লীল কর্মকাণ্ড ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিহত করবে যেকোন মূল্যে। এখানে নারী অধিকার বা নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি কোন চটকদার বুলিই ইসলামী রাষ্ট্র সহ্য করবে না।

দশ. সক্রিয় রাজনীতি স্পষ্টই নারীকে ঘরের বাইরে কর্মক্ষেত্রে তার সময় ও মনোযোগ এর অধিকাংশ নিয়োজিত করবে ফলে পরিবার ব্যবস্থাই হুমকির সম্মুখীন হবে। তাই নারীকে সক্রিয় রাজনীতি হতে দূরে রাখা হবে।

এগার. ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত যেকোন বিষয়ে একজন নারীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান থাকবে। এখানে নারী বা পুরুষ, লিঙ্গের ওপরে ভিত্তি করে কোন পার্থক্য করা হবে না।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

আদর্শই প্রধান রক্ষাকবচ

এ রাষ্ট্রটি একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র। একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শকে ধারণ করেই রাষ্ট্রটি গড়ে ওঠে, প্রতিষ্ঠা পায় ও পরিচালিত হয়। এ রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব শুধুমাত্র বর্হিশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে হুমকির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনাই থাকে না বরং এর অভ্যন্তরীণ আরও একটি শত্রু আছে যার দ্বারা আক্রান্ত হলে এবং সেই আক্রমণ যথাসময়ে রোধ করা না গেলে রাষ্ট্রটি অচিরেই তার আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে ধ্বসে পড়বে। এটি আর তখন ইসলামী রাষ্ট্র বলে বিবেচিত বা স্বীকৃত হবার যোগ্যতা রাখবে না। অভ্যন্তরীণ এই শত্রুটি হলো রাষ্ট্র ও প্রশাসনের কর্ণধারগণের বা আরও বৃহৎ অর্থে রাষ্ট্রের নাগরিকগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের তাদের জীবনাদর্শ হতে বিচ্যুত হওয়া। মূলত এটিই হলো ইসলামী রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ও ভয়ঙ্কর দুশমন। এই কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই এই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়টিতে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করে নিতে চাই।

যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ও কর্ণধারগণসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকগণ তথা মুসলমানগণ তাদের শিক্ষা ও আদর্শকে নিজেদের চিন্তা-চেতনায়, কর্মে-বিশ্বাসে যথাযথভাবে ধারণ করে রাখে, নিষ্ঠার সাথে বাস্তবে অনুশীলন করে চলে তাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থেই তারা দুর্জেয় ও পরাক্রমশালী বলে বিবেচিত হয়। পৃথিবীর কোনো শক্তি তা সামরিক আর্থিক বা সংখ্যাগত দিক হতে যত বড়ই শক্তিশালী হোক না কেন এই জনগোষ্ঠীর সম্মুখে মুখোমুখি দাঁড়াবার কথা বা তাদের মোকাবিলা করার কথা কল্পনাও করতে সাহস পাবে না। একটি প্রশিক্ষিত উন্নত টেকনোলজি ও আধুনিক অস্ত্রপাতিসমৃদ্ধ সেনাবাহিনী কখনোই অজেয় বলে প্রমাণিত হবে না যদি সেসব সৈন্যবাহিনীর সদস্যদের ব্যক্তি চরিত্রে উন্নত নৈতিকতা ও আদর্শের নির্দিষ্ট একটি মান উপস্থিত না থাকে। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে যেসব যুদ্ধ এ রাষ্ট্রটিকে মোকাবিলা করতে হয়েছে সেসব যুদ্ধের দিকে নজর দিন, দেখবেন সেসব যুদ্ধে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর সদস্যসংখ্যা তাদের যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক উপকরণ প্রতিপক্ষ কাফিরদের সৈন্যসংখ্যা যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ এর তুলনায় উল্লেখ করার মত কিছু ছিল না। সেখানে তলোয়ারের মোকাবিলায় কোনো কোনো মুসলিম যোদ্ধা শুকনো খেজুর ডাল নিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেক যোদ্ধার হাতে উন্নত তলোয়ারের বিপরীতে ছিল পুরনো মরচে পড়া ভাঙা তলোয়ার, ঘোড় সওয়ারের

www.pathagar.com

বিপরীতে যুদ্ধ করেছে পায়দল শীরস্ত্রাণহীন যোদ্ধা, ঢাল-বর্মহীন এক যোদ্ধা যিনি এক অতি উন্নত আদর্শ ও শিক্ষা দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। এ ছাড়া প্রতিপক্ষ বাহিনীর সৈন্যদের তুলনায় তাদের সৈন্যসংখ্যার দিকটিও ছিল নিতান্তই অনুল্লেখ্য। বদরের যুদ্ধে কাফিরদের একহাজার সৈন্যসংখ্যার বিপরীতে মুসলমানদের মাত্র ৩১৩জন এক তৃতীয়াংশ। তাবুকের মাঠে লক্ষাধিক সৈন্য সংবলিত বিশাল কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ত্রিশ হাজার মুসলিম মুজাহিদ। মুতার যুদ্ধে সর্বাধুনিক যুদ্ধ সাজে-সজ্জিত তৎকালীন বিশ্বের এক নম্বর শক্তিধর রোমান বাহিনীর একলক্ষ সৈন্যের বিপরীতে দাঁড়িয়েছিল মাত্র তিনহাজার জানবাজ মুসলিম মুজাহিদ। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনলক্ষ রোমান সৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল ভাঙা-পুরানো অস্ত্র নিয়ে মাত্র চল্লিশ হাজার দুঃসাহসী মুজাহিদ মুসলমান। এসব যুদ্ধসমূহের কোনটিতেই মুসলিম সৈন্যসংখ্যা প্রতিপক্ষ কাফির সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ও শক্তির তুলনায় উল্লেখ করার মত কোন পর্যায়ে ছিল না আর এর পাশাপাশি যুদ্ধ উপকরণ ও যানবাহনের অপ্রতুলতা তো ছিল সবার জানা কথা। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও মুসলিম সৈন্যবাহিনী সেসব যুদ্ধে কাফিরদের বিশাল বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে জয় ছিনিয়ে আনল। মাত্র অল্প কয়টি বছরের মধ্যে তৎকালীন বিশ্বের প্রধান দুই পরাশক্তি, পারস্য এবং রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস ও পরাজয় চূড়ান্ত করে তাদের অধিকাংশ রাজ্য দখলে এনে সে স্থলে নিজেদের আদর্শ ও শিক্ষাভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন, এটা কীভাবে সম্ভবপর হল? কী ছিল এ বিস্ময়কর সফলতার পেছনে মূল কার্যকরণ শক্তিটি? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের খুব বেশি দূর যেতে হবে না। নিচে উল্লিখিত দুটি ঘটনার প্রতি যদি আমরা গভীর দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী মনোভাব নিবদ্ধ করি, পর্যবেক্ষণ করি, তাহলেই সে উত্তর আমরা পেয়ে যাব।

দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর আমলে তিনি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে এক মুসলিম সেনাবাহিনীকে জেরুজালিম উদ্ধারে প্রেরণ করেন। উক্ত সৈন্যবাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়ে জেরুজালিম নগর অবরোধ করল। জেরুজালিম এর খ্রিস্টান সৈন্যবাহিনী দীর্ঘদিন তাদের প্রতিরোধ চালিয়ে গেল কিন্তু তাতে ফল হলো না তারা মুসলিম সৈন্যদের অবরোধ ভাঙতে পারল না। মুসলিম সৈন্যবাহিনী তাদের অবরোধ চালিয়ে যেতে থাকল। খ্রিস্টান সেনাপতি অন্য পথ ধরল, ঘৃণ্য এক পথ। তারা তাদের বাছাই করা সুন্দরী ষোড়শী যুবতী নারীদের সাজিয়ে মনোহর বেশে ছড়িয়ে দিতে থাকল রাতের আঁধারে মুসলিম সৈন্যদের তাঁবুর আশপাশে। তারা অর্থাৎ সেসব সুন্দরী নারীরা রাতভর ঘুর ঘুর করতে থাকল মুসলিম সৈন্যবাহিনীর তাঁবুসমূহের আশপাশ ঘিরে। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা চোখ তুলেও তাকালো না এসব সুন্দরী নারীদের প্রতি। তাদের সময়

www.pathagar.com

কাটতে লাগল রাতের বেলা পালা অনুযায়ী সেনা ছাউনি পাহারা দিয়ে নতুবা তাহাজ্জুদের নামাযে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে অথবা বিশ্রামের মাধ্যমে। নিশাচর এসব সুন্দরী প্রশিক্ষিত রমণী শত চেষ্টা করেও একজন মুসলিম সৈন্যকেও তাদের রূপ যৌবনের ফাঁদে ফেলতে পারল না। দিনের পর দিন রাতের পর রাত শত রকমের প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও পারল না এই আদর্শবাদী দলের একজন সৈন্যকেও পথচ্যুত বা আদর্শচ্যুত করতে। এ ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে খৃষ্টান সেনাপতিগণ আরও সৈন্য আরও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে মুসলিম সৈন্যদের মোকাবিলা করতে মনস্থ করল। আরও সৈন্য আরও যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তারা সাহায্য চেয়ে জরুরি পয়গামসহ দূত প্রেরণ করল চীন সম্রাটের কাছে। চীনা সম্রাট দূতের নিকট জেরুজালিম নগরী অবরোধকারী সৈন্যদের পরিচয় ও তাদের গতি প্রকৃতি জানতে চাইলেন, জবাবে খ্রিস্টান দূত জেরুজালিম নগরী অবরোধকারী মুসলিম সৈন্যদের পরিচয় তুলে ধরলেন এভাবে। মুসলিম সৈন্যবাহিনী রাতের বেলায় থাকে জায়নামাযে, প্রার্থনায়, আর দিনের বেলায় থাকে ঘোড়ার পিঠে। তারা যুদ্ধবন্দিদের সাথে উত্তম আচরণ করে থাকে এবং তাদের নিজেদের চেয়ে উত্তম খাবার ও পরিধেয় সরবরাহ করে, কোনো অবস্থাতেই শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের গায়ে অস্ত্র উত্তোলন করে না, পলায়নপর শত্রুকে আঘাত করে না, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে না-প্রতিশোধমূলক কোনো কাজই করে না। তারা মনেপ্রাণে এটা বিশ্বাস করে যে যুদ্ধ করতে যেয়ে শহীদ হলে তারা বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে। মুসলিম সৈন্যবাহিনীর এসব গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলির কথা একজন খ্রিস্টান দূতের মুখে শুনে অভিভূত চীনা সম্রাট তাকে জবাব দিলেন মান্যবর দূত, ঐ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে আপনাদের কোনই লাভ হবে না। আপনারা কোনমতেই এরকম একটি সৈন্যবাহিনীর সাথে লড়াই করে জিততে পারবেন না। কারণ তারা যা করে একমাত্র আল্লাহর জন্যই করে। আমার হাতে এত সৈন্য রয়েছে যে, আমি আপনার দেশ ও তার মাটিকে আমার সৈন্যবাহিনী দিয়ে ভরে দিতে পারি কিন্তু হায়! মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সাথে যা আছে তা আমার সৈন্যবাহিনীর সাথে নেই। ঐ সৈন্যবাহিনী যাদের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা আপনি বললেন, তাদের সাথে রয়েছে আল্লাহর সাহায্য ও রহমত, যা আমার সৈন্যবাহিনীর সাথে নেই। সুতরাং আমার সবরকম সাহায্য নিয়েও আপনার কোনই লাভ হবে না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে দূত ফিরে এলেন জেরুজালিমে। এবং জেরুজালিম এর খ্রিস্টান শাসককে তা জানালেন। কোনো উপায়ন্তর না দেখে দীর্ঘশলাপরামর্শ শেষে খ্রিস্টান শাসকগণ মুসলমানদের হাতে নগর হস্তান্তর করতে চাইলেন বিনা যুদ্ধে। তবে তারা এ শর্ত জুড়ে দিলেন যে, নগরের চাবি তারা বিনা যুদ্ধে হস্তান্তর করতে প্রস্তুত তবে তা মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) বা অন্য কারো নিকট নয় বরং স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক -এর নিকট। তারা শহরের চাবি হস্তান্তর

www.pathagar.com

করতে প্রস্তুত। খ্রিস্টানদের এ শর্তের কথা হযরত ওমরকে যথাশীঘ্র জানানো হল।

যুদ্ধের মাধ্যমে সম্পদ ও প্রাণের ক্ষতি এড়িয়ে শহর হস্তগত করা যাবে এ সম্ভাবনা দেখে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.) কাল বিলম্ব না করে সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে রওনা হলেন একটি মাত্র উট ও একজন খাদেম সাথে করে। বিশাল মুসলিম বাহিনীর প্রবল ক্ষমতাধর আমীরুল মুমিনীন কোনো রকম দেহরক্ষী বাহিনী ছাড়া, কোনো রকম অগ্রবাহিনী, পশ্চাৎবাহিনী ব্যতিরেকে চললেন জেরুজালিম এর দিকে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছেন কখনও উটের পিঠে চড়ে কখনও পায়ে হেঁটে খাদেমকে উটের পিঠে চড়িয়ে নিজে রাখাল এর মত উটের রশি টেনে ধরে। এভাবে পালা করে চলতে থাকলেন। ক্রমশ তারা জেরুজালিম এর দোরগোড়ায় উপস্থিত। উটের পিঠে চড়ার পালা খাদেমের আর উটের রশি ধরে টানার পালা হল বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের ইসলামী শাসক আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর যাঁর বীরত্বের কথা শুনলেই যাঁর কঠোরতা ও ক্ষমতার কথা শুনলেই কাফির বাহিনীর গলা শুকিয়ে যায় তেষ্টায়। দীর্ঘ সফরজনিত কারণে মলিন বেশ-ভূষা, ছিন্নতালি জীর্ণবসন, উটের রাখাল বেশে রশি ধরে খাদেমকে উটের পিঠে চড়িয়ে আমীরুল মুমিনীন এর নগরে উপস্থিতিতে বিব্রত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ ভয়ে ভয়ে খলীফার দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট করলেন কুণ্ঠিত কণ্ঠে। জবাবে হযরত ওমর (রা.) মুসলিম সেনাপতি হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)কে মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন, হে আবু উবাইদাহ! তুমি কী মনে করো যে মুসলমানেরা তাদের পোশাক- আশাক, বেশ-ভূষা আর শান-শওকত ও চাক-চিক্যের জোরে সম্মান পাবে? আমরা কী শান-শওকত এর জোরে টিকে থাকতে পারব? রোমান সম্রাজ্যের অধীনে জেরুজালিম এর খ্রিস্টান সেনাপতি ও সৈন্যবাহিনীসহ জেরুজালিম এর সাধারণ খ্রিস্টান জনগণের হৃদয়-মন ও নয়নকে অবাক বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে প্রায় বারো লক্ষ বর্গমাইলের পরিধিবিশিষ্ট বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রবল ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপতি ও কিংবদন্তিতুল্য মুসলিম বীর দোর্দণ্ড প্রতাপশালী খলীফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সেই রাখাল বেশেই নগরে প্রবেশ করলেন, উটের প্রকৃত রাখালকে উটের পিঠে চড়িয়ে। চোখের পলকে শেষ হয়ে গেল রোমান সাম্রাজ্যের সেনাপতি জেরুজালিম এর শাসক ও জনগণের যুদ্ধের খায়েশ যুদ্ধোন্মাদ। ঘোড়শালে যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ও সজ্জিত ঘোড়া বাঁধা রইল। অস্ত্রের গুদামে সমস্ত অস্ত্র যথাযথ বিদ্যমান রইল, খাপের মধ্যে রয়ে গেল সমস্ত চর্চিত তীক্ষ্ণ ধারওয়ালা তলোয়ার, তূণীরের তীর তূণীরেই রয়ে গেল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি বিশাল সেনাবাহিনীর পরাজয় ঘটে গেল চোখের নিমেষে প্রকাশ্য দিবালোকে।

www.pathagar.com

গভীর পর্যবেক্ষণে আমার কাছে এ ঘটনাটি একটি প্রতীকী ঘটনা বলেই মনে হয়। মহাকুশলী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অপর কর্ম-কৌশলে একটি চিরন্তন বাস্তবতাকে প্রতীকের মাধ্যমে একটি বাস্তব ঘটনা ঘটিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে (তাৎক্ষণিকভাবে জেরুজালিম নগরের তৎকালীন খ্রিস্টান প্রশাসক সৈন্যবাহিনী ও জনগণের সামনে) এ ঘটনাটিই পরিষ্কার করে দিতে চেয়েছেন যে, ইসলামী শাসনে পতিত অবহেলিত শ্রেণী সকল নিষ্পেশন নির্যাতনের হাত হতে মুক্তি পেয়ে ইজ্জত-সম্মান আর স্বীকৃতির আসনে উঠে আসে– যেমনটি রাখাল উটের রশি ছেড়ে দিয়ে উঠে এসেছে খলীফা ওমর (রাঃ)-এর উটের পিঠে। দায়িত্বের গুরুভার কাঁধে চাপার কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার সকল ক্ষমতা প্রতিপত্তি, আরাম আয়েশের মোহনীয় প্রলোভন দু পায়ে ঠেলে প্রজা সাধারণের সকল অধিকার সুযোগ ও সুবিধাকে নিশ্চিত করতে নেমে আসেন ক্ষমতার চূড়া হতে জনগণের দোরগোড়ায়, তাদের দুঃখ-কষ্ট আর চাওয়া-পাওয়ার সমান অংশীদার হয়ে। এখানে অর্থাৎ এই সুনির্দিষ্ট ঘটনায় উট হলো একটি ইসলামী রাষ্ট্র, উক্ত রাখাল হলো রাষ্ট্রের সীমানায় বসবাসকারী জনসাধারণ আর স্বয়ং খলীফা (রাখাল বেশে) হলেন রাষ্ট্রের জনসাধারণসহ রাষ্ট্রের পথপ্রদর্শক রাহবার। এভাবে মিলিয়ে দেখুন চমৎকারভাবে মিলে যাবে প্রতিটি ঘটনার সাথে, প্রতিটি ভূমিকার সাথে, প্রত্যেকটি প্রতীক।

বস্তুতই এখানে এটি এক বিরাট ভাবনার বিষয়-আধুনিক মারণাস্ত্র নয়। তৎকালীন যুগ ও সময়োপযোগী বিশাল সৈন্যবাহিনীও নয় তবে, কোন জিনিসটি এ ধরনের বিস্ময়কর সব জয়-পরাজয়ের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল? হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক মুসলিম সেনাপতি হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর প্রশ্নের জবাবে প্রদত্ত বক্তব্যের মধ্যেই রয়েছে সেই উত্তরটি, আর তা হলো শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের চিত্ত, সকলের হৃদয়-মন জয় করার মত উন্নত নৈতিকতা, আদর্শ আর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তির নিষ্ঠা অদম্য সাহস আর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি।

বস্তুতই ইসলাম এ বিশ্বকে জয় করেছে বিশ্বে তার শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত রেখেছে বা রেখেছিল একমাত্র উন্নত শিক্ষা, নৈতিকতা ও আদর্শ চরিত্র দ্বারা। এখানে অস্ত্রের ভূমিকা মুখ্য নয়, বরং নিতান্তই গৌণ। যখনই এবং যেখানেই মুসলিম সেনাবাহিনী এই উন্নত নৈতিকতা হতে বিচ্যুত হয়েছে, আদর্শ হতে দূরে সরে পড়েছে বা আদর্শ ত্যাগ করেছে তখনই তাদের পরাজয় এসেছে। তাদের বিশাল সাম্রাজ্য শান-শওকত, প্রাচুর্য, সৈন্যবাহিনী এসব কোন কাজেই আসেনি। উমাইয়া শাসনকে রক্ষা করতে পারেনি দামেশক এর চোখ জুড়ানো জলুস আর শান-শওকত, আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে পারেনি মোঙ্গল সৈন্যদের যুদ্ধোন্মাদ আর ধ্বংসযজ্ঞ এবং নারকীয় হত্যাযজ্ঞের হাত থেকে স্বপ্নপুরী

www.pathagar.com

বাগদাদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও সম্পদের প্রাচুর্য। স্পেন এর মুর শাসনকে ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার সৈন্যদের আগ্রাসী ও বীভৎস আক্রমণ হতে রক্ষা করতে পারেনি আল-হামরা প্রাসাদ, জাহারা উদ্যান আর কর্ডোভা নগরীর বিশ্বজোড়া নাম ও গৌরব। তেমনি তুরস্কের ওসমানিয়া খিলাফতকে রক্ষা করতে পারেনি তুর্কী জাতির শৌর্য-বীর্য। যেমনি ভারতের কোহিনূর কিংবা তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন কিংবা লালকেল্লা কোনোটিই ঠেকাতে পারেনি মোগল সাম্রাজের পতনকে। এসবতো জাজ্বল্যমান ইতিহাস, অস্বীকার করার পথ নেই-প্রয়োজনও নেই। এসব সাম্রাজ্যের পতন যুগে শাসকবর্গসহ জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের নৈতিক অধঃপতন ও দর্শনচ্যুত হবার কারণেই সমগ্রভাবে তাদের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। কাজেই একথা একটি প্রমাণিত সত্য যে উন্নত নৈতিকতা ও ইসলামী আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্যই হলো একটি ইসলামী রাষ্ট্রের মূল প্রতিরক্ষাশক্তি।

ইসলামী রাষ্ট্র শুধুমাত্র একটি আদর্শকে (ইসলাম) ধারণ করে প্রতিষ্ঠিতই হয় না বরং এর পাশাপাশি বিশ্বে প্রচলিত অন্য সকল আদর্শ, সকল মতবাদ এবং সেসব আদর্শ ও মতবাদকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সব ধরনের প্রতিষ্ঠান (হতে পারে তা একটি রাষ্ট্র) ও ব্যক্তিবর্গের সকল ধরনের কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বা অস্তিত্বের প্রতি সরবে প্রকাশ্যে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এর ফলে অনিবার্যভাবে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে বিশ্বের সকল বাতিল মতবাদ দর্শনের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ইসলাম ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছু যেমন ব্যক্তি সমাজ প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র, সকল কিছুর বিরুদ্ধেই খড়্গ হস্ত হয়ে ওঠে। তাদের নিজেদের মধ্যে পার্থিব ও আদর্শিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে যতই দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থাকুক না কেন তা সত্ত্বেও তারা ঐক্যবদ্ধ হয় অন্তত ইসলামী রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের নির্মূল সাধনে অথবা নিদেনপক্ষে ইসলামী রাষ্ট্র বা সমাজের নিকট হতে নিজেদের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে, এ স্বীকৃতিটুকু হলো সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি যা অস্বীকার করার মাধ্যমেই ইসলামী সমাজ বা ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়ে থাকে। যতক্ষণ এ স্বীকৃতিটুকু আদায় করে নিতে পারে ততক্ষণ তাদের ঐক্য ও প্রচেষ্টা জারি থাকে। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেছেন—

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ - (البقرة - ١٢٠)

www.pathagar.com

অর্থাৎ, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন যে পথ আল্লাহ পদর্শন করেন তাই হলো। সরল পথ যদি আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষা সমূহের অনুসরণ করেন ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে। তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। (সূরা বাকারা-১২০) এর নিগূঢ় অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র সবসময় সামরিক- আদর্শিক, সাংস্কৃতিক-সামাজিক তথা সার্বিক ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এতটুকু অসতর্ক বা অসাবধান হয়েছে কিনা ওমনি তাকে তার আদর্শ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে সম্মিলিত কুফরি শক্তি অথবা সুযোগ পেলে তার অস্তিত্বই ধ্বংস করে ফেলবে সামরিক অভিযান চালিয়ে। এ বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিতে পরিষ্কার হয়ে গেলেই আমরা এ কথাটিও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব যে, ইসলামে একটি রাষ্ট্রের জন্য নিজস্ব প্রতিরক্ষার বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

প্রতিরক্ষার অন্যতম অনুষঙ্গ হলো যুদ্ধ। ইসলামে যুদ্ধ হয়ে থাকে মূলত আত্মরক্ষামূলক, তাই ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মূলত আত্মরক্ষামূলক (Deffensive Type) হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র যদি কোনো কুফরি রাষ্ট্র বা তার মিত্র দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে সে আত্মরক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার অস্তিত্ব রক্ষায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, এ হলো এক অবস্থা। দ্বিতীয় আর একটি অবস্থা হলো এই যে, ইসলামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোয় প্রতিষ্ঠার পথে বা প্রতিষ্ঠার পর টিকিয়ে রাখার পথে যতরকম প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বাধার সৃষ্টি হয় (সেসব বাধা সম্ভাব্য সকল পন্থায় মোকাবিলা করার পরেও) সে সকল বাধা-বিপত্তি কুরআনের পরিভাষায় যাকে ফিতনা বলে অভিহিত করা হয়েছে, নির্মূল হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ সুগম না হওয়া অবধি অথবা প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা পালনকারী শক্তির মূলোৎপাটন না হওয়া অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। যেমন কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে–

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

(اَلْاَنْفَال-٣٩)

অর্থাৎ, অতঃপর যুদ্ধ করে যাও ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের (কুফরিশক্তি) সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত না সকল ফিতনা (অন্যায়-অবিচার, জুলুম-শোষণ) দূরীভূত হয়ে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। (সূরা আনফাল-৩৯)

আল-কুরআনের পরিভাষায় এটি হলো কিতাল বা যুদ্ধ। ইসলামে প্রতিরক্ষার ধারণাটি সম্যক উপলব্ধি করতে হলে এ কথাটিও স্পষ্ট বোঝা দরকার যে, ইসলামী প্রতিরক্ষা হলো একটি সমন্বিত কার্যক্রম। এই সমন্বিত কার্যক্রমের নাম হলো জিহাদ অর্থাৎ "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ"। এই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' মোট

www.pathagar.com

পাঁচটি স্তরে বিভক্ত যা একটি সমন্বিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা আর এই ধারাবাহিক পাঁচটি স্তরের চতুর্থ স্তরটিই হলো কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ, ভিন্ন কথায় আল্লাহর দীনকে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে (রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবকাঠামোতে) প্রতিষ্ঠিত করতে ও প্রতিষ্ঠিত রাখতে যে যুদ্ধ এটি ছাড়া ইসলামে যুদ্ধের অন্য কোনো কারণ নেই। সুযোগও নেই। এই 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। ফরযে আইন কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি ফরযে কেফায়া বলেও কোনো কোনো ফকিহ মত প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি মুসলমানের ব্যক্তিসত্তার সাথে এটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রত্যেকের ওপরেই এটা বাধ্যতামূলক যে তারা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বক্ষেত্রে সর্বদা ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় সর্বদা তৎপর থাকবে। নারী, পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের জন্য এটা বাধ্যতামূলক, বস্তুত এটিই হলো প্রকৃত অর্থে ইসলামী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সূচনা বিন্দু। মূলত এ কারণেই আমরা ইতোপূর্বে এ কথা বলেছি যে, প্রতিটি মুসলমান সামরিক-বেসামরিক নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এ ব্যবস্থাটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ কারণেই ইসলাম কখনো এ বিশ্ব হতে সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। ভবিষ্যতেও তা যাবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার আওতায় বসবাসরত প্রতিটি মুসলমান নাগরিকের জন্য (সঙ্গত শরয়ী ওজর ছাড়া) রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হওয়া বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্র ও প্রশাসন তথা সরকার অবস্থা ও প্রয়োজনের নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করে এটা স্থির করবেন যে, একজন মুসলিম নাগরিক কীভাবে, কখন, কতটুকু সম্পৃক্ত হবেন এ কার্যক্রমের সাথে, এ দায়িত্বকে অস্বীকার করার বা এ থেকে পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিষয়ক দায়িত্ব হতে জিহাদ বা কিতাল হতে যারা পিছিয়ে থাকে বা থাকতে চায় এমন সব মুসলমানদের উদ্দেশ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ـ (التوبه ـ ٣٨)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ তোমাদের কী হলো যে, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয় তখন তোমরা মাটি আঁকড়ে ধর তোমরা কী আখিরাতের বিপরীতে দুনিয়ার জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার এ জীবন অতি সামান্যই। (সূরা তওবা-৩৮)

www.pathagar.com

এখানেই শেষ নয় এ ধরনের ভীরুতার জন্য মহান আল্লাহপাক কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তির কথা বলেছেন, আর ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হবার বা পরিচালনা করার তথা ইসলাম নামক দর্শন ও জীবন ব্যবস্থার ধারক-বাহক হওয়া বা প্রতিনিধিত্ব করার মত মহা সৌভাগ্যজনক সুযোগ ও দায়িত্ব হতে বঞ্চিত হয়ে পড়ার স্পষ্ট সতর্ক বাণীও উল্লেখ করেছেন স্পষ্ট ভাষায়–

إِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ـ (التوبه -٣٩)

অর্থাৎ, (দীন প্রতিষ্ঠায়/ দীন রক্ষায়) যদি বের না হও তবে আল্লাহ তোমাদের ভয়ানক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থানে অপর জাতিকে বসাবেন, তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না আর আল্লাহ সকল কিছুর উপরেই পূর্ণ ক্ষমতাশালী। (সূরা তাওবাহ-৩৯)

এই একই বিষয় আল্লাহপাক অন্যত্র আরও প্রাঞ্জল কিন্তু দৃঢ় ভাষায় ব্যক্ত করছেন এভাবে–

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ (المائدة ـ٥٤)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি এ জীবন ব্যবস্থা (দীন ইসলাম) হতে ফিরে যায় (তবে যাক না) তাদের স্থলে আল্লাহ খুব শীঘ্রই এমন একটি গোষ্ঠী তৈরি করে দেবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে। তারা মুমিন-মুসলমানদের প্রতি হবে দয়ার্দ্র ও বিনয়ী এবং সত্য অস্বীকারকারী কাফিরদের প্রতি তারা হবে খুব কঠোর। তারা (আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিষ্ঠিত রাখতে) আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে এবং (এ সংগ্রাম করতে যেয়ে) কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরওয়া করবে না। এটা (আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম, চেষ্টা-সাধনা করতে পারা) আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, যাকে তাঁর খুশি তাকে (তিনি এ অনুগ্রহ) দান করেন। মূলত আল্লাহ বিশাল বিপুল উপায় উপাদানের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ (অর্থাৎ তিনি জানেন কখন কাকে এ মহা সৌভাগ্যজনক সুযোগ দান করতে হবে) (সূরা মায়িদা-৫৪)

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে বক্তব্য এতটাই স্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে যে, তা নিয়ে পুনরায় আলোচনা করা, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বিশ্লেষণ-উপস্থাপন করা বা দীর্ঘ বক্তৃতা উপস্থাপন করার কোনো যৌক্তিকতাই নেই। প্রয়োজনও পড়ে না যেকোনো পাঠকেরই হৃদয়-মনকে আলোড়িত করবে এ আয়াতগুলোর মর্মার্থ।

www.pathagar.com

বস্তুত বিশ্ব সমাজে ইজ্জত আর নিরাপত্তা, সুখ ও শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধিসহ বসবাসের পূর্ব শর্ত হলো ফিতনা-ফেসাদ, জুলুম, অন্যায়-অবিচার উৎপড়িনমুক্ত একটি সমাজ ব্যবস্থা, একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো। এ রকম একটি রাষ্ট্র বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার কোন সযত্ন প্রয়াস প্রচেষ্টা থাকবে না অথচ তা এমনিতেই বিনা তৎপরতায় প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবে তা কখনোই হতে পারে না। তাই এ তৎপরতা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার এবং সে রকম একটি রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব মুসলমানদের। তারা আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত তাওহীদ ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রিসালাত এর ওপরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে এ দায়িত্বটি নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছে। এখন এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মধ্যেই তাদের কল্যাণ, তাদের সুখ-শান্তি -সমৃদ্ধি আর নিরাপত্তাসহ সকল পার্থিব (এবং অবশ্যই পারলৌকিক) কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ সত্যটিই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অতি স্পষ্টতার সাথেই উল্লেখ করে বলেছেন, যেমন দেখুন-

অর্থাৎ, আর তোমরা বের হয়ে পড়ো (দীন প্রতিষ্ঠায়) অল্প বা প্রচুর সর ামের সাথে আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর, তোমরা যদি বুঝে থাক। (তাওবা-৪১)

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ـ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ (اَلْقُرْاٰنِ) (سُوْرَةُ الصَّفِّ ـ ١١ـ١٢ـ١٣)

অর্থাৎ, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ এবং নিজেদের জান-প্রাণ দিয়ে। এটা তোমাদের জন্য খুবই উত্তম যদি তোমরা জানো। (বিনিময়ে) আল্লাহ তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন এবং এমন সব বাগিচায় তোমাদের স্থান দেবেন যার তল দিয়ে সর্বদা ঝর্ণা প্রবহমান আর চিরস্থায়ী জান্নাতে তোমাদের উত্তম আবাসস্থল গৃহ দেবেন এটা বিরাট সফলতা। আর সেসব বস্তুও তিনি তোমাদের দেবেন যা তোমরা চাও। আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় খুবই সন্নিকটে। (হে রাসূল) মুমিন ঈমানদারকে এ শুভ সংবাদ জানিয়ে দিন। (সূরা সফ ১১-১২-১৩)

www.pathagar.com

এভাবে জিহাদ ও (প্রয়োজনে) কিতাল (যুদ্ধ) প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আর এর সাথে সাথে এর বিনিময় হিসেবে যে সীমা সংখ্যাহীন পুরস্কার রয়েছে পার্থিব সুখ-শান্তি আর ইজ্জত নিরাপত্তার সাথে সাথে পরকালীন সফলতা রয়েছে, তা পুনঃপুন স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য, এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, মুসলমানরা যেন দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হতে এবং এর প্রয়োজনে যুদ্ধ করা হতেও যেন কোনোমতেই পিছিয়ে না পড়ে বরং তারা যেন পরকালীন জীবনের মহা সফলতা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দ্বিধাহীন চিত্তে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। যেখানেই অন্যায়-অবিচার, জুলুম-শোষণ, ফিতনা-ফেসাদ এর বিন্দুমাত্রও অস্তিত্ব রয়েছে সেখানেই সে যেন তৎপর হয় তার মূলোৎপাটনে। বস্তুত আমরা ইতোমধ্যেই একথা বলেছি যে, সমাজে বা রাষ্ট্রে ইসলাম পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা পায় না সেখানে অতি অবশ্যই অন্যায়-অবিচার, জুলুম-শোষণ, ফিতনা-ফেসাদ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং মজার ব্যাপার হলো এসব জুলুম-অন্যায়-শোষণ ইত্যাদি বিষয়কে রাষ্ট্র তার পবিত্র সংবিধান, আইন ও প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় দায়িত্ব হিসেবে লালন করে থাকে এবং যুগের পর যুগ ধরে এ গুরুদায়িত্বটি পালনও করে যায় অত্যন্ত গর্ব ও আত্মপ্রসাদের সাথে।

হযরত ওসমান (রা.) খোলাফায়ে রাশেদার মহাসম্মানিত একজন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সৌভাগ্যবান সাহাবী, তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি হলো এই যে–

ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقران

অর্থাৎ 'আল্লাহতাআলা কুরআন দ্বারা যা করান না, তা রাষ্ট্রশক্তিদ্বারা সম্পন্ন করিয়ে থাকেন।'

সম্মানিত সাহাবী হযরত ওসমান (রা.) যিনি তার জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সু-সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর উক্তির যথার্থতার সাথে পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করেই আমরা বলতে চাই যে, আল্লাহপাক রাষ্ট্রশক্তিদ্বারা যে কাজটি করিয়ে নেন তা হলো ফিতনা-ফেসাদের মূলোৎপাটন ও সত্য সুন্দরের (ইসলাম) লালন। যে সমাজে ফিতনা-ফেসাদ এর প্রাবল্য বিদ্যমান সেখানে ইসলামী শাসন টিকে থাকতে পারে না আবার যেখানে ইসলামী শাসন শক্তি অর্জন করে ও প্রতিষ্ঠা পায় সেখানে ফিতনা-ফেসাদ, অন্যায়-অভিচার এর বিকাশ ঘটাতো দূরে থাক এ সবের উদ্ভবও ঘটতে পারে না। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এ দুটো বিষয়ের সহাবস্থান এক কথায় অসম্ভব ও অবাস্তব। আর তাই প্রতিটি মুসলমানের জন্য এ নির্দেশটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে, তারা ইসলামকে পূর্ণ সামাজিক-রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোয় প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই সকল ধরনের ফিতনার মূলোৎপাটন করবে। আর এই কর্মটি সুষ্ঠুভাবে ও পূর্ণতার সাথে সমাধা না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটা মুসলমানদের দায়িত্ব, এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক

www.pathagar.com

প্রদত্ত নির্দেশ। ইতোপূর্বে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াত দ্বারা তা আমরা দেখেছি। আর এ ফিতনা-ফেসাদ কী? এক কথায় ইসলামের বিপারীতে যত রকম মতবাদ রয়েছে (আপাত দৃষ্টিতে যতই চাকচিক্যময় ও শ্রুতিমধুর মনে হোক না কেন) সেসব মতবাদকে কুরআনুল কারীমে ফিতনা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আর এ সকল মতবাদ যেখানে যেটি প্রতিষ্ঠিত থাকে না কেন তাকে নির্মূল করে সেখানে ইসলাম বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে আর এ কাজটি সমাধা হবে মুসলমানদের কর্মতৎপরতা যাকে জিহাদ বলা হয়েছে। তার মাধ্যমে যেমন দেখুন–

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ (الصف ـ ٩)

অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়েত ও সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা (দীন)সহ, যেন তিনি (রাসূল) অন্য সকল জীবন-ব্যবস্থা (দীন) এর ওপরে এ দীনকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন কাফিররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন। (সূরা সফ-৯)

উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় বর্ণিত স্পষ্ট লক্ষ্য এবং মুসলমানদের দায়িত্ব কী তা সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করার পাশাপাশি সে উদ্দেশ্যটি অর্জনের পথ-পন্থা ও কর্মপদ্ধতিটি কী হবে তাও স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহপাক নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমায় এভাবে বলেছেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوااللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ (ال عمران ـ ٢٠٠)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ আল্লাহর দীন এর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরক্ষার জন্য ধৈর্যসহ কাজ করো, ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে বাতিল পূজারিদের সাথে প্রতিযোগিতা করো এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বদা প্রস্তুত থাকো, আল্লাহকে ভয় করে চলো, তা হলে এভাবে তোমরা অবশ্যই সফলকাম হবে। (সূরা আলে-ইমরান-২০০)

এই ইসলাম ধর্ম হিসেবে নয় বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় একটি ভূ-খণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন এটি হয় সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি বাস্তব ও অনুধাবনযোগ্য চাক্ষুষ মডেল। এই বাস্তব মডেলটি প্রতিষ্ঠা করা যেমন প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরয তেমনি তাকে তার পূর্ণাঙ্গ অবয়বে ও সঠিক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখাও প্রতিটি মুসলমানের নৈতিক ধর্মীয়-রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দায়িত্ব। এ দায়িত্বের প্রধানতম অংশটি অর্পিত থাকে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার তথা

www.pathagar.com

শাসকবর্গের ওপর। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সবরকম আয়োজন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করবে। এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালনের উদ্দেশ্যে সমকালীন সম্ভাব্য সকল প্রচলিত অস্ত্র ও প্রযুক্তি উৎপাদন করবে, করায়ত্ত বা সংগ্রহ করবে, করতে সচেষ্ট থাকবে। সমগ্রভাবে মুসলিম সমাজ, বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক ও দায়িত্বশীলদের জন্য এটি ফরয করা হয়েছে। কুরআনুল-কারীমে নাযিলকৃত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ দ্বারা এভাবে–

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ـ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْئٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ـ (الانفال ـ ٦٠)

অর্থাৎ, আর প্রস্তুত করো তাদের (কাফির) সাথে যুদ্ধের জন্য যাই সংগ্রহ করতে পারো, নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর দুশমনদের ওপর এবং তোমাদের দুশমনদের ওপর আর তাদের ছাড়া অন্যদের ওপরেও, যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ তাদের চেনেন। বস্তুত: যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোনো হক অপূর্ণ থাকবে না। (সূরা আনফাল-৬০)

তৎকালীন যুগে জিহাদ এর উপযোগী বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ও পালিত ঘোড়া ছিল যুদ্ধের জন্য সর্বাধুনিক মাধ্যম অস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ। আজ অধুনা বিশ্বে সে স্থান দখল করে নিয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর ফসল অত্যাধুনিক ট্যাংক, যুদ্ধবিমান ফ্রিগেটসহ অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয় আর তা হলো বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতি পরস্পরের মধ্যে যে ধরনের অশুভ ও ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কখনোই সে ধরনের প্রতিযোগিতায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারে না, এটি তার আদর্শিক চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী একটি কাজ। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র (যেমন রাশিয়া, ভারত ইত্যাদি) তার কোটি কোটি নাগরিককে অভুক্ত রেখে দারিদ্র্যসীমার নিচে ফেলে রেখে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে অসম সামরিক ও অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, নাগরিকগণ বা তাদের বৃহৎ একটি অংশ মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকে এরকম একটি পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্র কখনোই নিজেকে নামিয়ে আনবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রে যদিও সকল মুসলমান নর-নারীই এক একজন সৈন্য, আল্লাহর সৈনিক তবুও এ রাষ্ট্রটি বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় নিয়মিত ও

www.pathagar.com

পেশাদার সৈন্যবাহিনী রাখে। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে সকল সক্ষম পুরুষই ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়মিত সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত, যুদ্ধ বা জিহাদের আহ্বান শোনামাত্র তারা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হাজির হতেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর শাসনামলে সর্বপ্রথম নিয়মিত ও পেশাদার সৈন্যবাহিনী গড়ে ওঠে। ইসলামী রাষ্ট্র তার সৈন্যবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের নৈতিকমান এর সাথে সাথে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির যাবতীয় আয়োজন করবে। তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও মহড়ার ব্যবস্থা করবে। সর্বাধুনিক যুদ্ধকৌশল উদ্ভাবন করবে ও শিক্ষা দেবে।

শত্রু বাহিনীকে যুদ্ধে হতবিহ্বল হতচকিত করে দেবার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী যুগোপযোগী যেকোনো যুদ্ধকৌশল (ইসলামী দর্শনের দৃষ্টিতে অবশ্যই বৈধ) গ্রহণ করবে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় খন্দকের যুদ্ধে কাফির সৈন্যদের প্রতিরোধে তৎকালীন সুপার পাওয়ার পারস্য সৈন্যবাহিনীর একটি যুদ্ধ কৌশল যা কিনা ঐ সময়ে আরব উপদ্বীপে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অজ্ঞাত ছিল, কাফিরদের গতিপথে কৌশলপূর্ণ স্থানে বিরাট বিরাট খন্দক (গর্ত) খুঁড়ে রাখেন যা কিনা কাফির সৈন্যবাহিনীও তাদের অশ্ববাহিনীর পক্ষে পারি দেয়া ছিল একরকম অসম্ভব প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শক্রমে। তিনিই সর্বপ্রথম আরবে এ যুদ্ধ কৌশল প্রয়োগ করেন এবং তার ফলাফলও পান হাতে হাতে। যদিও যুদ্ধের এ কৌশলটি ছিল অমুসলিমদের উদ্ভাবিত এবং তৎকালীন আরব সমাজে অপ্রচলিত।

তাঁরই হাতে প্রশিক্ষিত সাহাবী হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) পরবর্তীতে সিরিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চল "লাজিকিয়্যা" জয় করেন সেখানকার খ্রিস্টান সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে। উক্ত যুদ্ধে তিনিও সম্পূর্ণ নতুন ও অপ্রচলিত এক সামরিক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি এমনসব বড় বড় গর্ত খনন করান যে, এসব বিরাট বিরাট গর্তের মধ্যে মুসলমান সৈন্যরা তাদের অশ্বসহ অস্ত্রসজ্জিত হয়ে লুকিয়ে থাকে। কাফির সৈন্যরা মুসলমানদের প্রকৃত সৈন্যসংখ্যার ধারণা পায়নি ফলে তারা আপাতদৃষ্টিতে স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের ওপরে প্রবল উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে তাদের সম্পূর্ণ তাজাদম অস্ত্রসজ্জিত অশ্বারোহী মুসলিম সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে বেরিয়ে আসে এবং কাফির সৈন্যদের অতি সহজেই হতবাক অপ্রস্তুত ও শঙ্কিত করে ফেলে এবং অতি সহজেই যুদ্ধে জয়লাভ করে।

সাম্প্রতিককালে এই বিংশশতাব্দীর শেষ মুহূর্তে এসে সেই একই যুদ্ধ কৌশল প্রয়োগ করে আফগান তালেবান বাহিনী আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যদের মোকাবিলায় এবং আশাতীত ফলাফল লাভ করেছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

তাসবীহ্ ও তলোয়ারের সমন্বয়

মুসলমানরা নিজেদের শক্তি, সামর্থ্য, সৈন্যসংখ্যা যুদ্ধ উপকরণ অনুকূল পরিবেশ ও নিত্যনতুন যুদ্ধকৌশলের ওপরে নির্ভর করে না। তারা যুদ্ধ করে একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য যুদ্ধে সফলতাপ্রাপ্তি বা বিজয়ের জন্য। তারা নির্ভরও করে একমাত্র তাঁরই ওপর। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই সে শিক্ষা দিয়েছেন আল-কুরআনে বর্ণিত আয়াতের ভাষায়–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ (الانفال ـ ٤٥)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ তোমরা যখন কোনো বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করো যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সূরা আনফাল-৪৫)

হুনাইনের যুদ্ধে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেনাপতিত্বে পরিচালিত যুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও সংখ্যাধিক্যে অতি উল্লসিত মুসলিম সৈন্যদের নিশ্চিত জয়লাভের ধারণার প্রেক্ষিতে বাস্তব ক্ষেত্রে যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম সৈন্যদের পা টলিয়ে দিয়ে এই শিক্ষাটিই দিতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের নিয়ামক কার্যকরণটি সৈন্যসংখ্যা, যুদ্ধোপকরণ বা অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশ নয় বরং এক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের নিয়ামক শক্তি হল মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য তাঁর গায়েবী মদদ। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিজের ভাষায়–

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَاالَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ (ال عمران ـ ١٦٠)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে (পৃথিবীর) কোনো শক্তিই তোমাদের ওপরে জয়ী হতে পারবে না, আর তিনিই যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তবে তার পরে আর কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? কাজেই যারা প্রকৃত মুমিন তাদের উচিত আল্লাহর ওপরেই ভরসা রাখা। (সূরা আলে-ইমরান–১৬০)

অতএব যারা আল্লাহর ওপরে ভরসা করে তারা তো তাঁরই নিকট সাহায্য চাবে তাঁর সাহায্য ও মদদের ওপর নির্ভর করবে নিজেদের শক্তি ও যোগ্যতার

www.pathagar.com

উপরে নয়। যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহপাক তার সাথে রয়েছেন, তাকে সাহায্য করবেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে সেসব সৈন্যরা হয়ে ওঠে অজেয়, এ ধরনের মদদপ্রাপ্তির যোগ্যতা কী সে সম্বন্ধে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ـ نَحْنُ اَوْلِيٰٓئُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ـ (حٰمٓ السَّجْدَةُ ـ ٣٠ ، ٣١)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা বলে যে, আল্লাহ আমাদের প্রভু এবং তারা (যেকোনো অবস্থায় এ বিশ্বাস আকিদায়) অটল থাকে নিঃসন্দেহে তাদের (সাহায্যের) জন্য ফেরেশতা নাযিল হয়ে থাকে এবং তাদের বলতে থাকে ভয় পেয়ো না, চিন্তা করো না আর সন্তুষ্ট হও সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে যার ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছে। (সাহায্য-সহযোগিতার জন্য) দুনিয়ার জীবনেও আমরা তোমাদের সঙ্গী-সাথী আর পরকালেও। সেখানে তোমরা যা চাও তাই পাবে, যে জিনিসের বাসনা তোমরা করবে তাই তোমাদের সেখানে জুটবে (সূরা হামীম আস-সাজদাহ-৩০,৩১)

সুস্পষ্ট এ আশ্বাসবাণী প্রাপ্তির পরে আর কোনো আল্লাহ বিশ্বাসী মুসলমান তাঁর ওপরে নির্ভর না করে পারে না, প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর গায়েবী মদদের প্রত্যাশী হয়ে থাকে। কিংবদন্তিসম মুসলিম বীর হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর কর্মপদ্ধতিতে আমরা এ সত্যের পুরোমাত্রায় প্রকাশ দেখি।

ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত ইয়ারমুক এর যুদ্ধের এ ঘটনাটি। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তিন লক্ষেরও বেশিসংখ্যক অস্ত্রসজ্জিত সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে ইয়ারমুক এর প্রান্তরে উপস্থিত। এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধের জন্য হাজির হলেন মাত্র চল্লিশ হাজার মুজাহিদ। সংখ্যার এই বিরাট ও ব্যাপক পার্থক্যটি এতই ব্যাপক যে তৎকালীন অন্যতম সুপার পাওয়ার রোমান সৈন্যদের সাথে এরকম স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে মোকাবিলায় দাঁড়ানোর কথা কল্পনাতেও ঠাঁই দিতেন না, কোন স্বনামধন্য সেনাপতিও। কিন্তু আল্লাহর মদদ ও সাহায্যের ওপরে নির্ভরশীল মুসলিম সৈন্যবাহিনী মহান সাহাবী হযরত খালেদ (রা.)-এর নেতৃত্বে সেই দুঃসাধ্য কাজটিই করলেন। সোজা বুক ফুলিয়ে হাসতে হাসতে যুদ্ধের মাঠে হাজির হলেন, ভয়-লেশ এর চিহ্নমাত্রও নেই তাদের চেহারায় বরং

www.pathagar.com

তাদের দেখে মনেই হয় না যে তারা এক অসম বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে এসেছেন বা কোনো রকম যুদ্ধ হতে যাচ্ছে। আল্লাহর ওপরে প্রগাঢ় আস্থাবান দুঃসাহসী মহাবীর খালেদ (রা.) এক অপূর্ব যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করলেন, এ চমৎকার কৌশলটিকেই আমরা তরবারি ও তাসবীহ এ উভয়ের সমন্বয় বলে অভিহিত করেছি। আল্লাহর সাহায্য চেয়ে আল্লাহর কাছে ধর্না দেবার জন্য তিনি (হযরত খালেদ (রা.) সেই চল্লিশ হাজার মুজাহিদদের মধ্য হতে একশত বয়োবৃদ্ধ শারীরিক দিক হতে দুর্বল দরবেশ শ্রেণীর সাহাবীকে আলাদা করে ময়দানের এক দিকে ঠাঁই করে দিয়ে বললেন, শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও আপনারা আবেদ, আমাদের জন্য করুণভাবে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দোয়া করতে থাকুন, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাদের করুণ আকুতি ফিরিয়ে দেবেন না। এর পরে তিনি উক্ত চল্লিশ হাজার মুজাহিদগণের মধ্য হতে এমন একহাজার সাহাবী শ্রেণী মুজাহিদকে আলাদা করলেন যাঁরা তাদের জীবদ্দশায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে প্রায় প্রতিটি যুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে জিহাদে শরীক হয়েছেন। এই একহাজার সাহাবী মুজাহিদকে তিনি যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম বাহিনীর একেবারে সামনের কাতারে নিয়োজিত করলেন। এর পরে তিনি বাকি মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে তিনলক্ষ কাফির সৈন্যের বিরুদ্ধে নেমে পড়লেন যুদ্ধের জন্য, প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো– একটি অসম যুদ্ধ। প্রাণপণ যুদ্ধ চলছে আর ময়দানের এক প্রান্তে প্রায় একশত বয়োবৃদ্ধ দরবেশ সাহাবী কাতরকণ্ঠে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে হাত তুলে দোয়া করছেন, অশ্রুবিসর্জন করে চলেছেন– অবশেষে ঠিকই আল্লাহর সাহায্য নেমে এল। কাফির বাহিনী মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে লাগল। যুদ্ধের ফয়সালা হয়ে গেল। তৎকালীন বিশ্বের সুপার পাওয়ার রোমান বাহিনীর একলক্ষ কুড়ি হাজার সৈন্য লাশ হয়ে পড়ে রইল যুদ্ধের ময়দানে, আর অপর দিকে মুসলিম মুজাহিদের মধ্য হতে তিনহাজার মুজাহিদ শাহাদাতের পেয়ালা পান করে নিয়ে মিলিত হলেন মহান রব এর সান্নিধ্যে। প্রতি একজন মুসলিম শহীদের বিপরীতে আল্লাহপাক কাফির সৈন্যদের চল্লিশজন করে সৈন্য খতম করেছেন আর সেই সাথে মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছেন সম্মানজনক বিজয়।

এ ছিল একজন জগদ্বিখ্যাত মুসলিম বীর এর পক্ষে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর ওপরে ভরসা করা এবং একই সাথে নিজের সম্ভাব্য সকল শক্তি ও অস্ত্র নিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে ময়দানে হাজির হওয়া তথা তাসবীহ ও তরবারির সমন্বয় করার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটি হলো ইসলামী প্রতিরক্ষার মৌলিক দর্শন আর কর্মনীতির মডেল।

www.pathagar.com

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ইসলাম ও যুদ্ধ : পারস্পরিক সম্পর্ক ও সীমারেখা

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বা ইসলাম বিরোধী ঐতিহাসিক ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের লেখায় ইসলামকে যুদ্ধবাজ একটি ধর্ম বা দর্শন হিসেবে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম প্রকাশনা সংস্থা ইত্যাদির ওপরে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকার সুবাদে এ ধারণা বিশ্বব্যাপী অনেকটাই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে। আসলে প্রকৃত সত্য এর ঠিক বিপরীত। মূলত ইসলামের সাথে যুদ্ধের সম্পর্ক ততটুকুই মাত্র প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে আক্রান্ত হয়েও আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু যুদ্ধ না করলে নিজের অস্তিত্বই টিকে না। আমরা ইতোমধ্যে পূর্বের অধ্যায়ে সেই কথাটিই বলেছি এভাবে যে, ইসলামে যুদ্ধ হয়ে থাকে Deffensive Nature এর বা আত্মরক্ষামূলক, যেখানে যুদ্ধের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য (Immediate Goal) হয়ে থাকে নিজ অস্তিত্বের প্রতি আগ্রাসী শক্তিকে, ততটুকু দুর্বল করা যতটুকু দুর্বল হলে তার পক্ষ হতে ইসলামের কোনো ধরনের অস্তিত্ব ধ্বংসের কারণ হবার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে না। ইসলামে যুদ্ধ আক্রমণাত্মক বা Aggressive Nature এর হয় না। আক্রান্ত না হলে ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয় না। যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার কোনো বৈধ ও যৌক্তিক পথ পেলে সেখানে ইসলাম এই শান্তিপূর্ণ পথই অবলম্বন করে থাকে নিজ শক্তি-সম্পদ ও লোকবলে গর্বিত হয়ে অথবা শত্রুপক্ষের প্রতি সীমাহীন ক্রোধে বা প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে অপ্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার কোনো সুযোগ নেই ইসলামে। ইসলাম তার উন্নত দর্শন ও শিক্ষা, ন্যায় ও ইনসাফ, মায়া-মমতা, ক্ষমা-উদারতা, ঔদার্য-মহানুভবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে মানুষের অন্তর জয় করতে চায়। যুদ্ধ-হানাহানি, হিংসা বিবাদ এর মৌলিক কার্যকরণের শেকড় উপড়ে ফেলতে চায় অথচ এ সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে না করে বা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা না করেই ইসলামকে যুদ্ধবাজ দর্শন হিসেবে চিত্রিত করাটা শুধু দুঃখজনকই নয় বরং মানবতার জন্য দুর্ভাগ্যজনকও বটে।

সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় এবং কল্যাণ-অকল্যাণের মধ্যে চির দ্বন্দ্বপূর্ণ সম্পর্কসহ আরও কিছু বোধগম্য কারণে বিশ্বের সকল ইসলামবিরোধী শক্তি ইসলামের স্বকীয় অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে বা সহ্য করতে প্রস্তুত নয় মোটেও। তারা পারলে তাদের মুখের একটি মাত্র ফুৎকারেই ইসলামের অস্তিত্ব নিঃশেষ করে দিতে চায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এ মানসিকতার সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আল-কুরআনের পাতায় আয়াত নাযিল করে এভাবে–

www.pathagar.com

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ـ (التوبه ـ ٣٢)

অর্থাৎ, তারা কাফিররা চায় যে আল্লাহর নূর (ইসলাম)কে তাদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দেবে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলো (ইসলাম)কে পরিপূর্ণ না করে ছাড়বেন না, কাফিরদের পক্ষে তা (দীন হিসেবে ইসলামের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা) যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন। (তাওবা–৩২)

ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার অভিলাষে তৎপর গোষ্ঠীর সকল প্রচেষ্টার বিপরীতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর উল্লিখিত ঘোষণার ফলে ইসলামকে যারা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর সচেষ্ট তাদের সাথে প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। কাফিরদের এই বিরোধিতার অবসান আল্লাহ চাইলে তাঁর নিজ কুদরতি শক্তি বলে করে দিতে পারেন অথবা আল্লাহ নিজেই নিজ ব্যবস্থাপনায় তাদের শাস্তির ব্যবস্থা (ইসলামের অনুসারীদের সাথে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছাড়াই) করতে বা তাদের সাদ-আমুদ জাতির ন্যায় ধ্বংস করে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান, অতিতে যেমন ছিলেন বর্তমানেও তেমনি আছেন এবং অনাগত ভবিষ্যতেও তিনি ঠিক তেমনি পূর্ণ ক্ষমতাবান থাকবেন। এ ধরনের পূর্ণক্ষমতা ও ইখতিয়ার তাঁর হাতে থাকা সত্ত্বেও তিনি কি কারণে এ উভয় গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত (যার পরিণতিতে পারস্পরিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে থাকে) অনিবার্য করেছেন। তার জবাবও তিনি নিজেই পবিত্র কালামে পাকে উল্লেখ করেছেন এভাবে–

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ـ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (التوبه ـ١٤-١٥)

অর্থাৎ, তাদের (কাফির-সত্য অস্বীকারকারী) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের (তাদের অপকর্মের) শাস্তি দেবেন ও তাদের লাঞ্ছিত-অপমানিত করবেন আর তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দেবেন। তাদের হৃদয়ের যন্ত্রণা প্রশমিত করবেন এবং যাকে চান (কাফিরদের মধ্য হতে) তাওবা করার সুযোগ দেবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত ও সুবিজ্ঞ। (সূরা তাওবা-১৪-১৫)

এখানে স্পষ্টরূপেই বিবৃত হয়েছে যে, এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত সত্যের অনুসারী মুসলমান এবং সত্য অস্বীকারকারী কাফির উভয় গোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ রাব্বুল

www.pathagar.com

আলামীনের পক্ষ হতে পরীক্ষা। মুসলমানদের জন্য তা পরীক্ষা হলো এই কারণে যে, এ পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দেখতে চান, জানতে চান যে কোন সে মুসলমান যে, নিজ সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি জান-মাল-সম্পদ এ সকল কিছুর মায়া ত্যাগ করে, শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভালোবাসায় তাঁর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি লাভের আশায় নিঃশঙ্ক ও প্রশান্ত হৃদয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে তথা যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়বে আর বংশ-গোষ্ঠী ও আত্মীয়তার যতরকম ভালবাসা টান মায়া-মমতা ত্যাগ করে শুধুমাত্র এবং একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে সত্য অস্বীকারকারী কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর ও নিরাপোষকামী ভূমিকা পালন করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত না সত্য অস্বীকারকারীরা তা অস্বীকার করা হতে অথবা নিদেনপক্ষে এ সত্যকে নির্মূল করার অশুভ প্রচেষ্টা হতে নিবৃত্ত হয়। আর এ পথে উদ্ভূত সকল দুঃখ-কষ্ট, ক্লেশ-বেদনা, যন্ত্রণা ও বঞ্চনাকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই অম্লান বদনে সয়ে যায়। এ কথারই আমরা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে–

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ (التوبه ـ١٦)

অর্থাৎ তোমরা কী (একথা) ভেবে নিয়েছ যে, তোমরা এমনিতেই ছাড়া পেয়ে যাবে? যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন যে তোমাদের মধ্য হতে কোন লোকেরা (তাঁর পথে) আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা করেছে (দীন প্রতিষ্ঠার জন্য) এবং আল্লাহ্ তার রাসূল ও মুমিন লোকদের ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি। তোমরা যা কিছুই কর না কেন। (মনে রেখো) আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ রূপে অবগত রয়েছেন। (সূরা তাওবা-১৬)

অপরদিকে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত সত্য অস্বীকারকারী কাফিরদের জন্য পরীক্ষা হলো এভাবে যে, সত্য অস্বীকারকারী কাফিররা এ পৃথিবীতে ইসলামের মত শাশ্বত সত্য স্বীকার করে নিয়ে এ সত্যের নিকট যারা আত্মসমর্পণ করে পৃথিবীতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে খলীফা বা প্রতিনিধিত্বের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। তাদের হাতে-তাদের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর ফয়সালা (সত্য অস্বীকার করার পার্থিব পরিণাম এ পৃথিবীতে লাঞ্ছনা-অপমান) বাস্তবায়িত হবার প্রত্যক্ষরূপ দেখবে তাদের নিজেদের ওপরেই নিজেদের জীবনে। এ হলো সত্যকে অস্বীকার করার পরিণাম হিসেবে যে ধরনের শাস্তি নির্ধারিত থাকে (একটি পার্থিব যা এ পৃথিবীতে দেয়া হয় অপরটি পরকালীন যা পরকালে

www.pathagar.com

দেয়া হবে) তার মধ্যে লঘুটি। অথবা এই সত্য অস্বীকারকারী কাফিরগোষ্ঠী তাদের জীবদ্দশায় তাদের চোখের সামনে সত্য স্বীকার করে নিয়ে তা রক্ষায়, তা প্রতিষ্ঠায় তাদেরই মত একদল মানুষকে জীবনের সকল সুখ-সম্পদ, আরাম-আয়েশ, লোভ-লালসা ত্যাগ করে, শত দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন নিপীড়ন-বঞ্চনা সহ্য করেও সেই একই সত্যকে (যাকে তারা অস্বীকার করেছে পার্থিব ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভ প্রলোভনে জীবন সম্পদ এর মায়ায় পদদলিত করেছে) প্রতিষ্ঠায় ও লালনে নিঃস্বার্থ ত্যাগ-এর মত উন্নত নৈতিক মান দেখবে হয়ত এরকম বাস্তব নমুনা যখন তারা নিজ চোখে দেখবে তখন তাদের কারো কারো মধ্যে বিবেকের দংশন শুরু হবে হয়ত, তারা সকলে অথবা কেউ কেউ (ইতোপূর্বে উদ্ধৃত সূরা তাওবার ১৫ নং আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী মহান আল্লাহ যার জন্য এ সুযোগ মঞ্জুর করবেন) নিজেদের হঠকারিতা উপলব্ধি করে অনুশোচনায় অনুতপ্ত হবে (তাওবা করবে) এবং সত্যকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করে নেবার জন্য এগিয়ে আসবে ও তা স্বীকার করেও নেবে। ঠিক এরকম চিত্রেরই আমরা সন্ধান পাই রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে এসে। দীর্ঘ প্রায় কুড়িটি বছর মক্কার কাফির সম্প্রদায় সীমাহীন হঠকারিতার মাধ্যমে তাঁর সকল দাওয়াত ও কর্মকাণ্ডের বিরোধিতাই শুরু করেনি বরং তাঁদের প্রতি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)সহ তাঁর গুটিকতক সত্যনিষ্ঠ অনুসারীদের প্রতি অমানবিক নির্দয় আচরণ করা সত্ত্বেও তারা (কাফিররা) সেই ছোট্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের চরিত্রে উল্লিখিত ধরনের উন্নত নৈতিক মান দেখতে পেয়ে মক্কা বিজয়ের মুহূর্তে বিরোধিতাকারী সেই কাফিরগোষ্ঠীই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলে দলে সত্যকে স্বীকার করে নেবার জন্য পতঙ্গের ন্যায় ছুটে এসেছে। একটি বিশেষ গোষ্ঠী কর্তৃক যেমনটি প্রচারিত হয়ে থাকে ইসলাম যদি সত্যিকারভাবে ঠিক তেমনটিই হতো অর্থাৎ যুদ্ধাংদেহী দর্শনই হতো তবে মক্কা বিজয়ের ইতিহাস হতো একদম ভিন্ন। বস্তুত মক্কা অভিযান তথা মক্কা বিজয়ের এ ঘটনাটির বিশ্লেষণই যথেষ্ট ইসলাম ও যুদ্ধ পারস্পরিক সম্পর্ক ও সীমারেখাটুকু উপলব্ধির জন্য।

দীর্ঘ তেরোটি বছর এই মক্কাবাসী সত্য আহ্বানকারী ব্যক্তি (মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারী মুসলমানদের প্রতি যে সীমাহীন অত্যাচার চালিয়েছে তা একবার স্মরণ করুন। তাদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে নিজেদের বাস্তুভিটা, নিজেদের প্রিয় জন্মভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করে পুরোপুরি উদ্বাস্তু হয়ে মদীনায় যেয়ে তাঁরা একটু শান্তিতে, একটু স্বস্তিতে বসবাস করবে সে সুযোগটুকু এ কাফিররা দিতে প্রস্তুত নয়। একের পর এক তাদের ওপরে আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে, তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ তৈরি ও তা উস্কে দিতে চেয়েছে। সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করেছে ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধার সৃষ্টির করেছে। জান-মালের ক্ষতি সাধন করেছে। চুক্তি-ওয়াদা ভঙ্গ করেছে, প্রতিশ্রুতির বরখেলাফ করেছে।

www.pathagar.com

তাদের প্রতিটি অপরাধই ছিল অত্যন্ত জঘন্য ও গুরুতর। এ বিশ্ব ইতিহাসে প্রাচীন বা আধুনিক যুগে যেখানেই দেখুন দেখবেন অত্যাচারিত গোষ্ঠী সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধ নেবার বেলায় সেই অত্যাচারী গোষ্ঠীর সাথে কী ধরনের আচরণ করেছে। দেখবেন এমন অনেক ঘটনা এ বিশ্ব ইতিহাসে বিদ্যমান, যেখানে পুরো কওমকে তাদের নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু, তাদের পুরো বংশকে কীভাবে নিশ্চিহ্ন করেছে। জনপদগুলোকে কীভাবে বিরান ও জনশূন্য করেছে। প্রাণ ও সম্পদের সর্বনাশ করেছে, কী জঘন্য উন্মাদনা আর প্রতিশোধস্পৃহায়। এসব ঘটনার পাশাপাশি মক্কা বিজয়ের ঘটনাটিও দেখুন এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) নগরে প্রবেশ করছেন। এ বিরাট সৈন্যবাহিনীর আগমনের সংবাদে মক্কার কাফিররা কোন কার্যকর প্রতিরোধও গড়ে তুলতে ব্যর্থ অথচ এই তারাই নিজ বাড়িঘর, নিজ জনপদ হতে যুদ্ধের উন্মাদনায় প্রায় চারশত কিলোমিটার দূরে হেঁটে যেয়ে মদীনায় যুদ্ধ করে এসেছে। আজ তারা ভয়েও ভটস্থ, নিজেদের প্রাণের ভয়ে তারা দিশেহারা। সেই বাহিনী সশস্ত্র অবস্থায় হাজির যাদের ওপরে তারা দীর্ঘ দুটি দশক ধরে অত্যাচার-নিপীড়ন চালিয়েছে। যাদের অনেক স্বামীকে হত্যা করেছে। জখম করেছে, বাস্তুভিটা হতে উচ্ছেদ করেছে, নির্বাসিত করেছে।

অথচ এরকম অবস্থায় মুসলমানদের সেনাপতি আল্লাহর রাসূল (সা.) সকলের জন্য ঘোষণা করে দিলেন যারা নিজ নিজ ঘরের ভেতরে থাকবে তারা নিরাপদ, যারা নিজেদের তলোয়ার খাপের মধ্যে রাখবে তারা নিরাপদ, যারা কাবাঘরে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ, যারা আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ। এ ধরনের ঘোষণার ফল হলো এই যে, মক্কার জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে যুদ্ধের প্রতিরোধ রচনার স্পৃহা দূর হলো (যদিও সে ক্ষমতা তাদের ছিলও না) শঙ্কা কমে এলো, নিরাপত্তার আশা দেখা দিল এভাবে সরাসরি সংঘাত ও অস্ত্রের মোকাবিলার সম্ভাবনা দূর হলো যা অনিবার্যভাবেই প্রাণ ও সম্পদের হানি করত, রক্তের বন্যা বইয়ে দিত। একটি বাড়িতেও অগ্নিসংযোগ করা হলো না, একটি প্রাণও হত্যা করা হলো না। সকল নির্যাতন, সকল অত্যাচার এর স্মৃতি ভুলে তিনি ক্ষমা ঘোষণা করলেন। ইসলামের অনুসারীদের পরিবর্তে মক্কা অভিযান পরিচালনাকারী এ দলটি যদি অন্য কোন দর্শনের ধারক হতো তাহলে এ ধরনের যুদ্ধের চিত্র কল্পনাও করা যেত কী? বরং ইতিহাস রচিত হতো সেখানে ব্যাপক হত্যা, ধ্বংস আর তাণ্ডবের। এর পরেও কী ইসলামকে যুদ্ধাংদেহী একটি দর্শন বলার কোন যুক্তি থাকে?

তাই আমরা দৃঢ় আস্থা ও পরিপূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে এ কথা বলতে পারি যে, ইসলামে যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হওয়া ও তা প্রতিষ্ঠার পথে কার্যকর বাধার অপসারণ হয়ে যাওয়া। তাই ইসলামী দর্শনে যুদ্ধের একটা সূচনাবিন্দু যেমন আছে তেমনি তার একটি সীমারেখাও নির্দিষ্ট করা

www.pathagar.com

আছে। উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হলে, কখন কোথায় যুদ্ধের ডামাডোল বন্ধ করতে হবে তাও নির্দিষ্ট করা আছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন কোন বাহিনীকে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করতেন তখন বাহিনীর অধিনায়ককে বলে দিতেন যুদ্ধের শুরুতে প্রতিপক্ষের সামনে তিনটি প্রস্তাব রাখতে। তা হলো এক. ইসলাম, দুই. জিজিয়া এবং তিন. যুদ্ধ। অর্থ্যাৎ তারা যদি ইসলামের শাশ্বত ও সর্বজনীন দাওয়াত কবুল করে নেয় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ হারাম হয়ে যাবে, তারা যদি এ দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং জিজিয়া দিতে প্রস্তুত হয়ে যায় তবে সে ক্ষেত্রেও তাদের সাথে যুদ্ধ নয় বরং তাদের জান-মাল ইজ্জতের পূর্ণ নিরাপত্তা দানের দায়িত্ব তখন ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে এসে যাবে আর তারা যদি উল্লিখিত দুটি প্রস্তাবের কোনটিই গ্রহণ করতে রাজি না হয় তবে আল্লাহর নাম নিয়ে যুদ্ধ শুরু কর। তিনি (সা.) বলতেন– আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে অভিযান শুরু করো। আল্লাহর সাথে যারা কুফরি করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো কিন্তু যুদ্ধে কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদাভঙ্গ করো না, গনিমতের মাল আত্মসাৎ করো না। লাশ বিকৃত করো না এবং কোনো শিশুকে হত্যা করো না।

এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ নিম্নরূপ –

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ (البقره ١٩٠)

অর্থাৎ, যারাই যুদ্ধ করে তোমাদের বিরুদ্ধে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নামে যুদ্ধ করো কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না, সীমালঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন না। (সূরা বাকারা-১৯০)

যুদ্ধে যে সামরিক লক্ষ্য তা হলো ফিতনা-ফেসাদ দূরীভূত মূলোৎপাটিত হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার পথ সহজ হয়ে যায়। বিরোধীদের শক্তি ও সামর্থ্য অন্তত এতটা দুর্বল যেন হয় যে তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা ইসলামী শাসন চালুর পথে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার পথে কোনো কার্যকর প্রতিরোধ সৃষ্টির যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলে। এ কথার পরিষ্কার একটি নির্দেশনা আমরা পেয়ে যাই। কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত এ আয়াতে–

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ـ (التوبه ـ ٢٩)

অর্থাৎ, যুদ্ধ করো তাদের সাথে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

www.pathagar.com

স্থাপন করে না এবং যেসব হারামকে হারাম হিসেবে স্বীকার করে না যা আল্লাহ ও তার রাসূল হারাম বলে ঘোষণা করেছেন, আর সত্য দীন (ইসলাম)কে নিজেদের দীন হিসেবে মেনে নেয় না। (যুদ্ধ করে যাও) যতক্ষণ না তারা নিজেদের হাতে জিজিয়া দিতে ও ছোট হয়ে থাকতে সম্মত হয়। (তাওবা-২৯)

উপরে বর্ণিত আয়াতে কারীমায় বিবৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষসমূহ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমে নিম্নোক্ত ভাষায় দেখুন এ আয়াতটি–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ـ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ (التوبة ـ ٧٣)

অর্থাৎ, হে নবী, কাফির ও মোনাফিকদের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে জিহাদ করুন, আর তাদের ব্যাপারে কঠোর পন্থা অবলম্বন করুন, শেষ পর্যন্ত তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট একটি স্থান। (সূরা তাওবা-৭৩)

যুদ্ধের মৌলিক উদ্দেশ্য যা আমরা আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনায় ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি তা অর্জিত হয়ে গেলে, অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পথ সুগম হয়ে গেলে বা প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামী রাষ্ট্র বা সমাজের প্রতি কোন কার্যকর হুমকি হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি প্রতিপক্ষ হারিয়ে ফেললে অথবা প্রতিপক্ষ যদি যুদ্ধ-সংগ্রাম পরিহার করে আলোচনার টেবিলে বসতে চায় সন্ধি করতে চায় তবে মুসলিম বাহিনী, তথা ইসলামী রাষ্ট্র সন্ধির এ আহ্বানকে গ্রহণ করে নেবে। সন্ধিস্থাপনের এ আহ্বানকে যুদ্ধের উন্মাদনা, প্রতিশোধ পরায়ণতা শত্রুর প্রতি ক্রোধ-বিদ্বেষ অথবা হঠকারিতা ও গোঁয়ার্তুমির দ্বারা উপেক্ষা করা চলবে না, সে রকম কোন সুযোগ ইসলাম দেয়নি। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম বাহিনীকে স্পষ্ট বিধান দিচ্ছেন নিম্নোক্ত ভাষায়–

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ز وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ط هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ـ (الانفال ـ ٦١ ـ ٦٢)

অর্থাৎ, তারা (কাফির বাহিনী) যদি শান্তি ও সন্ধির জন্য আগ্রহী হয় তাহলে তুমিও সে জন্য (সন্ধির জন্য) আগ্রহী হও এবং (এ ব্যাপারে) আল্লাহর ওপরেই ভরসা রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। আর তারা যদি (সন্ধির মাধ্যমে) ধোঁকা দেবার নিয়ত রাখে, তাহলে (সে ব্যাপারে তুমি চিন্তিত হয়ো না)

www.pathagar.com

আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে এবং মুসলমানদের মাধ্যমে। (আনফাল-৬১ ও ৬২)

কাজেই এ কথা সুস্পষ্ট যে ইসলাম যেমন কখনোই নিজ হতে যুদ্ধ শুরু করতে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করে না, আক্রান্ত না হলে কখনো আক্রমণ করে না, তেমনি যুদ্ধের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ামাত্র বা শান্তিসন্ধির কার্যকর সম্ভাবনা উদ্ভব হওয়ামাত্রই যুদ্ধের দামামাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যুদ্ধ বন্ধ করে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

ইসলামী সৈন্যবাহিনীর জন্য বাধ্যতামূলক কয়েকটি যুদ্ধরীতি

সর্বকালের সকল ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী সরকারের আওতাধীন মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সকল স্তরের সব সৈন্যদের জন্য ইসলাম কিছু মৌলিক যুদ্ধরীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যা মেনে চলা সকল মুসলিম সৈন্য, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকল মুজাহিদ এর জন্য বাধ্যতামূলক এসব রীতিনীতিসমূহের প্রত্যেকটির প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে আমাদের সম্মুখে একথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলাম তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে তার আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম ও প্রতিবন্ধকতাহীন করতে বাধ্য হয়েই যুদ্ধ করে কিন্তু সে যুদ্ধের ময়দানেও সর্বোচ্চমানের মানবহিতৈষী চরিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে করতে বাধ্য করে। শত্রুপক্ষের সাধারণ জনগোষ্ঠীতো দূরের কথা এমনকি শত্রু সৈন্যকেও সে মানবীয় মর্যাদা হতে বঞ্চিত করে না। ইতিহাসে যারা ইসলামকে যুদ্ধাংদেহী একটি দর্শন এবং ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের একটি যুদ্ধবাজ জাতি হিসেবে চিত্রিত করেছে বা করতে তৎপর তাদের এ হীন প্রচেষ্টা যে প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী তা এ সকল মৌলনীতিগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রতিটি বিবেকবান মানুষই অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। সম্মানিত পাঠক, অনুগ্রহ করে এসব মৌলিক ও বাধ্যতামূলক যুদ্ধরীতি যা নিচে বর্ণিত হচ্ছে তার প্রতিটি ধারার প্রতি গভীর মনোযোগ প্রদান করুন এবং দয়া করে একটু ভেবে দেখুন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নিকট অতীতে সংঘটিত বসনিয়ার যুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ, ইরান ও ইরাকের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ, আরব ইসরাঈলের মধ্যে সংঘটিত ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালের যুদ্ধ এবং আফগানিস্তানের মাটিতে রাশিয়া-আফগানিস্তান এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধসমূহে যেসব বর্বর-মানবতাবিরোধী ও লোমহর্ষক আচরণ করা হয়েছে নির্বিশেষে সামরিক ও বেসামরিক স্বশস্ত্র-নিরস্ত্র জনসাধারণের প্রতি সভ্যতা গর্বিত আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে– তাহলেই বিবেকের সম্মুখে পরিষ্কার হয়ে দেখা দেবে ইসলাম প্রকৃতই যুদ্ধাংদেহী একটি দর্শন? না শান্তিকামী একটি

www.pathagar.com

মতবাদ, ইসলামের অনুসারী মুসলমানগণ সত্যিই কী যুদ্ধবাজ? না, আসলে তারা মুক্তি ও শান্তির দূত?

এক. ইসলামে যুদ্ধ হতে হবে সর্বশেষ পন্থা (Last Option)। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে প্রতিপক্ষকে ইসলাম গ্রহণ বা জিজিয়া প্রদান বা যুদ্ধ এ তিনটির যে কোন একটি বেছে নেবার আহ্বান জানাতে হবে ও তাদের পূর্ণ ইখতিয়ার থাকবে বর্ণিত তিনটি শর্তের যেকোনটি বেছে নেবার।

দুই. শত্রু পক্ষের কোন সৈন্যকে পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা যাবে না। নিহত সৈন্যের লাশ বিকৃত করা নিষিদ্ধ।

তিন. কোনো সৈন্যকে আগুনে পুড়িয়ে মারা যাবে না।

সাম্প্রতিককালে কোরিয়া যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ এসব যুদ্ধে জঙ্গলে-গুহায় আত্মগোপনকারী, আশ্রয়গ্রহণকারী সৈন্যদের বিশ্বের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিত ও উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত মার্কিন সৈন্যরা বিশেষ ধরনের অগ্নি নিক্ষেপক ও প্রজ্জ্বলনযন্ত্রদ্বারা আগুন জ্বালিয়ে তাতে পুড়িয়ে মেরেছে এ ধরনের বর্বরতা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

চার. যে জনপদেই সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করুক না কেন বা অবস্থান গ্রহণ করুক না কেন, সেখানে লুট-তরাজ নিষিদ্ধ। (অথচ আধুনিক বিশ্বের যেকোনো যুদ্ধে যেকোনো সৈন্যবাহিনী এ ঘৃণ্য কর্মটি মহোৎসবে সম্পন্ন করে থাকে। এটিকে যুদ্ধরত কোনো সামরিক বাহিনীই জঘন্য অপরাধ বলে মনেই করে না।)

পাঁচ. ফলবান বৃক্ষ ফসলের ক্ষেত বা শস্যক্ষেত্র ইত্যাদি বিনষ্ট করা যাবে না।

ছয়. যেসব সৈন্য আত্মসমর্পণ করবে বা যাদের বন্দি করা হবে তাদের নির্যাতন করা বা তাদের হত্যা করা যাবে না বরং তাদের সাথে উত্তম আচরণ ও তাদের সকল মানবিক মৌলিক চাহিদা (অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসা ইত্যাদি) পূরণ করতে হবে।

(বন্দি অবস্থায় ধৃত কোনো সৈন্য যদি যুদ্ধপূর্ব সময়ে কোন মানুষ হত্যার অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকে, অথবা সে যদি মুরতাদ হয়ে থাকে বা কোনো ফৌজদারি আদালত কর্তৃক (ইসলামী রাষ্ট্রের) দণ্ডিত হয়ে থাকে অথবা যুদ্ধপূর্ব সময়ে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি তার কৃতআচরণ ইত্যাদি বিবেচনা করে ইসলামী রাষ্ট্র এ বন্দিকে হত্যা করতে পারে। তবে লক্ষণীয় হলো হত্যার এ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করবে ইসলামী রাষ্ট্র বা তার আদালত, যুদ্ধরত সৈন্যরা নয়)

সাত. প্রতিপক্ষের দূত বা প্রতিনিধিকে হত্যা করা যাবে না, অত্যাচার বা বন্দি করা বা তার নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটানো যাবে না।

www.pathagar.com

আট. প্রতিপক্ষের সাথে কৃতওয়াদা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যাবে না।

নয়. যুদ্ধরত জনপদে কোনোরকম উচ্ছৃঙ্খলতা, নৈরাজ্য সৃষ্টি করা বা হাঙ্গামা- গোলযোগ এর সূত্রপাত করা যাবে না। (অথচ আজকের যুগে আধুনিক বিশ্বে যুদ্ধ মানেই হলো সাধারণ বেসামরিক জনগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার, হত্যা-ধর্ষণ- লুট-তরাজ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি)

দশ. নারী-শিশু-বৃদ্ধ এদের প্রতি অস্ত্র তোলা যাবে না, এদের হত্যা করা বা কোন রকম নির্যাতন করা যাবে না।

এগারো. ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সন্ন্যাসী এদের হত্যা করা, নির্যাতন করা বা কষ্ট দেয়া যাবে না। তাদের উপাসনালয় ধ্বংস বা তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ অর্থাৎ ধর্ম পালনে বাধার সৃষ্টি করা যাবে না।

বারো. পশু ও জীবজন্তু হত্যা করা নিষিদ্ধ।

তেরো. সন্ত্রাস ও ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে কোন এলাকাকে জনশূন্য করা যাবে না (অথচ আধুনিক সমর কৌশলের অন্যতম একটি কৌশল হলো যে, প্রতিপক্ষের জনপদে যুদ্ধের শুরুতেই হত্যা-ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ ইত্যাদিসহ নানাবিধ সন্ত্রাস এর তাণ্ডব সৃষ্টি করে ফেলার মাধ্যমে জনপদকে জনশূন্য করে ফেলা হয় আর এ কর্মটি করা হয় এই জন্য যে, উক্ত জনপদের প্রতিরোধশক্তি যেন সহসাই ভেঙে পড়ে, তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এলাকা ত্যাগ করে এবং সহজেই যেন এলাকাটি তাদের হাতে চলে আসে। আসলে এতে এটাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় ও প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তাদের লক্ষ্য থাকে একটি জনপদ একটি ভূ-খণ্ড হস্তগত করার, মানুষের হৃদয়-অন্তর বিজয় নয়। কিন্তু ইসলামে যুদ্ধের লক্ষ্য এর পুরোপুরি বিপরীত। ইসলাম কোন ভূ-খণ্ড বা জনপদ, নয় বরং ইসলামের লক্ষ্য থাকে উক্ত ভূ-খণ্ড বা জনপদের অধিবাসীদের হৃদয়-মন জয় করা। তাই তার কর্মপদ্ধতি তথা যুদ্ধরীতিও হয় প্রচলিত যুদ্ধরীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ও ব্যতিক্রম পর্যায়ের।)

চৌদ্দ. যুদ্ধে প্রাপ্ত শত্রুপক্ষের যেকোন সম্পদ যা মুসলমান সৈন্যবাহিনীর হাতে আসে তা ছোট-বড়, কম-বেশি যাই হোক না কেন, সকল কিছুই হবে গনিমত অর্থাৎ রাষ্ট্রের সম্পদ, এসবের ওপরে মুসলিম সৈন্যদের কারো অধিকার নেই (অবশ্য যুদ্ধ শেষে ইসলামী রাষ্ট্র যুদ্ধ জয়ী সৈন্যদের মধ্যে এসব সম্পদ বন্টন করতে পারেন তবে এটি পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের ইখতিয়ার) আর এ সবের কণামাত্র আত্মসাৎ করা চলবে না, এ ব্যাপারে স্বয়ং কুরআনুল-কারীমেই আল্লাহ পাক বিধান নাযিল করে জানিয়ে দিচ্ছেন এভাবে–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ج قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ط فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ـ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (الانفال ـ ١)

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আপনাকে গনিমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, বলুন গনিমতের মাল তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নাও। (আর) আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো যদি তোমরা (প্রকৃতই) মুমিন হয়ে থাক। (আনফাল-১)

পনেরো. যারা বশ্যতাস্বীকার করবে তাদের জান-মাল ইজ্জতকে অবিকল মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জতের ন্যায় নিরাপত্তা ও সম্মান দিতে হবে। এ ব্যাপারে সরাসরি আল-কুরআনেই বলা হচ্ছে–

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ۔ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ * (التوبہ ـ ١١)

অর্থাৎ, অতঃপর তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়িম করে এবং যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীনি ভাই। (তাওবা-১১)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ * (البقرة ـ ١٩٣)

অর্থাৎ, আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তারা যদি (সত্য বিরোধিতা হতে) নিবৃত্ত হয় তাহলে কারো প্রতি কঠোরতা নয় একমাত্র জালিমদের সাথে ব্যতীত। (বাকারা-১৯৩)

ষোলো. কোন অবস্থাতেই (সেনাপতি/ সেনাধ্যক্ষদের গৃহীত যুদ্ধকৌশল হিসেবে ছাড়া) যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা অর্থাৎ যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা যাবে না।

এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল -কারীমে নিষেধ করেছেন এবং ভয়ঙ্কর আজাব এর ঘোষণাও দিয়েছেন নিম্নোক্ত আয়াতে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ـ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ ۔ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ * (الانفال ـ ١٥-١٦)

www.pathagar.com

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন কাফির বাহিনীর মোকাবিলায় লিপ্ত হও তখন তাদের মোকাবিলা করা হতে কখনই পিছু হটবে না। এরকম অবস্থায় (যুদ্ধের মাঠ হতে) যে লোক পিছু টান দেয় (যুদ্ধ কৌশল হিসেবে বা অন্য বাহিনীর সাথে যোগদানের উদ্দেশ্যে হলে সে ভিন্ন কথা) সে আল্লাহর পক্ষ হতে গজবে নিপতিত হবে এবং জাহান্নামই হবে তার আশ্রয়স্থল আর তা প্রত্যাবর্তনের জন্য খুবই খারাপ একটি জায়গা। (সূরা আনফাল-১৫-১৬)

আমরা আশাকরি এ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার বিষয়টি মোটামুটিভাবে পরিষ্কার একটি ধারণা উপস্থাপন করা গেছে। নিদেন পক্ষে এ কথাটিও পরিষ্কার হয়েছে যে বস্তুত ইসলাম একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়েছে। শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, শান্তি বিঘ্ন করার জন্য নয়, আর ইসলাম একটি যুদ্ধবাজ দর্শন নয় এর অনুসারী মুসলমানরা নিতান্ত বাধ্য হয়েই সর্বশেষ পন্থা হিসেবে আত্মরক্ষার জন্যই শুধুমাত্র যুদ্ধ করে। আর তাদের এই যুদ্ধ তাদের নিজেদের জন্য নয় যেমনি- তেমনি তা পৃথিবীর কোন নেতার সন্তুষ্টি অর্জন বা বাহবা পাওয়া বা বীরত্বের স্বীকৃতিসূচক কোন মেডেল বা পদকপ্রাপ্তির জন্য হয় না বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে তাদের সকল যুদ্ধ ও সংগ্রাম হয়ে থাকে শুধুমাত্র এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য। তারা যুদ্ধ শুরু করে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য আবার তা বন্ধও করে একমাত্র আল্লাহরই জন্য। এর বিনিময়ে তাদের যা চাওয়া ও পাওয়া তা একমাত্র আল্লাহর নিকট হতেই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইসলামী রাষ্ট্র ও অমুসলিম নাগরিক

ইসলামী রাষ্ট্র, অর্থাৎ এমন একটি জনপদ যেখানে ইসলামী দর্শনভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা চালু ও রাষ্ট্র ক্ষমতা ঐ আদর্শের নিষ্ঠাবান অনুসারী মুসলমানদের হাতে রয়েছে। সে জনপদে মুসলিম নাগরিকদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অমুসলিম নাগরিকদের সরব উপস্থিতি একেবারেই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। কোন জনপদে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের শাসন কর্তৃত্ব সত্ত্বেও সেখানকার অমুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য পরিচয় ও স্বাধীনতা ও আর্থ-সামাজিক অধিকারসহ সকল মানবিক স্বাতন্ত্র্যবোধ বহাল থাকার ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে দু একটি নয় বরং ভূরিভূরি রয়েছে। বস্তুত ইসলাম শুধু মুসলমানদের একক ধর্ম নয় বরং এটি সার্বিকভাবে সমগ্র বিশ্ব মানবতার ধর্ম, বিশ্বের সকল মানুষের জন্য এর একটি শাশ্বত ও সর্বজনীন আবেদন রয়েছে। যারা এ আবেদনকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিয়ে এর কাজে নিজেদের শর্তহীন ও

www.pathagar.com

পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেন। ইসলাম তাদেরকে সমগ্র মানবতার মধ্য হতে আলাদা একটি একক পরিচয়ে পরিচিত করে তোলে, অর্থাৎ তারাই মুসলমান নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে যারা এই প্রথম গোষ্ঠীর ন্যায় এ দর্শনকে স্বীকার ও এর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত নয়, তারা অমুসলিম নামে পরিচিত। তারা হিন্দু-বৌধ্য, খ্রিস্টান, ইহুদি, জৈন যেকোন পরিচয়েই নিজেদের পরিচিত করুক না কেন, তারা সকলেই ইসলামের দৃষ্টিতে প্রথম গোষ্ঠী 'মুসলমান' এর বিপরীতে দ্বিতীয় একটি গোষ্ঠী অমুসলিম। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় এ গোষ্ঠীর মানবিক মর্যাদা ইসলামের কাছে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না। এই অমুসলিম সম্প্রদায়ের মানবিক অস্তিত্ব ও অধিকারকে ইসলাম অস্বীকার তো করেই নি বরং পূর্ণ সচেতনতা, সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে তা রক্ষা করা, নিশ্চিত করা বা প্রদান করাকে নিজের বা নিজেদের অন্যতম বাধ্যতামূলক ও অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। এটা ইসলামী দর্শন এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও অবিভাজ্য বিশ্বাস এর একটি অংশ।

ইসলাম তার অনুসারী প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে এ শিক্ষা দিয়ে থাকে, এর পাশাপাশি তাদের প্রত্যেকের নিকট ব্যক্তিগত বা সামষ্টিকভাবে অমুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের করণীয়-পালনীয় দায়িত্বকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছে। এ দায়িত্ব পালনে ত্রুটি বা গাফিলতির ব্যাপারে সতর্ক করে দেয় এবং পরিণামে তার কঠোর ও ভয়াবহ শাস্তি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে সাবধান করে দেয়। ফলে ইসলাম এর প্রকৃত অনুসারী মুসলমান প্রত্যেকে, বিশেষ করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকারকারী প্রজা হিসেবে বসবাসকারী প্রতিটি অমুসলিম নাগরিক এর জান-মাল-ইজ্জতকে নিজেদের জান-মাল-ইজ্জতের মতই মহার্ঘ ও মহামূল্যবান বিবেচনা করে। তা রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগের পাশাপাশি সর্বোচ্চমানের সতর্কতা পালন করে থাকে। বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শনের কোনরকম অবকাশ তারা পান না। ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলগণ যুগপৎভাবে নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে অমুসলিম সম্প্রদায়ের জান-মাল-ইজ্জত-অধিকার রক্ষা করেন। তাদের মৌলিক সকল চাহিদা পূরণ করেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, বিশ্বের অমুসলিম জনগণ (কিছুসংখ্যক ব্যতিক্রম বাদে) ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে তাদের অবস্থানকে মেনে নিতে বা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়, স্বেচ্ছায়। এটির একমাত্র বোধগম্য কারণ সম্ভবত ইসলামী রাষ্ট্রে একজন অমুসলিম হিসেবে তাদের অবস্থান, অধিকার ও তাদের প্রতি ইসলামী রাষ্ট্রের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব

www.pathagar.com

সম্বন্ধে পুরো মাত্রায় ধারণা না থাকা। এর পাশাপাশি ইসলামবিরোধী গোষ্ঠীকর্তৃক সচেতনভাবে পরিবেশিত প্রচারিত ভুল অমূলক ধারণা প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হওয়া। একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম জনগণ কিন্তু বাস্তবে এ অমূলক ধারণার উল্টোটাই পোষণ করে থাকেন। একটি কল্যাণকর ও মডেল ইসলামী রাষ্ট্রের আওতায় সম্পূর্ণ নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও ইজ্জত এর সাথে বসবাস করার ফলে তাদের মনমগজ হতে ইসলামী শাসনে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও অবস্থান সম্বন্ধে যাবতীয় ভুল ধারণা দূরীভূত হয়ে যায় এবং তারা সঙ্গত কারণেই এমতাবস্থায় তাদের নিজেদের পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা বা অন্য কোন শাসন ব্যবস্থার চেয়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতায় বসবাস করতে সামাজিক ও মানসিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকে।

এ বাস্তবতার সত্যতা আমরা ইতিহাসের বিভিন্নক্ষেত্রে দেখতে পাই। বিজিত সিরীয় অঞ্চল হতে মুসলিম বাহিনী প্রত্যাহার করে নিতে চাইলে তৎকালীন সিরিয়ার অমুসলিম জনগণ মুসলমানদের আসন্ন বিয়োগব্যথায় কাতর হয়ে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর ঘোড়ার সামনে নিজেদের দেহখানা লুটিয়ে দিয়ে ক্রন্দন করে মিনতি জানিয়েছিল– তোমরা ফিরে যেও না, তোমরা আমাদের ছেড়ে যেও না, রোমানদের তুলনায় তোমাদের অধীনে আমরা অধিকতর সুখ-শান্তি আর ইজ্জত নিরাপত্তার মধ্যে দিনাতিপাত করেছি।

মিসরে কিবতীদের বেলায়ও এমনটি ঘটেছে। প্রচণ্ড ভয়-সংশয় নিয়ে বিজিত কিবতীরা বিজয়ী মুসলমানদের অধীনে অনন্যোপায় হয়েই বসবাস শুরু করে। কিন্তু মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই তাদের প্রতি মুসলিম জনগণ ও শাসক শ্রেণীর মহান কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, উদারতা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যায়। বিজিত স্পেন এর বেলায় ঘটে যায় আরও চিত্তাকর্ষক ও চমকপ্রদ ঘটনা। মাত্র কয়েকটি দশকের মধ্যেই ঐ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলাম এর কাজে স্বেচ্ছায় ব্যগ্রতার সাথে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং মুসলমান হয়ে যায়।

আমাদের এ ভারতীয় উপমহাদেশ এর বেলাতেও একই রকম ঘটনা ঘটে যায়। শত জাতি প্রথার কঠোর নিষ্পেষণে বিপন্ন ও মানবেতর জীবনযাপনে অভ্যস্ত বহিরাগত মুসলমানদের চমকপ্রদ উন্নত দর্শন ও বিশ্বাস, দৈনন্দিন জীবনে কৃত আচরণ দেখে প্রথমবারের মত জানল যে তারা নিজেরাও 'মানুষ' এবং তারা মানবিক অধিকার ও সম্মান এর হকদার।

বস্তুত যতদিন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকবর্গ ও মুসলিম প্রজাসাধারণ ব্যক্তিগত ও একই সাথে সামাজিক জীবনে ইসলামী দর্শনের ক্ষেত্রে অনুগত ও বিশ্বস্ত

www.pathagar.com

থেকেছে। যতদিন তাদের প্রতিটি কথা ও কাজে ইসলামের সুমহান বিধানাবলির প্রকাশ প্রতিফলন থেকেছে, ততদিন ধরে সমাজে অমুসলিম জনগণ তাদের যাবতীয় জান-মাল-ইজ্জত এর নিরাপত্তাসহ সকল অধিকারসমূহ পূর্ণ মাত্রায়ই পেয়েছে। কারণ হিসেবে বলা যায় যে ইসলামী শাসনব্যবস্থায় শুধুমাত্র সরকার ও প্রশাসন এর সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গই শুধু নন বরং ঐ সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে প্রতিটি সচেতন মুসলমান তাদের পারিপার্শ্বিক সমাজের যেকোন অমুসলিম নাগরিক এর প্রতি আশ্চর্যজনকভাবে উদার ও সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকে। এটি এ জন্য নয় যে, এ বিশেষ গুণটি কোন বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর সামাজিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য। বরং এটি এ জন্য সম্ভব হয় যে, এ হলো একটি সর্বজনীন ও অত্যন্ত শক্তিশালী দর্শন বা শিক্ষার অনিবার্য ফলাফল। এ শিক্ষা মানবগোষ্ঠীর যেকোন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে এবং এই গোলার্ধের যেকোন জনপদে যেকোন সময় বা যুগে বা কালে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, অবশ্যম্ভাবীভাবে সেকালে বা সে জনপদের সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর চেতনায় তাদের মানসিকতায় উল্লিখিত গুণাবলির উন্মেষ ঘটাতে বাধ্য। ইসলাম এর অগ্রযাত্রার যুগে, যখন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ইসলামী শাসন এর আওতায় আসে, সেসব অঞ্চলের অমুসলিম জনগোষ্ঠী নতুন এ শাসন ব্যবস্থার (ইসলামী শাসন ব্যবস্থা) আওতায় অত্যন্ত সুখ-শান্তি আর নিরাপত্তার সাথে বসবাস করেছে, শুধু তাই নয়, ঐসব অমুসলিম নাগরিকদের মন হতে প্রাথমিক শঙ্কা ও ভুল ধারণা প্রশমিত হয়েছে। খুব নিকট হতে বাস্তব জীবনে তারা যখন ইসলামী শাসন ও শাসকদের কর্মনীতি তাদের প্রতি পোষিত দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলোকন করেছে, এর পাশাপাশি তাদের পূর্বতন শাসকগোষ্ঠীর শাসনের আওতায় ফিরে যাবার পরিবর্তে মনেপ্রাণে ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছে। ইতিহাসের পাতায় এর ভূরি ভূরি তথ্য প্রমাণ রয়েছে, প্রখ্যাত খ্রিস্টান ঐতিহাসিক Dozy এর একটি উদ্ধৃতি ইসলামী গবেষণা পত্রিকা 'মাসিক পৃথিবী' হতে হুবহু তুলে ধরলাম সম্মানিত পাঠক বৃন্দের উদ্দেশে। ঐতিহাসিক Dozy উল্লেখ করেন : The state of the Christians under Islam was not the cause of much discontent it compared with the first. The Muslims were very tolerant, they did not harass any body in mattery of religion. For this the Christians were grateful to the Muslims, they praised the tolerance and justice of the Muslim conqurers and preferred the Muslims rule to that of the Germans and Franks. অতীতের সঙ্গের তুলনায় ইসলামের অধীনে খ্রিস্টানদের অবস্থায় খুব একটা

www.pathagar.com

অসন্তুষ্টির কারণ ছিল না। মুসলমানরা ছিল খুবই সহনশীল, ধর্মের ব্যাপারে তারা কাউকেই হয়রানি করেনি। এর জন্য খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের প্রতি ছিল কৃতজ্ঞ, তারা প্রশংসা করেছে মুসলিম বিজয়ীদের সহনশীলতা ও সুবিচারের এবং জার্মান ও ফ্রাঙ্কদের শাসনের চাইতে অধিকতর পছন্দ করেছে তারা মুসলিম শাসনকে। (মাসিক পৃথিবী -পৃষ্ঠা-৪৩, আগস্ট-৯৮)

এ কারণেই সহায়-সম্বলহীন ভিনদেশী গুটিকতক অসীম সাহসী মুসলমান যখন কোন অঞ্চল অধিকার করেছে, সেখানে তাদের নিজ বিশ্বাস ও দর্শনভিত্তিক শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছে, তখন বিজয়ী এ গুটিকতক ভিনদেশী লোককে স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ (অথচ ভিন্ন আদর্শের অনুসারী) লোকজনই নতুন এ আদর্শের বিস্তার-প্রসার এর ক্ষেত্রে সর্বান্তকরণে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা করেছে। সে কথার প্রমাণ আমরা পাই, ঐতিহাসিক ফিনলে, History of the Byzantine Empire-লিখেন ঃ 'যেখানেই আরবরা খৃষ্টানদের কোন জাতিকে পরাজিত করেছে, তার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইতিহাস দুর্ভাগ্রক্রমে প্রমাণ করে দেয় যে, বিজিত জাতির জনগণ ইসলামের দ্রুত প্রসারের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছে; অধিকাংশ খৃষ্টান সরকারসমূহের অবশ্য লজ্জার কথা যে বিজয়ী আরবদের শাসনপ্রণালি থেকে তাদের শাসনপ্রণালি ছিলো যথেষ্ট পীড়াদায়ক...। (মাসিক পৃথিবী, আগস্ট-৯৮, পৃ-৪৩)

কোন অমুসলিম জনপদে আগত মুসলিম সৈন্যবাহিনীর প্রতি স্থানীয় অমুসলিম জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, তার একটা বাস্তব ও সুন্দর তথ্য আমরা পাই বিখ্যাত মিসরীয় শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিক জনাব হাসান ইব্রাহীম হাসান এর লেখা-"Islam"নামক গ্রন্থে, উক্ত গ্রন্থ হতেই তথ্যটি উদ্ধৃত করে দিলাম। নিচে দেখুন-

"As for early Christiniaty in spain, Christian historians relate that at the time of Muslim conquest of Spain (92/711) the old gothic Virtues had declined and had given place of effeminacy and corruption, So that Muhammhdan rule seemed to them to be a punishment Sent from God on Those who had strayed Into Paths of Vice (Islam, Hasan, 1967, p-222)

ভাবানুবাদ : খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, স্পেন এ মুসলিম বিজয়াভিযানকালে (৯২ হিঃ/৭১১ খৃঃ) সে দেশের শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে ও (শাসন কার্যে) শৈথিল্য-দুর্বলতা এবং দুর্নীতি স্থান করে নেয়। ফলে স্থানীয়

www.pathagar.com

খৃষ্টান জনগণ মুসলিম বিজয়কে তাদের খ্রিস্টান শাসক গোষ্ঠীর পাপ ও ধর্মচ্যুতির জন্য ঈশ্বরের পক্ষ হতে আগত শাস্তি হিসেবে দেখেছে (ইসলাম, লেখক হাসান ইব্রাহীম হাসান, ১৯৬৭, বাগদাদ, পৃঃ ২২২)।

বস্তুত প্রতিটি জনপদেই মুসলমানরা ঐ জনপদের স্থানীয় বাসিন্দা, আপামর জনসাধারণ এর জন্য মুক্তিদূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ফলে অমুসলিম জনসাধারণের সাথে নবাগত ও বহিরাগত মুষ্টিমেয় মুসলমান যোদ্ধার সম্পর্ক বৈরীতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বরং সে সম্পর্ক সূচনাতেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে প্রেম-ভালবাসা আর সহমর্মিতার ওপরে। মুসলিম মুজাহিদদের একটি ভিনদেশী অচেনা ও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী জনপদে পরিচালিত যুদ্ধনীতি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মনীতি, আচার-আচরণ সে জনপদের সাধারণ মানুষের কাছে একটি আগ্রাসী শক্তির চিত্র তুলে ধরেনি, বরং তুলে ধরেছে সমগ্রভাবে বৃহত্তর মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নিপীড়ন জর্জরিত মানবতার মুক্তিদূত ও তৎকালীন সমাজে সৈনিক সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ ধারণার বিপরীতে এক অদ্ভুত ধরনের মহৎ ও উন্নততর চিত্র, আর এরই কারণে তারা ভিনদেশী যোদ্ধাদের নিজ দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে সাদরভাবে গ্রহণ করেছে। বিখ্যাত খৃষ্টান ঐতিহাসিক Prof Arnold এর ভাষায়-"The rapid success of the Arab invaders was Largely due to the welcome they received from the native Christians, who hated the Byzantine rule not only for its oppressive administration, but also-and chiefly -because of the bitterness of theological rancour P. 216

ভাবানুবাদ : "আরব আক্রমণকারীদের দ্রুত সাফল্য মূলত স্থানীয় খ্রিস্টান জনগণ কর্তৃক সাদরে গ্রহণ করার কারণেই ঘটেছে। কারণ তারা (স্থানীয় খ্রিস্টানগণ) দমনমূলক শাসন ব্যবস্থার কারণে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বিরোধী ছিল। শুধু তাই নয় বরং মূলত ধর্মীয় তত্ত্বগত হিংসা-বিদ্বেষ ও তিক্ততাজনিত কারণেই রোমানদের প্রচণ্ড ঘৃণা করত।" (ঐ, পৃষ্ঠা-২১৬)

ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের ইসলামের পরিভাষায় জিম্মি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তারা নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি অবিচল থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে আদর্শবাদী এই রাষ্ট্রটির ভৌগোলিক সীমানায় তার নাগরিক হিসেবে বসবাস শুরু করে।

মুসলমানরা যখন নিজেদের আদর্শ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন একটি ভূখণ্ডে নিজেদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে যায় বা করে থাকে, তখন ঐ নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

ভূ-খণ্ডে আল্লাহর নির্দেশ এর পরিপন্থী অন্য সকল কর্মকাণ্ড (যেমন জুলুম, নির্যাতন, অশ্লীলতা ও শোষণ) বন্ধ করতে তারা আদিষ্ট। এসব কর্মকাণ্ড যা ইসলামী পরিভাষায় 'হারাম' বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে তা সমূলে উৎপাটন করতে যেয়ে ঐসব হারাম কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। যদি এসব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এসব হারাম কর্মকাণ্ডের ক্ষতিকারক দিকটি উপলব্ধি করে নিয়ে সমগ্র মানবতার স্বার্থে (শুধুমাত্র মুসলমানদের স্বার্থে নয়) তা বর্জন করতে তৈরি বা সম্মত হয় কেবলমাত্র তখনই এ সংঘাত এড়ানো যায়, আর তা না হলে যুদ্ধের মাধ্যমেই হারাম কর্মকাণ্ড যারা চালু রাখতে ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়, তাদের অবদমিত করে ঐসব কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে এবং সে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ জন্যই ইসলামে যুদ্ধ হয়ে থাকে এবং এ সকল যুদ্ধ মুসলমান সম্প্রদায় অনন্যোপায় হয়ে হারাম কর্মকাণ্ড বন্ধের ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিকল্পহীন সর্বশেষ পন্থা হিসেবে করে থাকে বরং বলা চলে করতে বাধ্য হয়। তার পূর্বে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবরকম সংঘাতমুক্ত পথ অবলম্বন করা হয়ে থাকে জীবন ও সম্পদসহ রক্তক্ষয় এড়ানোর অভিপ্রায়ে। এসব কর্মকাণ্ড, প্রচেষ্টাসমূহ মুসলমানরা করে থাকে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর উদ্দেশ্যেই, এখানে কারো ব্যক্তিগত কোন লাভ-ক্ষতি বা নাম-যশ, ক্ষমতা প্রতিপত্তি বা অন্য কোন স্বার্থচিন্তা কাজ করে না। এটিই হলো ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। আর এই জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর কয়েকটি স্তর এর চূড়ান্ত স্তরটি হলো আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ, ইসলামী পরিভাষায় কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ। এই পর্যায়টি হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এর পর্যায়সমূহের সর্বশেষ ও অনন্যোপায় পর্যায়, এর পূর্বের পর্যায়সমূহের একটি বা সকল পর্যায় প্রয়োগের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেলে কখনোই কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধের প্রয়োজন পড়ে না। এ ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। (যুদ্ধ শুরুর কারণ ও যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জনীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়ে) নিচের আয়াতটি একটু মনোযোগ সহকারে দেখুন-

অর্থাৎ, তোমরা যুদ্ধ করো তাহলে কিতাবের ঐ সকল লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না নতভাবে তারা জিজিয়া প্রদান করে। (সূরা আত-তাওবা; আয়াত-২৯)

এখানে নত হওয়া এর অর্থ হচ্ছে ইসলাম অস্বীকারকারীগণ মানবতার জন্য ক্ষতিকর ও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ

www.pathagar.com

করবে অথবা তা চালু রাখতে তারা আর সমর্থ হবে না, তারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেসব কর্মকাণ্ড হতে নিবৃত্ত হবে অথবা নিবৃত্ত রবে, এমন একটি অবস্থা।

এর অর্থ এ নয় যে, তারা মুসলমানদের ভয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদ মেনে নিয়ে মুসলমান হয়ে যাবে, তাদের নিজেদের ধর্ম বর্জন করবে। ইসলাম গ্রহণ করা বা না করা তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ইখতিয়ারাধীন বিষয়, বিভিন্ন সময়ে মুসলমানগণ যেসব জনপদ অধিকার করেছেন সেসব জনপদে মুসলিম সেনাবাহিনী স্থানীয় অমুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ধর্মমত অক্ষুণ্ন রাখা বা নতুন ধর্ম (ইসলাম) গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমরা নিচে প্রমাণ হিসেবে ইতিহাস হতে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরলাম–They gave them the choice of embracing Islam or adhering to their old faith. He who embraced Islam was treated on equal terms with the Muslims, and he who retained his faith paid a small capitation tax or Jizya, of two dinars, an amount equal to one pound sterling or a Little less than $3.00 It was imposed only on adults. Women, children, old men, the blind and the crippled were exempt from paying this tax. Amr, the Arab conqueror of Egypt, did his best to gain the affection and the loyalty of the Egyptians. He restored the Coptic Patriarch who had been in exile for about thirteen years, and granted him a charter giving him full religious freedom. (1)

The Egyptian Christians, or copts as they were called, were, as a rule, more efficient as clerks, accountants, and scribes than their Muslim countrymen. Most of the financial posts of government were then, as always, in the possession of Copts. They were the farmers (damins) of taxes and the controllers of accounts.

ভাবানুবাদ : তারা (বিজয়ী মুসলমানগণ) তাদের স্বাধীনতা প্রদান করে ইসলাম গ্রহণের অথবা তাদের পূর্বতন ধর্ম বিশ্বাস এ অটল থাকার। যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় একই দৃষ্টিতে দেখা হয়

www.pathagar.com

আর যারা তাদের পূর্বতন ধর্মে বহাল রয়ে যায়। তাদের ওপরে সামান্য জিজিয়া ধার্য করা হয় যার পরিমাণ ছিল দুই দিনার মাত্র। এই জিজিয়া শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের বেলায় ধার্য ছিল। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অন্ধ ও খোঁড়া ব্যক্তিদের এ জিযিয়া প্রদান করা হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। মিসর বিজয়ী আমর ইবনুল আস (রা.) মিসরীয়দের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তেরো বছর ধরে নির্বাসনে থাকা খৃষ্টান ধর্মযাজককে তিনি রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করে পূর্ণধর্মীয় স্বাধীনতা মঞ্জুর করে ফিরিয়ে আনেন। কেরানি, হিসাবরক্ষক, লিপিকার হিসেবে মিসরীয় খ্রিস্টানগণ বরাবরই মুসলমানদের তুলনায় দক্ষ ছিল, ফলে (ইসলামী সরকারের) সরকারি অর্থ বিভাগ এর কর আদায়কারী হিসাব রক্ষকসহ বেশিরভাগ পদসমূহে তারা নিয়োজিত হয়েছিল। (ইসলাম লেখক হাসান ইব্রাহীম হাসান, ১৯৬৭ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২১৫-২১৬)

মূলত এসব অমুসলিমগণ, যখনই তারা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিরোধে নিবৃত্ত হবে এবং এ রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নেবে, সেই মুহূর্ত হতেই তাদের জান-মাল-ইজ্জত তাদের নাগরিক বৈষয়িক ও ধর্মীয় অধিকার প্রদান ও রক্ষা করার জিম্মা সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের প্রতিটি মুসলমান নাগরিকের ও বিশেষভাবে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের জিম্মায় চলে আসে। যেহেতু তাদের সার্বিক জিম্মা ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে, তাই তাদের বলা হয়ে থাকে জিম্মি।

আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে জিম্মি বলতেই এমন এক ধরনের চিত্র ভেসে ওঠে চোখের সামনে যাতে মনে হয় যে সে একজন বন্দি, যেমনটি কোন বন্দিশালা বা জেলখানায় মানুষ বন্দি অবস্থায় থাকে বিশেষ কোন অপরাধ এর কারণে, যাদের নিজস্ব কোন স্বাধীনতা থাকে না। ব্যাপারটি এমন নয় মোটেও বরং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতায় এ ধরনের কল্পিত চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থাই দেখতে পাওয়া যাবে জিম্মিদের ক্ষেত্রে।

গুটিকতক দায়িত্ব ও অধিকার যা একজন মানুষ শুধুমাত্র ইসলামী আদর্শের অনুসারী অর্থাৎ মুসলমান হবার সুবাদে প্রাপ্ত হয় (যেমন মুসলিম নারী-পুরুষ পরস্পরকে বিবাহ করার অধিকার) এমন কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সকল মৌলিক, মানবিক, আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অধিকার ও দায়িত্বসহ প্রায় সকল সুযোগ-সুবিধাই এসকল জিম্মিগণ পেয়ে থাকে ঠিক ঐ একই রাষ্ট্রের আওতায় বসবাসরত মুসলিম নাগরিকদের ন্যায়।

ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাধীন অমুসলিম নাগরিকদের (জিম্মি) বেলায় দেশের প্রচলিত ফৌজদারী আইন ও দণ্ডবিধি একইভাবে ও একই ক্ষেত্রসমূহে আরোপিত হবে যে কারণ ও ক্ষেত্রসমূহে ঐ আইন ও দণ্ডবিধিসমূহ মুসলিম নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রে অমুসলিম ও মুসলিম উভয়ের মধ্যে কোন

www.pathagar.com

পার্থক্য করা হবে না। যেমন চুরির জন্য চোরের হাতকাটা, জিনা-ব্যভিচারের জন্য শাস্তি হিসেবে রজম বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর অথবা (অবিবাহিতদের বেলায়) বেত্রাঘাত। হত্যার ক্ষেত্রে ঘাতক বা হত্যাকারীকে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে মৃত্যুদণ্ড প্রদান (অথবা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারগণ কর্তৃক তা মাফ করে দেয়া হলে রাষ্ট্র অন্য কোন লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে, সে ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হবে না।)

তবে অমুসলিমদের নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপারের ক্ষেত্রে (তাদের মধ্যে) বিচার কার্য পরিচালনার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে তাদের (অর্থাৎ অমুসলিমদের) ধর্মীয় আইন হিসেবেই তা করা হবে। যেমন– বিবাহ, সম্পত্তি হস্তান্তর, মিরাস বণ্টন ইত্যাদি রাসূল (সা.)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষিত সম্মানিত সাহাবীগণও তাদের জীবনকালে বিজিত অমুসলিম জনপদে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রয়োগ এর ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে চলেছেন এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। ইতিহাস হতে এরকম একটি উদাহরণ দেখুন–"Amr, the Arab general who became ruler of Egypt, reorganised the system of justice to conform with Muslim law, divided the country into provinces, and appointed in each province a Coptic judge to settle the religious and civil disputes of non-Muslims according to their religious law. He also regulated the land tax.

ভাবানুবাদ : মিসর বিজয়ী আরব জেনারেল হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) যিনি পরে মিসরের প্রশাসক নিযুক্ত হন, দেশটিকে বিভিন্ন প্রদেশ এ বিভক্ত করেন, বিচার ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করেন ইসলামী আইন অনুযায়ী এবং প্রতিটি প্রদেশ এ খৃষ্টান বিচারক নিয়োগদান করেন অমুসলিম নাগরিকগণের ধর্মীয় ও দেওয়ানি বিষয়াদি তাদের নিজস্ব আইন-কানুন অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পন্ন করার জন্য। তিনি ভূমিকর পুনর্বিন্যাস করেন (Islam লেখক Dr. Hasan Ibrahim Hasan ১৯৬৭ সংস্করণ পৃ- ২১৬)

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুসলিম নাগরিকদের মত অমুসলিম নাগরিকগণও স্বাধীনভাবে ব্যবসার জন্য সংগঠিত হতে বা একক বা সামষ্টিকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন। তবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব ব্যবসা বা যেসব পদ্ধতিতে ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেসব ব্যবসা বা সেসব পদ্ধতিতে ব্যবসা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্যই নিষিদ্ধ, কেউই তা করতে

www.pathagar.com

পারবে না। তবে এখানে প্রসঙ্গত একটি কথা বলে রাখা দরকার যে, মুসলমানদের জন্য শুকর ও মদের ব্যবসা চিরকাল এর জন্য নিষিদ্ধ হলেও ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকগণ তাদের নিজেদের মধ্যে এ দুটি বস্তুর ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে। তবে তারা কোনমতেই সুদি ব্যবসা বা সমাজে অশ্লীলতা বিস্তার ঘটতে পারে, এমন কোন ব্যবসা (যেমন বেশ্যাবৃত্তির ব্যবসা, পর্নোছবি উৎপাদন বা বাজারজাতকরণ ইত্যাদি) পরিচালনা করতে পারবে না।

অমুসলিম নাগরিকগণ দেশ রক্ষা অর্থাৎ সামরিক দায়দায়িত্ব হতে মুক্ত। এর সঠিক ও যথার্থ কারণ হিসেবে বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবীদ ও দার্শনিক জনাব সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান এ তুলে ধরেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

"শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা শুধু মুসলিমদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কারণ একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেবল তারাই উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে যারা ঐ আদর্শকে সঠিক বলে মেনে নেয়। তাছাড়া লড়াইতে নিজেদের আদর্শ ও মূলনীতি মেনে চলাও তাদের পক্ষেই সম্ভব। অন্যরা দেশ রক্ষার জন্য লড়াই করলে ভাড়াটে সৈন্যের মত লড়বে এবং ইসলামের নির্ধারিত নৈতিক সীমারক্ষা করে চলতে পারবে না। এজন্য ইসলাম অমুসলিমদের সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে (ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩৯৭)

এই একই দৃষ্টিকোণ থেকে একজন অমুসলিম নাগরিক কখনও ইসলামী রাষ্ট্রের মূল পরিচালক (প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, আমীর ইত্যাদি যে নামেই তাকে অভিহিত করা হোক না কেন) বা দায়িত্বশীল হতে পারবে না। কারণ একটি ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের কর্ণধার হতে শুরু করে সাধারণ মুসলিম নাগরিক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দায়িত্বই এই হয়ে থাকে যে তারা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামী আদর্শের শুধু একনিষ্ঠ অনুসারীই হবে না বরং তাদের এই আদর্শ, এই শিক্ষা, এই দর্শনকে সর্বতোভাবে জীবনের তথা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করবে, প্রতিষ্ঠিত রাখবে এবং এ পথে একাজ করতে যেয়ে যেকোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে, এটি তাদের জন্য বাধ্যতামূলক, এটি তাদের নিকট ইবাদত, শুধুমাত্র একটি নাগরিক দায়িত্ব নয়। অতএব এটি সহজেই বোধগম্য যে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে এই মৌলিক দর্শনের ওপরে বিশ্বাস রাখে না, যে লোক নিজেকে নিজের স্বাদ-আহ্লাদ, ভালো লাগা না লাগা, নিজের পছন্দ-অপছন্দের ওপরে উঠে নিজেকে বিশ্বস্রষ্টার সমীপে সর্বতোভাবে সমর্পণ করতে প্রস্তুত নয়, স্বীকৃতি দিতেও প্রস্তুত নয়, সে

www.pathagar.com

লোক কীভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত ও যোগ্য বিবেচিত হতে পারে?

কোন অমুসলিম নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রের কোন শরীয়া আদালতের বিচারক বা আইনজীবী নিয়োগ হতে পারবেন না তবে রাষ্ট্রকর্তৃক অমুসলিমদের জন্য গঠিত দেওয়ানি ও বিশেষ আদালতসমূহের বিচারক, আইনজীবী বা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেতে পারবেন।

অমুসলিম নাগরিকগণ তাদের যোগ্যতার নিরিখে রাষ্ট্রের সরকারি ও বেসরকারি যেকোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেতে পারেন। অমুসলিম নাগরিকগণের ক্ষেত্রে একই ধর্মের অনুসারী নয় শুধুমাত্র এ কারণে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব করা (সরকারি বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে বা দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে) ইসলামের শিক্ষা নয়। যুগে যুগে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের তাদের যোগ্যতানুযায়ী বিভিন্ন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে Dr. Hasan তাঁর Islam নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–

It was Also said that one of the prophets (s) last Commandents was connected with just treatment of those Enjoying Muslim protection (Ahl Al Dhimma)

...Although the majority of the Tributaries had accepted Conversion to Islam, There remained, in the chief towns of the Empire, Important Communities of jews and Christians who, Without loosing their tributery status, yet occupied a place of consideration in the Life of Caliphate. the master's mekical man was a jew or a christian; Tributaries filled the Offices of the Ministers, others Practised banking or carried on trade (Islam. Dr. Hasan Ibrahim Hasan 1967 Edition. p.223)

ভাবানুবাদ : বলা হয়ে থাকে যে পয়গাম্বর মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত সর্বশেষ নসিহতগুলোর মধ্যে মুসলমানদের আওতাধীন বসবাসকারী অমুসলিম (জিম্মি) দের নিরাপত্তার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল...।

যদিও বেশির ভাগ জিম্মিই ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল তথাপি রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরে রয়ে যাওয়া ইহুদি ও খৃষ্টান জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের স্বধর্ম ও অবস্থান বিসর্জন দেয়া ব্যতিরেকেই ইসলামী খিলাফতের

www.pathagar.com

অধীনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নেয়। খলীফার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিল হয় ইহুদি নয়তো খৃষ্টান। জিম্মিরা মন্ত্রণালয়ের পদসমূহে নিয়োগলাভ করল, বাকিরা ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে গেল স্বাধীনভাবেই (দ্রষ্টব্য Islam লেখক Dr Hasan Ibrahim Hasan. 1967 সংস্করণ, বাগদাদ, পৃষ্ঠা-২২৩)

বস্তুত, উদ্ধৃতির কলেবর না বাড়িয়ে আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে চাই যে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা দেশের অমুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থ অন্য যেকোন শাসন ব্যবস্থার আওতার চেয়ে বেশি মাত্রায় সংরক্ষিত হবে, তাদের সকল মৌলিক মানবিক, অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক চাহিদা ও অধিকার বাস্তবায়িত হবে, এবং তারা ব্যতিক্রমহীনভাবে দেশ গঠনে অংশ নিতে পারবেন।

জিজিয়া

অমুসলিম নাগরিকদের নিকট হতে ইসলামী রাষ্ট্র যে বিশেষ কর আদায় করে থাকে, ইসলামের পরিভাষায় তা জিজিয়া বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই জিজিয়া আদায় করা নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণ হিংসা-বিদ্বেষ ও অজ্ঞতাপ্রসূত প্রোপাগান্ডা চালিয়েছেন, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা যুগের পর যুগ ধরে। এটিকে ভিত্তি করে তারা ইসলামকে একটি জুলুমবাজ ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে একটি বৈষম্যমূলক শাসন ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আসলে এটি যে একটি নির্জলা দুরভিসন্ধি ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয় সে কথা যেকোন বিবেকবান ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা ও ইতিহাসের দিকে নজর বুলিয়ে নিলেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রত্যেক উপার্জনশীল নারী-পুরুষ এর বেলায় বাধ্যতামূলক যাকাত, ফিতরাহ, সাদাকাহ ইত্যাদি বিধান রয়েছে যা তারা তাদের সম্পদ হতে ব্যয় করে থাকে। এ ছাড়াও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তারা অকাতরে তাদের সম্পদ হতে ব্যয় করতে আদিষ্ট। রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কোন কর ধার্য করলে সে কর পরিশোধ করতে তারা বাধ্য। অপরদিকে অমুসলিম নাগরিকদের বেলায় না রয়েছে তাদের সম্পদ হতে ব্যয় করার জন্য বাধ্যতামূলক যাকাত এর বিধান আর না রয়েছে ফিতরাহ-সাদাকাহ এর বিধান। তাদের সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষম সুস্থ পুরুষদের উপরেই অতি সামান্য পরিমাণ বার্ষিক কর ধার্য করা হয় তাদের ও তাদের সমগ্র জনগোষ্ঠীর জান-মাল, ইজ্জত, ফসল-সম্পদ এর নিরাপত্তা বিধানের বিনিময়ে। এ ব্যাপারে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী দার্শনিক মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর লেখায় বিষয়টিকে প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, দেখুন-

www.pathagar.com

"শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা শুধু মুসলিমদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কারণ একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেবল তারাই উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে যারা ঐ আদর্শকে সঠিক বলে মেনে নেয়। তাছাড়া লড়াইতে নিজেদের আদর্শ ও মূলনীতি মেনে চলাও তাদের পক্ষেই সম্ভব। অন্যরা দেশ রক্ষার জন্য লড়াই করলে ভাড়াটে সৈন্যের মতো লড়বে এবং ইসলামের নির্ধারিত নৈতিক সীমারক্ষা করে চলতে পারবে না। এই জন্য ইসলাম অমুসলিমদের সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং দেশরক্ষার ব্যয় নির্বাহে নিজেদের অংশ প্রদানকে কর্তব্য বলে চিহ্নিত করেছে। এটাই জিজিয়ার আসল তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য। এটা শুধু যে আনুগত্যের প্রতীক তা নয় বরং সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ ও দেশ রক্ষার বিনিময়ও বটে। এই জন্য জিজিয়া শুধুমাত্র যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষদের ওপরই আরোপ করা হয়। আর মুসলিমরা যদি কখনো অমুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অক্ষম হয় তাহলে জিজিয়ার টাকা ফেরত দেয়া হয়।" (ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, পৃষ্ঠা ৩৯৭, ৩৯৮, উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে মাসিক পৃথিবী, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা ২৩ হতে)

জিজিয়ার উল্লিখিত ব্যাখ্যা জানার পর এ প্রথাকে অমুসলিমদের জন্য নিপীড়নমূলক একটি প্রথা, বলে চিহ্নিত করার আর কোন দূরতম সম্ভাবনাও বাঁকি থাকে কী?

সমাপ্ত

www.pathagar.com

মদীনা পাবলিকেশান্স

ISBN : 984-8631-031-7

www.pathagar.com